বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সন্ধিযুগ

[১৯২১-'৪৪]



প্রজ্ঞা প্রকাশন

এ-১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

প্রচ্ছদ : আশিস চৌধুরী

প্রকাশক : অরূপ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার
প্রজ্ঞা প্রকাশন
২০এ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৯
।। বিপনন কেন্দ্র ।।
এ-১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রণে :
সোমা মুদ্রণ
২এ, কেদার দত্ত লেন, কলকাতা-৬

তো মা কে

স্বগত

বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার (প্রথম খণ্ড) রচনার সময় (১৯৯২) কথা দিয়েছিলাম অনতিবিলম্বে '২য় খণ্ড : সন্ধিযুগ'-এর ইতিহাস পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেব। বছর-খানেক দেরী হলেও আমি কথা রেখেছি।

সন্ধিযুগ-এর ইতিহাসটি (১৯২১-'৪৪) আদি মধ্যযুগ-এর তুলনায় (১৮৭২-১৯২০) কালব্যাপ্তির দিক থেকে বিপুলা না হলেও পৃথুলা নয়। অপিচ, এই পর্যায়ের ইতিহাসের মধ্যে আছে এক আশ্চর্য বর্ণময়তা। গিরিশ-যুগ-এর অভিভব থাকা সত্ত্বেও অপরেশ-অহীন্দ্র-দুর্গাদাস-শিশিরকুমার-এর কালে বাংলা মঞ্চে অভ্যর্থিত হয়েছিল এক নবীন চেতনার নবদিগন্ত। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, গিরিশ-মায়াজাল ভাঙছে; ইতিহাস নিবেদন করতে চাইছে নতুন হিসেব। ইতিহাসের এই ইঙ্গিতকে স্মরণে রেখে পরিশিষ্টে 'নবান্নে'র কথা বলেছি, 'ছেঁড়াতার'-এর একটা রেখাচিত্র অংকনের চেষ্টা করেছি।

যথার্থ ইতিহাসটি তুলে ধরার জন্য আন্তরিকতার অভাব ছিল না—এটুকু বলতে পারি। আগামী দিনের গবেষকেরা বর্তমান নিবন্ধটিকে আগেরটির মতো আকর গ্রন্থের মর্যাদা দিলে ইতিহাসেরই মর্যাদা রক্ষিত হবে।'

অধ্যায় সূচী

* এই লেখকের অন্যান্য বই *

১. লোকসাহিত্য জিজ্ঞাসা ও রবীন্দ্রনাথ

২. শরৎ সমীক্ষা ও শ্রীকান্ত

৩ গৃহদাহ, সম্পাঃ

৪. বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার (প্রথম খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পর্ব

মধ্যবিত্তের থিয়েটার ও সন্ধিলগ্ন

[১৯২১-১৯৪৪]

এযুগের খ্যাতনামা নট ও প্রয়োগাচার্য শম্ভু মিত্র একটি স্মৃতিচারণার সাহায্যে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতে এবং তার পরবর্তী সময়ে যে পালাবদল তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। শ্রীযুক্ত মিত্র লিখেছেন,

" 'জীবনরঙ্গ'[১] [তারাকুমার মুখোপাধ্যায়] নাটকের প্রথম অংকের শেষটায় নাট্য কেমন হবে তার একটা বর্ণনা ছিলো একটি চরিত্রের মুখে। সেটি অভিনয় করতেন শিশিরকুমার। ⋯ ⋯যতোদূর মনে পড়ে, নাটকে ছিলো যে শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছে নাট্যাচার্যকে, লোকে তো থিয়েটার দেখতে আসে আনন্দ করবার জন্য, তারা তো শিক্ষার জন্যে আসে না, সুতরাং আপনি শিক্ষা দেবেন কী করে ? নাট্যাচার্য তার উত্তরে বলেন যে, নাটককে শুরু করতে হবে কেতুনপুরের ভুনাগ রাজার রাণীর মতো ঘাঘরা দুলিয়ে, ওড়না উড়িয়ে, আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে। তারপর অকস্মাৎ নাটকের মধ্যভাগে আসবে সংকট। তখন—

বিনামেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়ানাকাড়া,
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরল কানাড়া।

রক্ত! রক্ত! বেগে গড়িয়ে পড়বে রক্তধারা। যারা আনন্দ করতে এসেছিলো তাদের দুচোখ যাবে অন্ধ হ'য়ে।—"[২]

"জীবনরঙ্গ" নাটকের 'গভীর সুরে ধরল কানাড়া' কথাটিকে যদি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি, তাহলে স্বীকার করে নেব যে—পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ১৯২১-১৯৪৪ এর মধ্যে আরেকটি নবীন নাট্যচেতনায় আমাদের প্রাণিত করেছিল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের এই অধ্যায়টি গিরিশযুগের মতো ব্যাপক নয় বটে, অনেক নাট্যকার এই সময়ে আসেননি ঠিকই, কিন্তু পরিমাণগত না হলেও গুণগত উৎকর্ষে, অভিনয়কলার বিবর্ধনে এই যুগটি নতুন বার্তা নিয়ে এসেছিল। শুধু অভিনয় কেন, নাটক যে একটা যৌথশিল্প, নাট্যকর্ম যে একটা মহান

কর্তব্য, থিয়েটার যে সংস্কৃতির একটি অঙ্গ—এসব সুস্থ ভাবনাগুলি বিবর্ধিত হয়েছিল বর্তমান সময়ে। এই চেতনা স্বীকৃতি পাওয়ার আগের যুগে নাট্য-রথীরা সংগ্রাম করে থিয়েটার চালিয়েছিলেন, বাঙালীর বিশিষ্ট পুরাণচর্চা চলেছিল মঞ্চে, ঘোষিত হয়েছিল—'ধর্ম রঙ্গালয়'। কিন্তু এই পর্বে থিয়েটারের জন্য সংগ্রাম ততটা আর করতে হয়নি, এটি সৃষ্টির কাল। এযুগের ঘোষণা তাই—

"বেগে গড়িয়ে পড়বে রক্তধারা! যারা আনন্দ করতে এসেছিলো তাদের দুচোখ যাবে অন্ধ হ'য়ে।—"

অবশ্য বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের এই প্রগতিশীল চেতনা ১৯২১ থেকেই শুরু হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে প্রকৃত নবনাট্যচেতনার শুরু হয়। কার্যকারণসূত্র ও অনুসন্ধিৎসা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, এই চেতনার প্রথম সঞ্চালক শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আসলে এই অধ্যায়টি তো ঐ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বটিকে নিয়েই।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে পূর্বোল্লেখিত কালপর্বকে নাম দেওয়া যেত, শিশির যুগ। কিন্তু এই নামকরণে আপত্তি উঠতে পারে। কারণ শিশিরকুমার এই সময়ের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও একাধিক উল্লেখযোগ্য নটের আবির্ভাব হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। তাঁরা অনেকেই শিশিরকুমারের পর্যায়ে উন্নীত হবার প্রয়াস পেয়েছেন মাঝে মাঝে। আর শিশিরকুমার যখন বিদেশে গেছেন বা অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করছেন ব্যক্তিগতভাবে, তখন এই যুগের অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর অভিনেতারা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ছিলেন। ফলে প্রতিনিধি-স্থানীয় অভিনেতা ও আচার্য হয়েও সামগ্রিক কৃতিত্ব শিশিরকুমারকে দেওয়া হলে জোরালো প্রতিবাদ উঠবেই। তবে ব্যাপকার্থে এই যুগটিকে 'শিশির যুগ' আখ্যা দেওয়া হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদের তীব্রতা কমবে।

'শিশির যুগ' আখ্যা না দেওয়ার পিছনে আরও একটি কারণ আছে। আমরা জানি, এই বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শধন্য হয়েও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে (১৯২১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত) সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর জের তখনও সমানে চলেছে। এই যুগেও একাধিক রঙ্গমঞ্চে পুরোনো নাটকের অভিনয় হয়েছে, পুরোনো মঞ্চসজ্জার কোথাও তেমন পরিবর্তন হয়নি এবং অভিনেতৃবর্গের একটি বড়ো অংশ সেই পুরোনো প্যাঁচগুলিকেই নতুনকালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছেন। এমন কি, বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারকে (বাঁচবার তাগিদে) সস্তা রুচির কাছে বেশ কয়েকবার আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত ব্যর্থতারও কিছু দৃষ্টান্ত আছে। প্রায় চারটি দশক ধরে অভিনয় করেও তিনি কোনোদিনই নাটক লিখলেন না। যে সমস্ত নাট্যকারেরা শিশির সান্নিধ্যে এলেন যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদ, যোগেশ চৌধুরী,

জলধর চট্টোপাধ্যায়, তারাকুমার মুখোপাধ্যায়) তাঁরাও শিশিরকুমারের কাছ থেকে বিশেষ প্রেরণা লাভ করতে পারলেন না। আবার শিশিরকুমার তাঁর সুদীর্ঘ নটজীবনে (সামান্য কয়েকজন ছাড়া) কোনো ভাল নটের সৃষ্টি করতে পারেননি। অর্থাৎ শিশিরকুমারের তিরোধানের পর বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে 'শিশির-স্কুলিং' স্থাপিত হতে পারেনি। কাজেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা শিশিরকুমারের কালটিকে শিশির যুগ আখ্যা দিতে পারবো না।

বর্তমান অধ্যায়ের বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চগুলিতে প্রবেশের আগে একবার সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিটি আলোচনা করে নিতে চাই। হয়তো এই পটভূমিটি আমাদের বিচারের পথকে সুগম করে দিতে পারে।

১৯২১ থেকে ১৯৪৪, বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের পক্ষে একটি বিশেষ পালাবদলের কাল। শুধু ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবীর কাছে এই কালবৃত্তটি নানা কারণে স্মরণীয়। বিদগ্ধ সমাজ এই কালসীমাটিকে বিশেষ ভাবে চেনেন, জানেন।

ইংরাজ সরকারের নতুন ভারত শাসন আইন চালু হয় ১৯২১-এর ৩ জানুয়ারি থেকে। এই উপলক্ষে রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অফ কেন্ট্ ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবাসীদের কাছে ডিউকের এই আগমন ব্যাপারটি মোটেই ভাল লাগেনি। কংগ্রেস আগেই ডিউক-বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২৮ জানুয়ারিতে ডিউক কলকাতায় এলে মিছিল, বিক্ষোভ ও জনসভা হয়। ডিউকের প্রতি এই আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই হোক্ বা ব্রিটিশ সরকারের নয়া নীতির জন্য হোক্ শাসক মহলে কোনো বাহ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। প্রতিটি ভাষণেই ডিউক অতীতের সম্পর্ক ভুলে পারস্পরিক সমঝোতার কথা বলেন।

এদিকে নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী ১৯২১ এর ১২ জানুয়ারি কলকাতায় ছাত্রদিবস পালিত হয়। বহুসংখ্যক ছাত্র এই সময়ে শিক্ষায়তন বর্জন করেছিলেন। পরে অবশ্য অনেকেই ফিরে এসেছিলেন আন্দোলনের ধার কমে গেলে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র আর স্কুল কলেজে ফিরে গেলেন না। এঁরা রাজনৈতিক কর্মী হয়ে গেলেন।

এই বছরের মার্চ মাস থেকে সরকার পক্ষ অসহযোগ আন্দোলনের শক্তিকে উপলব্ধি করেন। তাই ২৪ মার্চ একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয়—'শাসনতন্ত্র অচল করে দেবার এই স্পর্ধাকে সরকার যে কোনো মূল্যে স্তব্ধ করে দেবেন।' সরকারের এই কড়া হুঁশিয়ারির কারণ, তাঁরা দেখেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। বিশেষ করে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সরকারকে ভীত করে তুলেছিল।

১৯২১ সালের সবচাইতে বড়ো খবর—সুভাষচন্দ্র বসুর (১৯২১, মে) সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদান। বাংলাদেশের সমাজে এর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। এই ঘটনার পর বাংলাদেশের সর্বত্রই সুভাষচন্দ্রের একটি স্থায়ী 'ইমেজ' গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে যুবকসমাজের কাছে সুভাষচন্দ্র অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন।

১৭ নভেম্বর তারিখে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারত সফরে আসেন। যুবরাজকে বয়কট করার প্রস্তাব নিয়েছিলেন কংগ্রেস এবং সেই হিসেবে ওই দিন সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। কলকাতায় এই হরতালের সাফল্য মনে রাখার মতো।[৩] নভেম্বরের শেষের দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চিত্তরঞ্জন দাশের উপর এই আন্দোলন পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। প্রথমদিকে এই আন্দোলন তেমন সাড়া জাগায় না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তীদেবীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশ মুখর হয়ে ওঠে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সরকারপক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জনের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবে লর্ড রোনাল্ডস্ চিত্তরঞ্জনকে জানালেন, যদি কংগ্রেস যুবরাজকে বয়কট প্রস্তাব তুলে নেয়—সরকার তার দমনমূলক নীতি প্রত্যাহার করবে। চিত্তরঞ্জন জানালেন, প্রস্তাব বিবেচনার দায়িত্ব কংগ্রেসের নেতৃত্বের– তাঁর একার নয়। আর ১০ ডিসেম্বর স্বয়ং চিত্তরঞ্জনও গ্রেপ্তার হলেন। অন্যান্য প্রদেশেও নেতাদের ধরপাকড় করা হলো। মতিলাল নেহরু ও লাজপত রায় গ্রেপ্তার হন।

কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে কারাগারে বন্ধ করেও ইংরাজ সরকার খুব শান্তিতে ছিলেন না। সরকার নরমপন্থী নীতি নিয়ে একটা সমঝোতার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কারাগারের বাইরে তখনকার মতো কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের কাছে নতি স্বীকার করলেন না। ১৯২১ এর ডিসেম্বরে আমেদাবাদ কংগ্রেসে আইন অমান্য আন্দোলনের শপথ নতুন করে নেওয়া হলো। ১৯২২-এর প্রারম্ভে অসহযোগ আন্দোলন একটি পরিপূর্ণ গণআন্দোলনের রূপ নেয়।

কিন্তু সেই আন্দোলনের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই গোটা পরিকল্পনাটি হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে যায়। চৌরিচেরায় ইংরাজ পুলিশের হিংস্র আক্রমণে বিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক প্রত্যাহার করেন। কংগ্রেস ও তাদের নেতা ম. ক. গান্ধী মনে করেন যে দল হিংসার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় বহু কংগ্রেস কর্মীর মনে একটা হতাশার ভাব দেখা যায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি একটা অনাস্থারও সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষপন্থী যুবমনে বিভ্রান্তি, বিদ্রোহ

এবং তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এমন সময় গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হলো—১০ মার্চ, ১৯২২। আন্দোলনের মেরুদণ্ডটি এবারের মতো ভেঙে গেল।

এই অবসরে ১৯২৩ সালে ভারতবর্ষের বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেঁধে যায়। ১৯২৩-এর মে মাসে কলকাতায় একটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাঁধে। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আবার তিক্ত হয়ে উঠল। বহু চেষ্টা করেও এই তিক্ততার অবসান তখন আর ঘটানো যায়নি।

১৯২৩ সালেই বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জুলাই মাসে বিপ্লবীদের পুস্তিকা ও প্রচারপত্রসমূহ দেখা দিতে আরম্ভ করে। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলগুলির পুনর্জাগরণ হয়। এই বছরের শেষের দিকে চট্টগ্রামে সূর্য সেন বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই দল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অফিস থেকে সাতাত্তর হাজার টাকা লুঠ করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনে।

১৯২৪ সালে গান্ধীজি অসুস্থতার কারণে কারামুক্ত হন। কারামুক্ত হওয়ার পর তিনি সর্বস্তরে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার আহ্বান জানান। ১৯২৪-এ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস পৃথক পৃথক ভাবে বুঝেছিলেন আন্দোলন মোটামুটি ব্যাহত হয়েছে, কাজেই একটা সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রয়োজন। ২১ ও ২২-এ নভেম্বর বোম্বাইতে একটি যৌথ সম্মেলনে সরকারকে ১৯১৮'র তিন নম্বর আইন (বিনা বিচারে আটক আইন) তুলে নেবার দাবি জানানো হয়।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে যখন এই আলাপ আলোচনা বসেনি এবং মহাত্মা যখন জেলে তখন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা পুলিশ সর্বাধিনায়ক চার্লস টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে অপর একজনকে হত্যা করেছিলেন। গোপীনাথ সাহার প্রাণদণ্ড হয়। সমগ্র বাংলাদেশে গোপীনাথ সাহার নাম আলোচিত হতে থাকে। ১৯২৫ সালের ২৫ মার্চ মহাত্মা ও চিত্তরঞ্জনের আলোচনার ফলে সমস্ত রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জানানো হয় এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা রোধের ব্যবস্থা হয়।

সাবধানতা সত্ত্বেও ২ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল (১৯২৬) কলকাতায় একটি ব্যাপক ধরণের দাঙ্গা হয়। পরে সারা এপ্রিল মাস জুড়ে এই দাঙ্গা চলতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি যে কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল তা অনুধাবনের জন্য ১৯২৯-এর ১ জানুয়ারি মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহার পাঠই যথেষ্ট। সুযোগ বুঝে জিন্না মুসলমানদের জন্য কতকগুলি রাজনৈতিক সুবিধা দাবি করে বসলেন।

১৯২৯ সালের ১০ জুলাই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা অনশন শুরু করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে যেহেতু তাঁদের রাজদ্রোহী হিসেবে বন্দী করা

হয়েছে সেহেতু তাঁদের যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়া হোক। দীর্ঘদিন অনশনের পর সরকার তাদের অধিকাংশ দাবি মেনে নেন। একমাত্র যতীনদাস ছাড়া সকলেই অনশন প্রত্যাহার করেন। ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাস ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান। তাঁর মরদেহ কলকাতায় এলে অভূতপূর্ব শোক-মিছিল হয়।

১৯৩০ সালে সর্বস্তরের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে আবার ১৯১০ সালের সংবাদপত্র কণ্ঠরোধ আইন (প্রেস অর্ডিন্যান্স) বিধিবদ্ধ করা হয়। সঙ্গে চালু হোল 'ক্রিমিনাল ল'। এই আইনবলে বিভিন্ন সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলো এবং সভাসমিতি বন্ধ করা হলো। ১৫ সেপ্টেম্বরে হিজলী জেলে বিচারাধীন আটক বন্দীদের উপরে নৃশংসভাবে গুলি চালানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা-দেশের ঘরে ঘরে নতুন স্বদেশচিন্তার সূত্রপাত হয়।

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বার্তা তখন দিকে দিকে মুক্তির ডাক এনে দিয়েছে। সেই মুক্তিমন্ত্রে নতুন পাঠ নিলেন যুগান্তর দলের নেতারা। ২৫ অগাস্ট ১৯৩০-এ টেগার্টের গাড়ীতে বোমা ফেলা হলো। টেগার্ট এবারেও বেঁচে গেলেন। তারপর ৮ ডিসেম্বর বিনয়-বাদল-দীনেশ কারাবিভাগের ইন্‌সপেক্‌টার সিমসন্‌কে হত্যা করে এক ইতিহাস তৈরী করে দিলেন।

একদিকে অসহযোগ অপরদিকে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ যখন সারা ভারতবর্ষকে নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নেতৃবর্গের সিদ্ধান্তে আকস্মিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এবারের আন্দোলন প্রত্যাহার হওয়ায় কংগ্রেস মহলে বিরোধী দুটি শিবির গড়ে ওঠে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ তিলে তিলে সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে উচ্চকিত করে তুলতে থাকে। ১৯৩৫-এর নতুন ভারত-শাসন আইনে ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে পৃথক হয়ে গেল। এই নয়া শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় অসহযোগের উত্তাপ কমে গেল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ আসনে জয়ী হলো। কংগ্রেসের এই জয়লাভ যেন কতকটা হিন্দু নেতৃত্বেরই জয়লাভ—এই ধারণা থেকে মুসলিম লীগ আরও শক্ত হাতে সংগঠন তৈরী করতে লাগল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তখন বিশেষ সুখের সময় নয়। ভাঙ্গাগড়া ও সাম্রাজ্য-বাদের পারস্পরিক বিরোধের তীব্রতা বাড়ছিল ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকটের সংগে তাল মিলিয়ে। ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সারা ইওরোপের ভয়াবহতার দিকে তাকিয়ে থাকতে হলো ভারতবাসীকে। একান্ত অনিচ্ছার মধ্য দিয়েও পরাধীন ভারতবাসীকে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে হলো।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে অনেক বেশী উজ্জ্বল

করে তুলেছিল। বোঝা গিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদ পেছু হটছে, পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় ভেঙ্গে স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি অনিবার্য। এই অনিবার্যতার ফলশ্রুতি স্বরূপ নানাবিধ সংগ্রাম ও বিনষ্টির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক মহাদুঃসময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক পটভূমিকাটি সামনে রেখে আমরা যদি মন্তব্য করি রাতারাতি এই বঙ্গভূমি বিপ্লবের পীঠভূমি হয়েছিল এবং সমগ্র কলকাতা শহর সেই আন্দোলনের সক্রিয় শরিক হয়ে উঠেছিল তাহলে অসত্য কথা বলা হবে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের সামনে 'আন্দোলন', 'বিপ্লব' প্রভৃতি শব্দগুলি যে ছবি উপস্থিত করে বিশ শতকের প্রথম চারটি দশকে এই একই শব্দসম্ভার তেমন কোনো স্পষ্ট ছবি গড়ে তোলেনি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, অখণ্ড বাংলাদেশে সেই উনিশ শতাব্দীর আবহাওয়াই চালু আছে। কলকাতা বিশ শতকের প্রথম চারটি দশকে একটি বুনেদী শহরে পরিণত। বর্তমানে কলকাতা শহরের যে প্রসার ঘটেছে তখন তার অনেক কিছুই ছিল না। জনসংখ্যা দিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটি আরও সহজ হয়। ১৯২১-৪৪ এই অধ্যায়ে কলকাতার জনসংখ্যা উনিশ শতকের তুলনায় বেড়ে গেলেও বিশ শতকের পঞ্চাশের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এই শহরে বাস করেছেন তখন কিছু কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা সাধারণ মানুষও। শহরে এঁরা সরকারী কাজে যুক্ত হয়ে গেছেন, সামান্যকিছু বিদ্যা থাকলেই। তখন একটি জুনিয়ার ক্লার্ক-এর চাকরির জন্য ভাবতে হতো না। কলকাতা শহরে বাস করছেন সেই পুরোনো উচ্চ মধ্যবিত্তেরা। যাঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধেও 'রায়বাহাদুর' খেতাবলাভের চেষ্টা করেছেন এবং পূর্বপুরুষের অর্জিত সংস্থানের উপর নিশ্চিন্তে বসে জীবন নির্বাহ করছেন। শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের চেষ্টা নেই এঁদের, কৃষি অর্থনীতির উপর এখনও বিস্তর বিশ্বাস। গ্রামে গেলে (খাজনা আদায়ের জন্য) 'রাজাবাবু' সম্বোধন শুনছেন।

সত্তরের দশকে এসে আমরা যে কলকাতাকে দেখছি (ভাবতে আশ্চর্য লাগে) সেই কলকাতাকে চল্লিশের দশকে ফিরিয়ে দিলে আজকের মফস্বল টাউন বলে ভ্রম হবে। চল্লিশের দশকে এমনকি পঞ্চাশেও খাস কলকাতা শহরে গ্যাসের বাতি জ্বলত। গভীর রাত্রিতে আজকের মতো 'কল্লোলিনী' থাকত না এ-শহর। বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি থাকত যত্রতত্র, শহরের বুকে টগবগিয়ে ছুটত ঘোড়া। প্রতিটি ধনীর বাড়ীতে একটি করে আস্তাবল থাকত, থাকত সহিস। এগুলো পারিবারিক সম্ভ্রমের প্রতীক ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কলকাতা শহরের পরিধি বাড়তে থাকে। আগে কলকাতা শহর বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতাকেই। চৌরঙ্গীর পর সবই গ্রাম পর্যায়ভুক্ত। ভবানীপুর অঞ্চলে কিছু বনেদী পরিবারের বাস ছিল অবশ্য।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে আমাদের মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট ছকটি ওলটপালট করে দিল। কলকাতায় বোমা পড়েছিল স্বাধীনতা লাভের আগেই। আত্মরক্ষার তাগিদে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবন থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এল নানাবিধ যুদ্ধকালীন সংকট। কলকাতার মানুষ এই সময়ে সর্বপ্রথম ব্যাগ হাতে চালের জন্য লাইন দিলেন, একটুকরো রুটির জন্য মারামারি লেগে গেল। পয়সা থাকা সত্ত্বেও কাপড় যোগাড় করা যাচ্ছে না। এবং শেষদিকে আসছে দলে দলে গ্রামের বুভুক্ষু মানুষ। দোকানগুলিতে খাবার সাজানো আছে অথচ ফুটপাতে 'থ্যাতা ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজে' মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে। পরিচিত ছক ভাঙা এই জীবনে অভ্যস্ত হতে হতে স্বাধীনতা এসে গেল।

১৯২১-১৯৪৪ এই পর্বে সব চাইতে লক্ষণীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রসার। বিশ শতকের শুরু থেকেই বহু স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে এই কলকাতা শহরে। তখন স্কুল কলেজের ছাত্রদের অধিকাংশ আসছেন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। পণ্ডিতিবিদ্যার যুগটি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হলো। অন্তঃপুরচারিণী মহিলারাও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তবে এই শিক্ষান্তে তাঁদের খুব কম সংখ্যকই কোনো বৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের কুফলগুলির কথা বাদ রেখে বলা চলে—এই শিক্ষালাভের ফলে নিম্নবিত্ত মানুষের সামনে বেঁচে থাকার অধিকারের ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে' প্রভৃতি প্রবাদের জন্ম হলো এই সময় থেকে। স্বাভাবিক ভাবে চাকুরির নিমিত্তে পড়াশুনোর ব্যাপারটি জরুরী হয়ে পড়ল। এবং আনন্দের কথা, যুদ্ধের বাজারে অনেকে চাকরি পেয়েও গেলেন।

তাহলে, মেনে নিতে হয় কলকাতা শহরে আগে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের থেকে ১৯২১-৪৪ এর মানুষেরা একটু আলাদা জল-বাতাসের মধ্যে লালিত। বিশেষ করে শেষদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তেরা বাস করতে থাকলেন কলকাতা শহরে। এঁদের কোনো পুঁজি ছিল না, গ্রামে ছিল না জমি—তবু এঁরা মানুষ, এঁরাও এখন থেকে কলকাতার নাগরিক। এঁদের থেকেই এক ধরণের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর উদয় হতে থাকল। তাই এক একবার মনে হয়, গোটা জাতটাকে নাড়া দেবার জন্য বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন ছিল।

বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশটি যে বিশেষভাবে এই সময়ের পেশাদারী মঞ্চকে আঘাত করেনি—তা বলাই বাহুল্য। তথাপি এই যুগেই আমরা 'কারাগার' বা 'গৈরিক পতাকা'র মতো নাট্যানুষ্ঠান

দেখতে পেয়েছি। আবার অভিনয়ের দ্বারা, উপস্থাপনার সাহায্যে যুগের দাবিকে পুরোনো নাটক দিয়েই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় তা নগণ্য। আসলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের এই যুগটি নাট্যকলা বিবর্ধনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত দর্শক তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন। যথার্থ পালাবদল ঘটল ১৯৪৪-এর পর। পরবর্তী পর্বে আমরা সবিস্তারে তার আলোচনা করব। বর্তমানে আলোচ্য ১৯২১-'৪৪ এর মঞ্চগুলি।

১. মিনার্ভা থিয়েটার ঃ ১৯২৫-১৯৪৪

১৯২২ সালে মিনার্ভা থিয়েটার যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কেন—সেকথা আমাদের জানা আছে।* দীর্ঘ তিন বছরের চেষ্টায় উপেন্দ্রনাথ মিত্র আবার এই থিয়েটারটির নবজীবন দান করেন। এই তিন বছর সময়ে মিনার্ভার অভিনেতৃবর্গ বিভিন্ন মঞ্চ ভাড়া করে থিয়েটার করতে থাকেন। নতুন মিনার্ভার উদ্বোধন হলো মহাতাপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। ৮ অগাস্ট ১৯২৫। 'আত্মদর্শন' মিনার্ভাকে সুনাম এনে দিয়েছিল। সব ভূমিকাই হৃদয়গ্রাহী হয়, বিশেষ করে হাঁদুবাবুর মনরাজার ও রেণুবালার সুখের. উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালী' বিশেষভাবে দর্শকের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। বাঙালীর বিচিত্র সংসারই নাটকটির উপজীব্য। কৌতুকধর্মী এই নাটকটির স্মৃতি আজও অনেক বাঙালী দর্শকের কাছে আনন্দের সামগ্রী। অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকাবিদায়' মঞ্চস্থ হয় এই বছরেই। 'ব্যাপিকাবিদায়' নাট্যাভিনয়েও মিনার্ভার দল নতুন রসের যোগান দেন।

মিনার্ভায় দানীবাবু যোগদান করেন ১৯২৭ সালের শেষে। দানীবাবুর নেতৃত্বে অমৃতলালের 'যাজ্ঞসেনী' অভিনীত হয়। দানীবাবু অল্পদিনের জন্য মিনার্ভায় এসেছিলেন। তিনি চলে যাবার পর কয়েকজন নতুন অভিনেতা মিনার্ভায় যোগদান করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সিংহ, ভুমেন রায়, এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতিরা মিনার্ভায় যোগ দিয়ে আধুনিক কালের অভিনয়-রীতির পরিচয় দেন। শেষোক্ত দুজন শিল্পীর সঙ্গীত ও অভিনয় আজও আমাদের স্মৃতিতে অম্লান।

বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভায় যোগদান করেন ১৪ এপ্রিল ১৯৩০। অহীন্দ্রবাবুর মিনার্ভায় যোগদান ব্যাপারটি স্টার (আর্ট) ভালো চোখে দেখেননি। তাঁরা অহীন্দ্রবাবুর নামে এক মামলা জুড়ে দেন। প্রায় অকারণ এই মামলায় অহীন্দ্রবাবুকে আটশত টাকা দিয়ে মিটমাট করতে হয়।

* বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার—১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

যাহোক্, অহীন্দ্রবাবু মিনার্ভায় যোগদান করার পর থিয়েটারের শৈথিল্য ও অসংযম শাসিত হয়। মঞ্চকে শৃঙ্খলিত করার কাজটি যে কতখানি দুরূহ ও দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল সেকালে, তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। মিনার্ভায় ম্যানেজার হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিজ্ঞতাটি অবশ্যই স্মরণীয়। তাঁর অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ না করলে বিশ শতকের তিনের দশকের নাট্যশালাকে চিনতে পারা যাবে না।

অভিজ্ঞতাটি অহীন্দ্র চৌধুরীর নিজের ভাষায় এরকম :

"আমি প্রথমেই এক নোটিশ জারী করে দিলাম যে মঞ্চের ভেতরে কোনো অপ্রয়োজনীয় লোকের আসা চলবে না—আড্ডা দেবার জায়গা এটা নয়। এই বিজ্ঞপ্তির ফলে স্টেজের ভেতরে ফালতু লোকের ভিড় কমে গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটলো। জনৈক ভদ্রলোক···থিয়েটারের দিক থেকে তিনি ছিলেন 'খদ্দের লক্ষ্মী'। ···এই ভদ্রলোক করতেন কি—অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভেতরে চলে আসতেন।···আমার এই নোটিশ জারীর পর দেখা গেল সে ভদ্রলোক আর থিয়েটারেই আসছেন না।

এই না-আসা মানে হল থিয়েটারের এক নিয়মিত দর্শক কমে গেল, অর্থাৎ সপ্তাহে ৪ দিন মাসে ১৬ দিন পাঁচ টাকা ক'রে মোট আশী টাকার মত আয় কমে গেল।

এই লোকসানের ফলে উপেনবাবু ও রামবাবু (মালিক ও মালিকপক্ষ) উভয়েই বেশ একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন—নোটিশ তো উনি ভালোর জন্যেই দিয়েছেন, কিন্তু এতে যে থিয়েটারের প্রচুর লোকসান।"[৪]

ম্যানেজার অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনেত্রীদেরও শৃঙ্খলিত করেন। সাজঘরের সামনে বসে অশোভনভাবে ধূমপান করতেন অভিনেত্রীরা। শৃঙ্খলাপ্রিয় অহীন্দ্র চৌধুরী বর্ষীয়সী নগেন্দ্রবালাকে এজন্য ক্ষমা করেননি। তাঁর নির্দেশে এই অসুন্দর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি আর হয়নি।

অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনায় মিনার্ভায় 'আত্মদর্শন' ও 'মিশরকুমারী'র অভিনয় হয়। শেষোক্ত নাট্যানুষ্ঠানে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'আবন' ও নীহারবালার 'নাহরিন' খুব প্রশংসা পায়। ১৯৩০-এর জুন মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রাঙা-রাখী' মঞ্চস্থ হয়। 'রাঙা-রাখী' মঞ্চসফল হতে পারেনি। কিন্তু এই নাট্যানুষ্ঠানের প্রয়োগপদ্ধতি এবং 'সদাশিব মুখুজ্যে' দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সংবাদ' লিখেছিলেন ;

"সুদক্ষ রূপসজ্জাকর হিসাবে অহীন্দ্রবাবুর প্রশংসা করা বাহুল্য। সদাশিবের ভূমিকায় যে গুণটি তাঁকে বৈশিষ্ট্যশালী করে তুলেছিল সেটি তাঁর সংযম। অঙ্গভঙ্গির আতিশয্য বা কণ্ঠস্বরের অতিরিক্ত বিক্রম তাঁর অভিনয়ের মধ্যে একটিবারও আমাদের চোখ-কানকে পীড়া দেয়নি।"[৫]

অহীন্দ্র চৌধুরীর শেষদিকের অভিনয় আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা সেই অভিনয় দেখে মনে মনে 'সংবাদের' সমালোচনার সঙ্গে সহমত হয়েছি। অঙ্গরচনা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞান ছিল। তিনি অভিনয় করতেন কতকটা ইমোশান দিয়ে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে এবং চরিত্রানুযায়ী বাচনকলা প্রয়োগে। এতে কৃত্রিমতাটুকু চোখে পড়ত। কিন্তু বলতেই হবে, তিনি যতক্ষণ মঞ্চে থাকতেন, ততক্ষণ দর্শক তাঁকেই দেখতেন।

'রাঙারাখী'র পর মিনার্ভায় 'বেহুলা' মঞ্চস্থ হলো। হরনাথ বসু এই নাটকটি লিখেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলেও নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। হঠাৎ সেই পুরোনো নাটকটিই মিনার্ভায় দেখা দিল নতুন করে। এর কারণ মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর'। মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর'—বিপুল জনবন্দনা পায় এবং এর ব্যবসায়িক সাফল্য সমসাময়িক মঞ্চগুলির ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মিনার্ভায় 'বেহুলা' পরিমার্জিত হয়ে আবার এল। 'মণিভদ্রার সর্পনৃত্য' দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। ঐ চরিত্রে রূপদান করেন চারুশীলা। 'চন্দ্রধর' চরিত্রটি যথারীতি অহীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক রূপায়িত হয়। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'স্টেটস্‌ম্যান' লিখেছিলেন—

"Mr. Ahindra Chowdhury, who played the role of Chandradhar or Chand Sadagar, kept the audience almost spell-bound...He is second to none in India in the technique of make-up and has established his fame as the 'Indian Lon Chaney'."

'বেহুলা'র প্রশংসা হওয়ার অন্য কারণ—'ট্রিক্ সিন'। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :

"দর্শকদের মুখ চেয়ে এ বইতেও একটি ইল্যুশান সিন রাখতে হয়েছিল—সেটা ছিল একবারে শেষ দৃশ্যে। দেবতাদের বর ও আশীর্বাদ লাভ করে বেহুলা ফিরে পেলেন মৃত স্বামী লখীন্দরকে—এই ছিল দৃশ্যটির বিষয়বস্তু। জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, অগ্নির মধ্যে দিয়ে যাওয়া—এসব তো ছিলই, কিন্তু সব থেকে তাক-লাগানো ব্যাপার ছিল যেখানে শেষ দৃশ্যে মেদমাংস গলে-পচে যাওয়া কংকালটির বদলে উঠে বসলেন লখীন্দর পুনর্জীবিত হয়ে।"

'দেশের ডাক' (পূর্বনাম—'গুন্দা-কি-গুণ্ডা', 'লক্ষ্মীলাভ') মঞ্চস্থ হয় ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে। সর্বদিক থেকে নাট্যানুষ্ঠানটি সফল হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'দেশের ডাক' অভিনয়ানুষ্ঠানের ভূমিকা-লিপি এই রকম—

গুণধর—অহীন্দ্র চৌধুরী, কানাইলাল—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ—

রঞ্জিত রায়, অদ্ভুতকুমার—ব্রজেন সরকার, নিরঞ্জন—সুরেন রায়, লছমী—আঙ্গুরবালা, সুনীতি—আসমান, ভগ্নুস—রেণুবালা।

১৯৩১ সালের প্রথম ছয় মাসে মিনার্ভায় কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হয়নি। শরৎচন্দ্র ঘোষের 'অভিজাত' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় জুন মাসে। 'অভিজাত' সম্পর্কে মন্তব্য করে 'শিশির' লিখেছিলেন ;

"প্রযোজনার দিক দিয়া নাটক একেবারে নিখুঁত হইয়াছে বলা যায়। যে ধরণের নাটক অদ্যাবধি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, 'অভিজাত' ঠিক সে ধরণের নাটক নয়।"

'অভিজাত' নাট্যবোধসম্পন্ন দর্শকের কাছে আদৃত হয়েছিল। যাঁরা মঞ্চকৌশল সম্পর্কে উৎসাহী তাঁদের কাছে একটি সংবাদ নিবেদন করার আছে। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন,

"একটি সেটে সমগ্র নাটক অভিনীত হত। চার অংকে এই সেটের কিছু রকমফের হত। প্রথমে আভিজাত্যের চরম দিকটা দেখানো হত, এমনি করে পর্যায়ক্রমে শেষ অংকে দেখানো হত দারিদ্র্যের চরম অবস্থা।"

১৯৩১ সালের অগাস্ট মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুকসর্বস্ব নাটক 'কলির সমুদ্র মন্থন' অভিনীত হয়। এই নাটকের উৎসর্গ পত্রে বিষয়বস্তুর আভাস আছে। নাট্যকার লিখেছেন,

"কলির নীলকণ্ঠ যাঁরা, জগতের সমস্ত হলাহল গণ্ডূষে যাঁরা পান করছেন, আমার সেই কেরাণী ভায়েদের হাতে আমার এই নাটক উৎসর্গ করলাম।"

৯ অক্টোবর ১৯৩১-এ শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' অভিনীত হয়। 'কৈলাশ-খুড়ো'র ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রনাথের ভূমিকায় শরৎ চট্টোপাধ্যায় সুখ্যাতি লাভ করেন।

'ধরপাকড়', 'মানভঞ্জন', 'পদধূলি', 'হাটে হাঁড়ি,' 'অগ্নিশিখা' প্রভৃতি নাটকাভিনয়ের পর ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'বাসুকী' (১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩১) মঞ্চমায়ার জোরে উতরে গেল। দর্শকেরা—ইন্দ্রর সিংহাসন ধরে তক্ষকের স্বর্গ গমন, সর্পযজ্ঞের সময় সর্পকুলের আগুনে আহুতি প্রভৃতি মঞ্চমায়া দেখে হাততালি দিতেন। 'বাসুকী' অভিনয়ের সময় অভিনেত্রী উমাশশী ও নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মিনার্ভায় যোগ দিয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল ধরে মিনার্ভায় 'বাসুকী' অভিনীত হতে থাকে।

১৯৩২ সালের (১০ জুলাই) মিনার্ভার নতুন নাটক 'পুরোহিত'। নাট্যকার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। যে কারণেই হোক 'পুরোহিত' বেশিদিন চলেনি।

১৯৩২ সালটি মিনার্ভার পক্ষে মোটেই সুবিধার নয়। পাশাপাশি অন্যান্য থিয়েটার যখন দর্শনীর হার বাড়িয়ে দিতে থাকেন তখন মিনার্ভা টিকিটের দর কমিয়ে দিলেন। অর্থনীতির এই সূত্র ধরে দর্শকের হার বৃদ্ধি পেল বটে,

কিন্তু আয় আগের মতোই রইল। বছরের শেষে বড়দিনের সময় বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'দেবযানী' মঞ্চস্থ হয়। 'মিশরকুমারী'র মতো 'দেবযানী'ও বরদাপ্রসন্নের মঞ্চসফল নাটক। কাজেই 'দেবযানী' মিনার্ভাকে কিছু সময়ের জন্য সরগরম রেখেছিল।

১৯৩৩ সালে মিনার্ভায় 'দেবযানী' ও 'পুরোহিতে'র অভিনয় চলতে থাকে। অহীন্দ্র চৌধুরী এই সময় আবার ফিরে যান স্টারে। সেখান থেকে চলে গেলেন নাট্যনিকেতনে।

অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলে উপেন্দ্রনাথ মিত্র খুব ভাবনায় পড়লেন। টিকিটের মূল্য আরও হ্রাস করেন তিনি। গ্যালারীর দর্শক এখন আটআনার জায়গায় চারআনা দর্শনী দিয়ে থিয়েটারে প্রবেশাধিকার পেলেন। এই সময়ে মিনার্ভায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সে-ব্যবস্থাটি তিনঘন্টার নাট্যপ্রদর্শন। এর ফলে নাটকের মেদবাহুল্য কমে যায়। তিন অঙ্কের নাটক তিনঘণ্টায় ভালোভাবেই দেখানো হতে থাকে। মিনার্ভার এই নতুন ব্যবস্থাটি আজও পেশাদরী ও অপেশাদারী নাট্যগোষ্ঠী মেনে চলেছেন। ১৯৩৩-এর 'আঁধারে আলো' নাটকটির কথা রঙ্গমঞ্চসেবীরা তাই নিশ্চয়ই মনে রাখবেন। এটিই সর্বপ্রথম তিন ঘন্টার নাটক।

১৯৩৯ সালের মধ্যে মিনার্ভার মালিকানা হস্তান্তর হয়। উপেন্দ্রনাথ চলে যান স্টারে। তাঁর আমলে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল 'শক্তির মন্ত্র', 'বামনাবতার', 'মারাঠা মোঘল', 'শিবশক্তি', 'পরশুরাম', 'গয়াতীর্থ', 'শিবার্জুন'—প্রভৃতি নাটক।

দেলোয়ার হোসেন এবং চন্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে মহেন্দ্র গুপ্তের 'অভিযান' নিয়ে মিনার্ভার নতুন অভিযান শুরু হয়। এই সময়ের মঞ্চসফল নাট্যানুষ্ঠান—

'দেবী দুর্গা', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'জয়ন্তী', 'কবি কালিদাস', 'ব্লাক আউট', 'হাউসফুল', 'স্থপ্রিয়ার কীর্তি' ও 'ডাক্তার' প্রভৃতি।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি মিনার্ভা লিমিটেড কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। নতুন নট-নটীরাও যোগ দেন এই সময়ে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্ত, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদাসুন্দরী তখন মিনার্ভায়। শচীন সেনগুপ্তের 'কাঁটা ও কমলে'র খুব সুখ্যাতি হয় এই সময়ে। শক্তিমান নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালের ২২ জুন তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যান।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখেরা। তাছাড়া 'নাট্যভারতী' বন্ধ হওয়ার দরুণ কয়েকজন নাম-করা শিল্পী মিনার্ভায় যোগ দেন। অভিনেত্রী সরযূবালা এঁদের

একজন। রঙমহল থেকে এলেন (১৯৪৪-এ) রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাণীবালা। ছবি বিশ্বাসও এই বছরে মিনার্ভায় শিল্পী হিসাবে যোগ দেন। বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর নির্দেশনায় অভিনীত হয় 'দেবদাস', 'মিশরকুমারী' ও 'চন্দ্রশেখর'। তারাশংকরের 'দুই-পুরুষ' দীর্ঘকাল মিনার্ভায় যশ ও অর্থ এনে দেয়। ১৯৪৬ সালে মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন কমল মিত্র, রবীন্দ্র রায় প্রভৃতিরা। সে-সময়ের নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'। নাট্যরূপ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ১৯৪৭ সালে মিনার্ভায় 'কাশীনাথ' নাট্যানুষ্ঠানের সংবাদ পাচ্ছি। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন আবার ফিরে এসেছেন। মিনার্ভার পরবর্তী ইতিহাস বড়ই একরঙা। বিভিন্ন ভাঙাগড়ার পর মঞ্চটিতে আসেন নবযুগের নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত। উৎপল দত্তের কালেই মিনার্ভা আবার জনকল্লোল দেখে, গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয় সুপ্রাচীন থিয়েটারটি।

দুই দশকের উপর মিনার্ভা থিয়েটারের এই ইতিহাস পাঠে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, উৎপল-পূর্ব অধ্যায় পর্যন্ত এই থিয়েটারটি পালাবদলের স্বরূপ সন্ধানের সম্পূর্ণত যোগ্য পীঠভূমি নয়। বেশ কয়েকটি নতুন নাটকের অভিনয় হয়েছে এই মঞ্চে, একাধিক নতুন নট যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে, মঞ্চমায়াও সৃষ্টি হয়েছে দর্শক মনোরঞ্জনার্থে—কিন্তু যুগান্তরের বাণীটি এখানে স্তব্ধ। এর কারণ হিসেবে বলা চলে, মিনার্ভা শিল্পীদের থিয়েটার হয়ে ওঠেনি এই পর্বে। থিয়েটারের নামে বাণিজ্য করতে গেলে শিল্পের উৎকর্ষ কোনদিনই হয় না—আজও হচ্ছে না। পেশাদারী নাট্যশালার এইটাই নিয়তি। অপরেশচন্দ্রের আর্ট থিয়েটার বা প্রবোধচন্দ্র গুহ-র নাট্যনিকেতন তুলনামূলকভাবে মিনার্ভার থেকে উচ্চমানের ছিল। কারণ শিল্পীর স্বাধীনতা সেখানে ছিল অনেকটা প্রশস্ত। তবু আমরা উপেন্দ্রনাথ মিত্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব—কারণ তাঁরই একান্ত আগ্রহে মিনার্ভা কালের অতলে তলিয়ে যেতে পারেনি। এবং মিনার্ভা ছিল বলেই একালের কয়েকজন খ্যাতিমান প্রবীণ এবং নবীন নট ও নাট্যকার শিল্পবিকাশের সহজ ক্ষেত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন।

২ অপরেশচন্দ্র ও আর্ট থিয়েটার (১৯২৩-১৯৩৩)

১৯২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটার হস্তান্তরিত হলো আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের কাছে। সতীশ সেন, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল চন্দ্র হলেন এই লিমিটেড কোম্পানীর ডাইরেক্টর। প্রবোধচন্দ্র গুহ সেক্রেটারী। ১৪ এপ্রিল ১৯২৩ থেকে স্টারের মঞ্চে আর্টের জয়যাত্রা শুরু হলো।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেডকে স্বল্পকালের জন্য মনোমোহনেও পাওয়া যাবে। সেখানকার ম্যানেজার অহীন্দ্র চৌধুরী। অহীন্দ্র চৌধুরীর আর্ট থিয়েটার খুব

একটা উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা আর এক পর্বে সেই থিয়েটারের কথা বলব। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য হাতিবাগানের আর্ট থিয়েটার। যেখানে ম্যানেজার হিসেবে তখন ছিলেন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নানা কারণে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই থিয়েটারটি উল্লেখযোগ্য। বলা যেতে পারে, একমাত্র এই থিয়েটার থেকেই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের একটি যুগের অবসান ও অপর যুগের আরম্ভ হয়।

বাংলা থিয়েটারের দুটি যুগের কর্ণধার অপরেশচন্দ্রের কৃতিত্বেই আর্ট থিয়েটার সবিশেষ গৌরবান্বিত হয়। প্রয়োগপ্রধান অপরেশচন্দ্র তরুণ, স্বীকৃত ও শক্তিমান নটদের আহ্বান করেছেন আর্টে, উদীয়মানদের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং মঞ্চের প্রয়োজনে নিজেই কলম ধরেছেন। গিরিশচন্দ্রের মতো মহান প্রতিভাধর পুরুষ না হয়েও 'রসিকবাবু' অপরেশচন্দ্র খুব সহজে নিজেকে নতুন কালের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন এবং অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে তিনিই গিরিশোত্তর কালের অদ্বিতীয় ম্যানেজার।

'কর্ণার্জুন' নাটক নিয়ে আর্টের পর্দা ওঠে ১৯২৩ সালের ৩০ জুন। 'কর্ণার্জুন' নাটক হিসেবে অসাধারণ কিছুই নয়। অতি সাধারণ নাটক এটি। কিন্তু 'কর্ণার্জুন' নাট্যানুষ্ঠান হিসেবে অতুলনীয়। 'কর্ণার্জুন' নাটকের ভূমিকালিপিটি বিশেষ ভাবে মনে রাখার মতো :

> কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্তী, অর্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম অপরেশ মুখোপাধ্যায়, শকুনি—নরেশ মিত্র, ভীষ্ম সন্তোষ দাস, ভীম—ননীগোপাল দত্ত, দুর্যোধন—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, দুঃশাসন—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী, নিয়তি—নীহারবালা, দ্রৌপদী—নিভাননী, কুন্তী—হরিপ্রিয়া।

এই ভূমিকালিপির দিকে মনোযোগ দিলে বুঝতে পারা যাবে যে এই সময়ের স্মরণীয় ও বরণীয় অভিনেতৃ সম্প্রদায়টি (শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু বাদে) যেন আর্টে উপস্থিত।

তিন বছরের মধ্যে আর্ট থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' ২৫০ রাত্রি অতিক্রম করে। 'কর্ণার্জুন' বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের সেই গৌরবদীপ্ত নাট্যানুষ্ঠান যা সর্বপ্রথম দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করেছিল।

'কর্ণার্জুন' নাট্যানুষ্ঠানের সাফল্যের চাবিকাঠিটি কি? আমরা তো জানি যে, এই নাট্যানুষ্ঠানে কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া মঞ্চে স্থান পেত। এবং কর্ণ ও অর্জুন যুদ্ধ করত পাটকাঠির তীর দিয়ে; আর বৃষকেতুকে করাত দিয়ে কেটে দেখান হতো যে সে আসলে অক্ষত রয়েছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কোলে। পঞ্চাশের দশকে আমরা অপেশাদারী সৌখীন নাট্যসংস্থার 'কর্ণার্জুন' দেখেছি স্টারে। এঁরাও অপরেশচন্দ্র ব্যবহৃত এই সব উপকরণ ব্যবহার করেছেন অনায়াসে। আজও স্টারের সঞ্চয়ে 'কর্ণার্জুন' এর ঘোড়া আর কাঠের রথ

নিশ্চয়ই আছে—যদি না দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের লোলজিহ্বায় তা ভস্মীভূত হয়। হয়তো আছে 'গোলকুণ্ডা' নাটকে ব্যবহৃত কাগজের হাতিটি—যার উপর চড়ে 'আওরঙ্গজেব' যুদ্ধ করতেন। আজকের বিচারে এইসব হাস্যকর মঞ্চমায়া সত্ত্বেও কেন 'কর্ণার্জুন' দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছিল—এটাই আমাদের একান্ত জিজ্ঞাসা। উত্তরটি শচীন সেনগুপ্তের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন,

"কর্ণার্জুনে যে বাইরের সংঘাত আছে, যে গতি আছে, এবং ভাষার সেই সংঘাতকে এবং সেই গতিকে দর্শক মনে সংক্রমিত করবার যে শক্তি আছে, তা-ই শক্তিমান অভিনেতৃদের সহায়তায় দর্শকদেরকে মায়ালোকে সরিয়ে নিতে পারত।···দৃশ্যপটে এবং আবহে আধুনিকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে যদি ওই নাটকখানিকে ভারতীয় রীতিতে অথবা এলিজাবেথীয় রীতিতে পরিবেশন করা হোতো, তাহলেও এ-নাটকখানি দর্শক আকর্ষণ করতে পারত, যেমন পারত 'সীতা'। দুখানি নাটকেই আবৃত্তি ও আঙ্গিক অভিনয় নূতনত্বের পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।"[৬]

'কর্ণার্জুনের' পর 'রাজা ও রাণী' (২৯ আগস্ট) এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' (১০ অক্টোবর) অভিনীত হয়। ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারির মঞ্চসফল নাট্যানুষ্ঠান 'ইরাণের রাণী'।[৭] নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণভামিনীর 'রাণী' এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাজী' বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়।

এই বছরের জুলাই মাস থেকে আর্ট থিয়েটারের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। দানীবাবু এই সময়ে এলেন নতুন রূপে, নতুন শক্তিতে। আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দানীবাবুকে বিশেষ সমাদরে বরণ করে নিলেন। শহরের চারিদিকে হ্যাণ্ডবিল ও প্লাকার্ড দিয়ে সরবে ঘোষিত হলো 'চাণক্য—দানীবাবু'। গুণগ্রাহী দর্শকে স্টার মঞ্চ ভর্তি হয়ে যায়। দানীবাবু প্রাণপণ যত্নে দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকের অভিনন্দনলাভ করেন। ২৪ জুলাই ১৯২৪-এ দানীবাবুর চাণক্য আর্ট থিয়েটারকে ২৩০০ মুদ্রা পাইয়ে দিল। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন ঃ

"In spite of the presence of the new artists and the cowardly attempts of some to belittle him, Dani Babu was at his best and each night he appeared in old plays: Sales rose from Rs 1500/- to Rs. 2,300/- and even more,—when he was on the stage as Chanakya. The directors were all courteous and respectful to him and he was vigorous on the stage as a young man."[৮]

চাণক্যের অভিনয় দেখে জনৈক রুশদেশীয় ভদ্রলোক দানীবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে চান। দানীবাবু এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় রওনা হয়ে যান। কারণ—'উনি অভিনয় দেখেছেন, মানুষটিকে দেখলে বিপরীত ধারণা নিয়ে ফিরে যেতো ভাই, আর বলতো বাঙ্গলা দেশের অভিনেতাগুলো কি মুখ্যু!—আমি ভাই, আমার জাতের অপমান করবো? তাই চলে গিয়েছিলুম।' [অপরেশচন্দ্রের কাছে দানীবাবুর জবাবদিহি।]

দানীবাবু সম্পর্কে সেই রুশদেশীয় ভদ্রলোক বলেছিলেন:

"এরূপ অভিনেতা আমাদের ওখানে একরাত্রি অভিনয়ের জন্য অন্যূন একশত পাউণ্ড পান।"[৯]

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দানীবাবুর কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। কিন্তু পাশাপাশি আণ্টিগোনস্ ও সেলুকসের ভূমিকায় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অহীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকাও ছিল মনে রাখার মতো।

১৯২৪ সালের ৩০ অক্টোবর আর্ট থিয়েটারে পুনরভিনীত হলো 'সাজাহান'। সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল নরেশচন্দ্র মিত্রের। কারণ এর আগে (১৯২২-এ) তিনি মিনার্ভায় সাজাহান সেজেছিলেন। কিন্তু নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও নরেশবাবু অভিনয়ে অংশ নিলেন না, ফলে অহীন্দ্র চৌধুরীকে এই ভূমিকা রূপায়ণের ভার দেওয়া হলো। 'সাজাহান' বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের বেশ পুরোনো ও মঞ্চসফল নাটক। এই ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর আগে রূপ দিয়েছেন প্রিয়নাথ ঘোষ এবং কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। প্রিয়নাথ ঘোষ স্নেহবৎসল সাজাহানের রূপ দিতেন বটে, কিন্তু তাতে চরিত্রটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোত না। পরে কুঞ্জলাল চক্রবর্তী স্টারে আবেগদীপ্ত অভিনয়ের সাহায্যে 'সাজাহান'কে কিছুটা ব্যক্তিত্ব দানে সক্ষম হন। হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন:

"কুঞ্জবাবুর অ্যাকটিং-এ ফ্লো ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তা বেশ একঘেয়ে লাগত—কেমন একটা হাউ হাউ শব্দ কানে বাজত। তাছাড়া উত্তেজিত হয়ে উঠলে তিনি 'ন' অক্ষরটি 'ল' রূপে উচ্চারণ করতেন—যেমন না স্থলে লা। বৃদ্ধের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বেশ খাপ খেয়ে যেত।"[১০]

কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরী সাজাহান করতে এসে সম্পূর্ণ অভিনব উপস্থাপনার কৌশলে পূর্ববর্তী অভিনেতাদের অনায়াসে অতিক্রম করে গেলেন। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরী আজও অদ্বিতীয় 'সাজাহান'। আজ পর্যন্ত সাজাহানের যতগুলি অভিনয় হয় তাতে অহীন্দ্র পদ্ধতিই অনুসৃত হতে দেখি। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শেষবারের মতো অহীন্দ্র চৌধুরী এই চরিত্রটিতেই রূপ দিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে (১৯০৯-১৯৫৬) অবসর নিয়েছিলেন।

তাহলে অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহানের স্বরূপ কি? বিশিষ্ট মঞ্চ-গবেষক হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন:

"অহীন্দ্রবাবু সাজাহান ভূমিকায় পূর্বসূরীদের ধারণা বা কনসেপসান (conception) বিশেষ রদবদল করলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি বাজিমাৎ করলেন, গৌণ চরিত্রকে মুখ্য চরিত্রে পরিণত করলেন। এর কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে সাজাহান চরিত্র তাঁর কাছে তার প্রাপ্য ও প্রকৃত মর্যাদা পেল, তিনি ঐ চরিত্রকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে সুপ্রতিষ্ঠ করলেন, সম্রাট সাজাহানের মহিমা তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠল —এককথায় তিনি নিজে হাবেভাবে চলনে বলনে সম্পূর্ণ সম্রাট সাজাহান হয়ে গেলেন, নিজের সত্তাকে সাজাহান চরিত্রে নিমজ্জিত করলেন।

সাজাহান পক্ষাঘাতে পঙ্গু ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর চিত্রণ যে সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম দৃশ্যেই পাঞ্জা নিয়ে ওঠবার সময়ে দর্শকেরা দেখলে যে সাজাহান পঙ্গু পা টেনে চলছেন, তখনই সবার মুখে চাঞ্চল্য জেগে উঠল। অহীন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর ছিল ভাঙা ভাঙা, কিন্তু সাজাহান ভূমিকার অভিনয়ের উৎকর্ষে সে ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়। বহু দর্শক রীতিমত অহীন্দ্র চৌধুরীর ভক্ত বা ফ্যান (Fan) হয়ে উঠলেন।"

'সাজাহান' নাট্যানুষ্ঠানের (১৯২৪, ৩০ অক্টোবর) ভূমিকালিপিটি ছিল এ রকম:

সাজাহান—অহীন্দ্র চৌধুরী, দারা—তিনকড়ি চক্রবর্তী, ঔরংজেব–দানীবাবু, দিলদার–নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সোলেমান—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ–রাধাচরণ ভট্টাচার্য, জাহানারা–কুসুমকুমারী, পিয়ারা—আশ্চর্যময়ী, জহরৎ—আশালতা, মহামায়া–নিভাননী।

অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহান বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর পাশাপাশি সহযোগী অভিনেতা হিসেবে নির্মলেন্দু লাহিড়ী এবং দানীবাবু বিশেষভাবে সম্মানিত হন।

'সাজাহান' নাটকের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুবিজ্ঞ ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র আবার 'জনা' নাটক মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সকলের অনুরোধে প্রবীণ দানীবাবু আবার প্রবীর হয়ে দর্শকের অভিনন্দন কুড়িয়ে নিলেন—৩ জুন ১৯২৫। আর্ট থিয়েটারের নবীন উদ্যম ও অধ্যবসায়কে স্বাগত জানিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখলেন, (২১ জুন, ১৯২৫)—

Those who have witnessed the older days performance of Girish Chandra's masterpiece 'Jana' on the board of the old

Minerva Theatre with the immortal author as Bidushak, young Dani Babu as Prabir and the great actress late Miss Tincowrie as her speciallity—would undcubtedly admire the bold venture by the authorities of the Art Theatre Limited in reviving the popular play with their present combination cf staff at the disposal."

দানীবাবুর প্রশংসা তো হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দিত হলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী ও সুশীলাসুন্দরী—যথাক্রমে বিদূষক ও জনার রূপদানে।

১৬ জুন ১৯২৫-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলো। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডার গঠিত হয়। আর্ট থিয়েটার উক্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে অপরেশচন্দ্র লিখিত একটি সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহ করে দেন।

১৮ জুলাই ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ হয়। 'চিরকুমার সভা'য় অপরেশচন্দ্র রসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চন্দ্রের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু এবং অক্ষয়ের ভূমিকায় নামেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। 'চিরকুমার সভা-'র অভিনয়ের সময় আর্ট থিয়েটারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন দীনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। সঙ্গীতের দিকটা দেখিয়ে দিলেন দীনেন্দ্রনাথ আর মঞ্চের দিকটা অবনীন্দ্রনাথ। কবি রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা'র দ্বিতীয় অভিনয়ের দিন (২৫।৭।২৫) স্বয়ং উপস্থিত হলেন। এই অভিনয়, 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দিয়েছিল। অপরেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 'রসিকবাবু' আখ্যা দেন, আর চন্দ্রবাবু সম্পর্কে বলেন—'ওটি অহীন্দ্রের একটি সৃষ্টি'।

২৮ অগাস্ট ১৯২৫-এ মঞ্চস্থ হলো 'চন্দ্রশেখর'। রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চন্দ্রশেখর এবং দুর্গাদাসের প্রতাপ, সুশীলাসুন্দরীর শৈবলিনী ও আশ্চর্যময়ীর দলনী—পুরোনো নাটকের দেহে নতুন উত্তাপ সঞ্চার করে।

রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' (৫।১২।১৯২৫), নরেশচন্দ্র সেনের 'ঋষির মেয়ে' (২৫।১২) অভিনীত হলো; ১৯২৬-এ আবার মঞ্চস্থ হয় 'সরলা'। দানীবাবু গদাধরের ভূমিকায় এই বয়সেও দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তিনকড়িবাবুর শশিভূষণ ও নির্মলেন্দুবাবুর বিধুভূষণও দেখবার মতো হলো। এই বছরের (১৯২৬, ১৫ মে) নতুন নাটক অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ'। ২৩ মে সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ফরোয়াড' পত্রিকা' লিখলেন,

"Tincourie Babu gave a very smart representation of Srikrishna. As to Mr. Surendranath Ghose, the lovers of the histrionic art were longing to see him in a new role from a

long time and the audience were simply charmed with his masterly representation of the character (Bhisma). Mr. Ahin Choudhury as Durjodhan ably represented his part and so did Radhikananda Mukherjee as Sisupal."

অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকটি 'কর্ণার্জুনে'র মতো সহজ ও সরল নয়। ঘটনা সংস্থাপনে নাট্যকারের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন আছে। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই নাটকটির বিস্তারিত সমালোচনা করে নাট্যকারের ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি 'শ্রীকৃষ্ণ' উতরে গেল কতকটা অভিনয়ের জোরে এবং "ওই শ্রীকৃষ্ণ নাটকেই দেখানো হোতো শ্রীকৃষ্ণের হস্তচ্যুত সুদর্শনচক্র অগ্নিবৃত্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে মহাবীর শিশুপালের শিরশ্ছেদন করছে। ওই নাটকের জন্য প্রচার করা হয়েছিল, খাস কাশী থেকে পঞ্চাশখানা বারাণসী ধুতি ও শাড়ি আনা হয়েছিল।"[১১]

এত চেষ্টা করেও 'শ্রীকৃষ্ণ' বেশিদিন চলেনি। 'লাখ টাকা' (৭।৭।১৯২৬), 'শোধবোধ' (২০।৭।১৯২৬), 'বন্দে মাতরম্' (১০।১১।১৯২৬) প্রভৃতি নাট্যানুষ্ঠানের পর 'চণ্ডীদাস' নাট্যানুষ্ঠানটি অভিনয়ে ও গানে মঞ্চসাফল্য আদায় করে। তিনকড়ি চক্রবর্তীর চণ্ডীদাস এবং নীহারবালার রামী আর্টের সুনাম বাড়িয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' (১০।৯।১৯২৭), 'মগের মুল্লুক' (৩।১২।১৯২৭) প্রভৃতি নাটক তেমন জমল না। কিন্তু 'চাঁদ সদাগর'-এ অহীন্দ্র চৌধুরী ও নীহারবালা আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সুনামকে বর্তমান চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে ছড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ মনোমোহনে আর্টের ছায়াছত্রতলে 'চাঁদ সদাগর' মঞ্চস্থ হয়। ১৯২৭ সালে দানীবাবু আর্ট ছেড়ে চলে গেলেন। বড়দিনের সময় মঞ্চস্থ হলো 'প্রতাপাদিত্য'। এই সময়ে তারাসুন্দরী আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন। 'ফুল্লরা' এবং 'রজনী' নাট্যানুষ্ঠানের সময় এলেন মহর্ষি (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) এবং সন্তোষ সিংহ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'ভাঁড়ু দত্ত' ও সন্তোষ সিংহের 'শচীন্দ্র' অভিনয়ে নতুনত্বের ছাপ রাখে।

১৯২৯ সালের ২৩ নভেম্বর 'মন্ত্রশক্তি' (অপরেশচন্দ্র কৃত নাট্যরূপ এবং কাহিনী অনুরূপা দেবীর) সাড়ম্বরে মঞ্চস্থ হয়। দীর্ঘদিন পরে আর্ট থিয়েটার একটি সামাজিক নাটকের অভিনয় করেন এই সূত্রে। নাটকটির বক্তব্যে সামাজিক বাঙালী সমাজ বিশেষ তৃপ্ত হন।[১২] 'মন্ত্রশক্তি' নাট্যাভিনয়ের চরিত্রগুলিতে রূপ দেন :

মৃগাংক — অহীন্দ্র চৌধুরী, রমাবল্লভ — কুঞ্জলাল সেন, মথুরো — তিনকড়ি চক্রবর্তী, অম্বর — ইন্দু মুখোপাধ্যায়, পরাণ — তুলসী চক্রবর্তী, বাণী —

কৃষ্ণভামিনী, কৃষ্ণপ্রিয়া—কুসুমকুমারী, তুলসী—সুবাসিনী, অম্বা—সুশীলা-বালা, জহুরা—রাজলক্ষ্মী।

'মন্ত্রশক্তি' সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন—

"প্রথম রাত্রি থেকেই 'মন্ত্রশক্তি' লোকের মনে ধরেছিল। এ বইতে কত লোক যে কত মেডেল দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, সিলেটের জমিদার গোপিকাবল্লভ রায় তিনকড়িবাবুকে, আমাকে আর কৃষ্ণভামিনীকে বহুমূল্য পাথর বসানো পদক উপহার দিয়েছিলেন।"

'মন্ত্রশক্তি' অভিনয়ের পরপরই অহীন্দ্র চৌধুরী আর্ট থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভায় যোগদান করেন। অন্যদিকে 'নাট্যমন্দির' (কর্নওয়ালিশ থিয়েটার) বন্ধ করে দিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী কয়েক মাসের জন্য যোগ দেন আর্টে।

আর্ট থিয়েটারে কয়েক মাসের জন্য যোগদান করে শিশিরকুমার উন্নত অভিনয়শিল্প প্রদর্শনের সুযোগ পান। 'চিরকুমার সভার' চন্দ্রবাবু ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। এবারের চন্দ্রবাবু স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। বলা-বাহুল্য নাট্যাচার্যের চন্দ্রবাবু বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রবাবু হয়ে উঠল। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,

"অহীন্দ্রবাবুর 'চন্দ্রবাবু'তে এই আত্মভোলা ভাব ব্যক্তিটিরই বাধর্ক্যেরই ফলস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উহা যে বার্ধক্যের ভ্রান্তি নয় তাহা বলা বাহুল্য। উহা ব্যক্তিটিরই চারিত্রিক লক্ষণ। শিশিরকুমারের অভিনয়ে এই আত্মভোলা ভাবটি চন্দ্রবাবুর স্বাভাবিক প্রতিফলন রূপেই প্রদর্শিত হয়। চন্দ্রবাবুর আহারের ব্যাপারেও অহীন্দ্র-শিশিরকুমারের প্রভেদ বিশেষ ভাবে চোখে না পড়িয়া পারে না। চন্দ্রবাবুরূপী অহীন্দ্রবাবু একটি রসগোল্লা দিয়া যাত্রাসুলভ চেষ্টায় লোক হাসাইয়া থাকেন কিন্তু চরিত্রটি যে হাস্যকররূপে মাটি হইল সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন না।"[১৩]

'মন্ত্রশক্তি' নাটকে 'মৃগাংক' চরিত্রেরও নব-রূপায়ণ ঘটে শিশিরকুমারের অভিনয়ে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যে কতটা স্ব-ভাবিত ছিলেন তাঁর প্রমাণ হয়ে যায় 'মন্ত্রশক্তি'র বেলায়। 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয়ের অবসরে একদিন শিশিরকুমার অপরেশচন্দ্রকে বলেন—

'মশায় এমনই কোরে আমাদের মাথাটা খাচ্ছেন। আপনার লেখা কথাগুলো একটু জোরে বললেই হাততালি পাওয়া যায়।' অপরেশচন্দ্র বললেন, 'যাক মশায় তবু কথাটা বললেন। আমাকে তো কেউ আমলই দিতে চায় না।'[১৪]

আর্ট থিয়েটারে থাকাকালীন শিশিরকুমার 'চাণক্য', 'সাজাহান' ও 'কর্ণ' চরিত্রেরও নতুন রূপ দেন। নাট্যাচার্যের অভিনব পরিকল্পনায় এই তিনটি চরিত্র সম্পূর্ণ নতুন রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'সাজাহানের' কথাই ধরা

থাক্। 'সাজাহান' চরিত্রের যে নতুন পরিকল্পনা করেন অহীন্দ্র চৌধুরী সে-কথা আগেই বলেছি। আমরা সেখানে দেখেছি 'সাজাহান' বৃদ্ধ ও পঙ্গু। অহীন্দ্র চৌধুরী সাজাহানের এই দৈহিক অসুস্থতাকে দেহ দিয়ে ইমোশান দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন। মঞ্চে সেই অভিনয়ে ঝড় উঠত। শিশিরকুমার আর্টে যোগদান করে এই বিতর্কিত চরিত্রে রূপদান করেন। সাধারণ কোন অভিনেতা হলে এক্ষেত্রে মঞ্চবন্দিত অহীন্দ্রবাবুকেই অনুসরণ করতেন, যাতে প্রমাণিত হতো যে, দ্বিতীয় অহীন্দ্রবাবু হওয়া এমন কিছুই নয়।

শিশিরকুমার অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় রীতিকে মোটেই অনুসরণ করলেন না। তিনি প্রথম থেকে বুঝে নিয়েছিলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের উপর শেক্সপীয়রের 'King Lear'-এর প্রভাব থেকেই সাজাহান চরিত্রের সৃষ্টি। সুতরাং সাজাহানের পঙ্গুত্ব বাহ্যিক নয়, আন্তরিক। তাই শিশিরকুমারের সাজাহান দৈহিক পঙ্গুত্বকে অতিক্রম করে মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ততায় রূপ পেল। তাছাড়া প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার নাটকের সংলাপ একটু-আধটু পরিমার্জনাও করলেন।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,

"মূল নাটকে আছে প্রথম অংক সপ্তম দৃশ্যে মহম্মদ চলিয়া গেলে সাজাহান চীৎকার করিয়া থাকেন—'মহম্মদ! মহম্মদ!' কিন্তু মহম্মদ সে ডাকে সাড়া না দিয়াই চলিয়া যায়। সাজাহান তখন অর্ধস্বগত ভাবেই বলেন—'চলে গেল! চলে গেল!' অভিনয়কালে শিশিরকুমার এই সংলাপের পরিবর্তন সাধন করেন। শত অনুনয়ের পরেও মহম্মদ চলিয়া গেল দেখিয়া সাজাহানরূপী শিশিরকুমার অসহায়ভাবে ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার মর্মস্থল ভেদ করিয়া একটি আর্তনাদই বাহির হইয়া আসে—'এ্যায় খোদা! এ্যায় খোদা!'[১৫]

কয়েক মাস আর্টে অভিনয় করার পর শিশিরকুমার আমেরিকায় চলে গেলেন। এই সময়ে আর্ট থিয়েটার কিছুদিনের জন্য সুনাম হারিয়ে ফেলে। দানীবাবু নেই, দুর্গাবাবু, নির্মলেন্দুবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী সকলেই তখন অন্যত্র। ভাঙাহাটে পড়ে আছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে শিশিরকুমার ফিরে এলেন, নাট্যনিকেতনে শিশিরকুমার-দানীবাবু একই মঞ্চে অভিনয় করলেন।

অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর ভাষায় 'জিত পায়া' তখন দানীবাবুর। দানীবাবুর এই নতুন যশে আকৃষ্ট হয়ে আর্ট থিয়েটার চড়া দরে দানীবাবুকে কিনে নিয়ে এলেন।

'মন্ত্রশক্তি'র মথুরো এই পর্যায়ে দানীবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য অভিনয়। তারপর 'শ্রীগৌরাঙ্গ' (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) নাটকে দানীবাবু একই সঙ্গে

রামানন্দ ও চাপালগোপালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। 'লিবার্টি' (১৭. ১ ১৯৩১) লিখলেন :

"Dani Babn has astonished us by appearing in a dual role. His rendering of Chapal Gopal proves, if any proof is necessary that he is not to be beaten even in this old age."

'পোষ্যপুত্র' নাটকে দানীবাবু জমিদার শ্যামকান্তের ভূমিকায় যেন জীবন-দীপ নির্বাণের আগে একবার দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। অনুরূপা দেবীর গার্হস্থ্য রসাশ্রয়ী কাহিনী অপরেশচন্দ্রের মার্জনায় নতুন রূপ পেয়েছিল। আর অভিনয়? হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ভাষায় 'বলিদানে' গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে যে সামান্য ত্রুটিটুকু ছিল 'পোষ্যপুত্রে' দানীবাবু সে-ত্রুটি মুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২৭ মার্চ তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রতিবেদক হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছিলেন,

"Dani Babu (S. N. Ghose) acted the part of Shamakanta It is indeed a treat to see that old veteran in his elements again, as if he has got back his youthful fire. He reminded us often of his illustrious father, Girishchand a Ghose, the greatest actor and the father of Bengali stage."

'পোষ্যপুত্র' নাট্যানুষ্ঠানের সময় আর্ট থিয়েটারের দর্শনী বাবদ আয় ছিল প্রতি রাত্রিতে ২,৬০০ টাকা। দুর্ভাগ্য আর্টের। 'পোষ্যপুত্র' অভিনয়কালে দানীবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সাতাশ রজনী 'পোষ্যপুত্র' অভিনয় চলার পর এই আকস্মিক বিপর্যয়। ২৮ নভেম্বর ১৯৩২-এ দানীবাবু চিরকালের জন্য জীবনরঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন। দানীবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু হলো [জুন, ১৯৩৩]। আর্ট থিয়েটারের কর্ণধার অপরেশ-চন্দ্রের শরীরেও ইউরোমিয়া আক্রমণের বাহ্য লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে ১৯৩৩-এ পুরোনো ঋণের দায়ে করনানী ব্যাংক আর্ট থিয়েটারের উপর ডিক্রি পেয়ে গেল। আর্টের 'সাজান বাগান' চিরকালের জন্য 'শুকিয়ে গেল'।

একটি দশক জুড়ে আর্ট থিয়েটার তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে। ১৯২৯-৪৪ পর্বের এমন কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী নেই যিনি আর্টে অভিনয় করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অপরেশ-চন্দ্র প্রভৃতিদের নাটক, এমনকি অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' পর্যন্ত আর্টের সংস্পর্শে নবীন হয়ে উঠেছে। মঞ্চমায়া সৃষ্টির কিছু কিছু ব্যবস্থাও হয়েছে এই থিয়েটারে; এই রঙ্গমঞ্চই প্রমাণ করেছে তিন বছর ধরে একটি নাটকের অভিনয় চললেও তা পুরোনো হয় না। রবীন্দ্রনাথ-দীনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি

পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিরাও 'আর্ট'-এ পদার্পণ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় আর্ট থিয়েটার সস্তা রুচির কাছে সম্পূর্ণত পরাস্ত হয়নি। অণুমাত্র হলেও আর্টের চর্চা হয়েছে এখানে।

৩. মিত্র থিয়েটার – ১৯২৬-২৭

'বিনামেঘে বজ্রনির্ঘোষ—শুনিয়া চমকাইবেন না, সত্যই
মিত্র থিয়েটারে
নাট্যাচার্য শ্রীঅমৃতলাল বসু
এইবার আপনারাই বলুন মিত্র থিয়েটার অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে কিনা?'
[নাচঘর, ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৩]

শুরুতেই বলে নিতে হচ্ছে যে, মিত্র থিয়েটার স্বল্পপ্রাণ থিয়েটার। মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার মিত্রের উদ্যোগেই এই থিয়েটারটি সংগঠিত হয়েছিল। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' নাটকটি নিয়ে আলফ্রেড মঞ্চে এঁরা আসন পেতেছিলেন। 'শ্রীদুর্গা' সহায় হলেন না। এদিকে শিশিরকুমার মনোমোহন থেকে সরে যেতেই মিত্র থিয়েটার তাঁদের আসর গুটিয়ে চলে এলেন সেখানে।

নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর সঙ্গে শেষদিকে স্টার কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হয়। তিনি এইবার মিত্র থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে চলে এলেন। মিত্র পরিবার বেশ ধনী ছিলেন। তাঁরা জাঁকজমকের কোনো ত্রুটি করলেন না। ১ ডিসেম্বর, ১৯২৬-এ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডারবি টিকিট' দিয়ে মিত্রের চলা শুরু হলো। 'ডারবি টিকিট' মিত্র থিয়েটারকে ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করল না। মিত্র থিয়েটারের ম্যানেজার স্থবির অমৃতলালের পক্ষে অসম্ভব ছিল নতুন কালকে স্বীকৃতি দেবার। আবার পুরোনো কালের প্রতি তাঁর মমতাও ছিল যথেষ্ট। ফলে মিত্র থিয়েটারে অভিনীত হ'তে থাকল – 'শ্রীদুর্গা' (৪।১২।১৯২৬), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (৫।১২), 'বঙ্গে বর্গী' (১২।১২), 'দুর্গেশনন্দিনী ও আলিবাবা' (১৯।১২), 'দেবলাদেবী' (২৫।১২), 'পরদেশী' (১।১।১৯২৭), রাণী দুর্গাবতী (১৬।১)।

মিত্র থিয়েটারে নতুন ও পুরোনো কালের অনেক নামকরা শিল্পীকে আমরা পেয়েছি। পুরোনোদের মধ্যে আছেন –অমৃতলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী। নতুন মুখ হিসেবে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, নিভাননী প্রভৃতির নাম করতে পারি। কিন্তু এই সব শিল্পী থাকা সত্ত্বেও মিত্র থিয়েটার অভিনয়কলায় নতুন কোন মাত্রা

সংযোজনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই ১৫ জানুয়ারী ১৯২৭ 'নবযুগ' পত্রিকা লিখেছিলেন :

"গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির, মিনার্ভা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই অভিনয় কলাকে উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সামান্য কিছু ফললাভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ মিত্র সম্প্রদায় প্রাণপণ চেষ্টায় আবার সেই পুরাতন যুগকে ফিরাইয়া আনিতেছেন, ইহার কারণ কি ?"

সংবাদপত্রের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে মিত্র থিয়েটার নিত্য নতুন নাট্যাভিনয় করে যেতে থাকলেন। কি পরিমাণ অর্থ এর জন্য ব্যয়িত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এতেও মিত্র থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিচলিত হলেন না। বরং বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাঁরা পরিকল্পনা করলেন ও সেইমত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং অহীন্দ্র চৌধুরীকে থিয়েটারে নিয়ে আসবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালালেন ; কিন্তু 'সোনার হরিণ' মিলল না। ১৯২৭ সালের মে মাসে খুড়ো-ভাইপো নিরস্ত হলেন। যতদূর জানি, এঁরা আর কোনদিন থিয়েটার গড়ার স্বপ্ন দেখেননি।

মিত্র থিয়েটারের আকস্মিক আগমন ও অন্তর্ধানের রহস্যটি কি ? 'নাচঘর' পত্রিকার (১০।৬।১৯২৭) একটি মন্তব্য উদ্ধার করলেই এই রহস্যের কিনারা খুঁজে পাওয়া যাবে :

"খুব উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় রস জনসাধারণ হয়তো গ্রহণ করতে পারে না। আবার একেবারে ওঁচা নাটক অভিনয় করলেও যে রঙ্গালয় অচল হয়, 'মিত্র থিয়েটারে'র পতনে সেটা বোধহয় সকলে বুঝতে পেরেছেন। 'শ্রীদুর্গা' বা 'দেবলাদেবী'র মত নাটকের কাল এখন গিয়েছে।"

'নাচঘর' পত্রিকার উপরোক্ত সমালোচনাটি আমাদের কাছে সবিশেষ মূল্যবান। ১৯২৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ধারা ও মঞ্চকুশলতা যে মোটামুটি-ভাবে একটা নতুন পথের পথিক হতে পেরেছিল তা 'নাচঘর' এর সমালোচনায় স্পষ্ট। ঊনবিংশ শতকের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখেছি—যেন-তেন-প্রকারেণ নাট্যানুষ্ঠান করলেই দর্শক পাওয়া যেত। 'ওঁচা' নাটকের অভিনয় বরং বেশি 'রজতচক্র' এনে দিত। কিন্তু বিশ শতকের ত্রিশের দশকের দর্শকেরা ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতাটুকু পেয়েছিলেন। অপরেশচন্দ্র বা শিশির-কুমার আর কিছু না দিতে পারলেও কিছু ভালো দর্শক তৈরী করতে পেরেছিলেন। এই দর্শকেরা মিত্র থিয়েটারে এসে পয়সা নষ্ট করতে চাননি। ফলে মিত্র থিয়েটারের অকালমৃত্যু হলো।

মিত্র থিয়েটারের প্রধান পুরুষ অমৃতলালের পক্ষে বৃদ্ধবয়সে সংগঠন করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু নির্মলেন্দু লাহিড়ী তো বয়সে তরুণ ছিলেন, তিনি

কেন পারলেন না থিয়েটারের হাল ধরতে? প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক। এর উত্তর হিসেবে বলা যায়, থিয়েটারের অধ্যক্ষ হবার ক্ষমতা এই অধ্যায়ে চারজনের ছিল — ক. অপরেশচন্দ্র, খ. শিশিরকুমার, গ. অহীন্দ্র চৌধুরী, ঘ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্মলেন্দু লাহিড়ী ভালো নট ছিলেন ঠিকই, তবে নাট্যদল সংগঠনের ক্ষমতা ছিল না তাঁর। দর্শকদের টিপ্পনীর জবাবও তিনি দিতে পারতেন না। ফলে মিত্ররা তাঁর উপর নির্ভর না করে অহীন্দ্র চৌধুরীকে আনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। অহীন্দ্র চৌধুরী যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন মিত্রদের নাভিশ্বাস উঠেছে। ফলে সেই মঞ্চে দেখা দিল আর্ট থিয়েটার ১৯২৭, জুন ১।

৪. আর্ট থিয়েটার লিমিটেড—১৯২৭-২৮

হাতিবাগানের আর্ট থিয়েটার যখন সগৌরবে চলে প্রচুর অর্থ খ্যাতি নিয়ে এসেছিল, তখন কর্তৃপক্ষ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর্টের কিছুসংখ্যক শিল্পী সমবায়ে মনোমোহনেও আরেকটি সংসার পাতলেন। প্রধানত, প্রবোধচন্দ্র গুহের ইচ্ছাতেই আর্টের এই নতুন সংসারের পত্তন হয়। এতে আর্টের প্রসার যেমন ঘটল, তেমনি কিছুসংখ্যক শিল্পী উপকৃত হলেন। বিশেষ করে অহীন্দ্র চৌধুরী এই থিয়েটারের প্রযোজক ও পরিচালক রূপে স্থান পেলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে এলেন—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, আশ্চর্যময়ী, সুশীলাসুন্দরী (ছোট), রাণীসুন্দরী প্রমুখ। প্রখ্যাত গায়ক মৃণালকান্তি ঘোষকেও নিয়ে আসা হলো।

১৯২৭ সালের ১লা জুলাই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীরামচন্দ্র' নিয়ে মনোমোহনের মঞ্চে আর্ট অবতীর্ণ হলো। অপরেশচন্দ্রের নাটক ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনাধন্য এই নাট্যানুষ্ঠানটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণায় 'শ্রীরামচন্দ্র'কে ধরে রেখেছেন এইভাবে —

"বইটির লেখা খুব জমাট। প্রত্যেকটি দৃশ্যই চমৎকার জমে যেত। পাকা লোক সব, অভিনয়ও সকলে করতেন চমৎকার। দশরথ যতটা বৃদ্ধ হওয়া উচিত, আমি ততোধিক বৃদ্ধ করতাম, 'রাবণ' চরিত্রের বিপরীতার্থক চিত্রায়ণ হিসাবে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য যেখানে শেষ হচ্ছে তার কথা বলি। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেয়ে নিয়ে তাড়কা বধ করতে রওনা হলেন আর শূন্য মঞ্চে উচ্চ সিংহাসন থেকে মূর্ছিত দশরথ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে এসে

পড়লেন—নিস্পন্দ নিথর! সংলাপটা ছিল—'ওরে নয়নের মণি, রামচন্দ্র মণিহারা বাঁচিব কেমনে ?…… …

… – …দুর্গা ছিল 'ডেয়ার ডেভিল' প্রকৃতির: নাটকের শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে রাম ও রাবণের যুদ্ধ ছিল, পরিণতি রাবণের মৃত্যু; তার সঙ্গে প্রতি রাত্রেই রুটিন-মাফিক তরবারি যুদ্ধ করি। একদিন হয়েছে কি, হয় আমারই মারার জোর হয়ে থাকবে, আর নয় দুর্গারই তরবারি জীর্ণ হয়ে থাকবে, ওর তরবারি একেবারে মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ওর বাঁ হাতটা কেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল।

……দুর্গা ভিতরে এসে ক্ষতস্থানটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসিমুখে রহস্য করেই বললে—ও কিছু নয়। যুদ্ধ করলাম ডান হাতে, কাটলো বাঁ হাত।"

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অকৃত্রিম অধ্যবসায়ের গুণে নাটক যে কিভাবে প্রাণ পেতে পারে তার ইতিবৃত্ত পাঠ করা গেল। এই প্রসঙ্গে বলতে হবে যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'নাচঘর' প্রভৃতির মন্তব্যে 'শ্রীরামচন্দ্র' রসোত্তীর্ণ হওয়ার খবর পেয়েছি। তবে 'নাচঘর' লিখেছিলেন,

"দৃশ্যপটাদি কোন বিশেষ যুগের শিল্পভঙ্গীকে প্রকাশ করতে না পারলেও, জনসাধারণের পক্ষে উপভোগ্য হবে। লংকাদাহন দৃশ্যটি সকলকেই অভিভূত করবে।" [১৫।৯।১৯২৭]

প্রসঙ্গত বলতে পারি এতে প্রমাণিত হয় 'নাট্যমন্দিরের' শিল্পভাবনা আর্টের মঞ্চে অনুপস্থিত ছিল। শিল্পভাবনা বলতে এখানে অভিনয়ের বাইরের চমক বোঝাবে না। বোঝায় রুচি। অহীন্দ্র চৌধুরীর গুণ ও দোষের কারণ তাঁর থিয়েটারী অভিনয়, তাঁর অভিনয়ের ইচ্ছাকৃত প্যাঁচ। 'নাট্যমন্দিরে' এই অহেতুক থিয়েটারী প্যাঁচ ছিল না, ছিল সুস্থ রুচি যা অভিনয়কে কাব্যস্পর্শী করে তুলত ক্রমে ক্রমে। আসলে 'যেন-তেন-প্রকারেণ' 'উপভোগ্য' করে তোলার একটা অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল অহীন্দ্রবাবুর। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অনেক সময় এই 'উপভোগ্য' নাটকের বিরোধী ছিলেন। 'নাট্যমন্দির' প্রসঙ্গে এসব কথা বিস্তৃতাকারে বলবার সুযোগ আসবে, এখন আর্টের আরও কয়েকটা অভিনয়ের কথা বলব।

বেশ কিছুকাল ধরে প্রতি শনি-রবিবার মনোমোহনের আসর জমিয়ে রাখল 'শ্রীরামচন্দ্র'। শনি-রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিন আর্টের দুই সংসার একত্র হতো। কখনো হাতিবাগানের দল আসতেন মনোমোহনে, আবার কখনো মনোমোহনের দল হাতিবাগানে। নতুন নাটকের অভিনয় করা হোত না। শনি-রবি ছাড়া অন্যান্য দিন চলত 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'রাজসিংহ'।

অতঃপর ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ আর্টের নতুন নাটক 'চাঁদ সদাগর'। নাট্যকার মন্মথ রায়। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত আগ্রহে ও অহীন্দ্র চৌধুরীর ইতিবাচক সমর্থনে 'চাঁদ সদাগর' মঞ্চস্থ হলো। দেড়মাস ধরে মহলার পরে 'চাঁদ সদাগর' অভিনয় হয়। স্টেজ ম্যানেজার কালীবাবু ও ম্যানেজার প্রবোধচন্দ্র গুহ মঞ্চমায়া সৃষ্টির দিকটি সমাধা করলেন, নৃত্যের তত্ত্বাবধান করলেন—ললিতমোহন গোস্বামী, অভিনয়ের দিকটি অহীন্দ্র চৌধুরীর একক তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হয়ে উঠল। অভিনয় দেখে দর্শকেরা খুশি হলেন। থিয়েটার বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'নাচঘর' লিখলেন,

> "………শ্রীমতী নিভাননী মনসার ভুমিকায় অভিনয় চমৎকার করেছেন। নেতার ভূমিকায় আশ্চর্যময়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। আস্তিকের ভূমিকায় সুকান্ত শ্রীমান জয়নারায়ণ সুন্দর অভিনয় করেছেন। জনৈকা 'নবীনা' অভিনেত্রীর 'তরুণী'র অভিনয়ও মন্দ হয়নি। কিন্তু সকলের চেয়ে চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়। তাঁর রূপসজ্জাও যেমন সুন্দর হয়েছিল, তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল তেমনি চমৎকার।……" [২৩।৯।১৯২৭]

এই সময়ের আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধার করা যায়। কিন্তু সে-সব পত্রিকা এখনও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠেনি এবং তাঁদের মন্তব্যে 'নাচঘর'-এর বক্তব্যই নতুন ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। কাজেই বাহুল্যবোধে আমরা সেই মন্তব্যগুলি চয়ন করছি না।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মন্তব্য পাঠে এবং 'চাঁদ সদাগর' নাট্যানুষ্ঠানের দর্শকদের বিবরণ শুনে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি—'চাঁদ সদাগর' আর্ট থিয়েটারের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রযোজনা এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

'চাঁদ সদাগরের' প্রসঙ্গে অবশ্যই মন্মথ রায়ের নামটি বারবার বলতে হবে। আজকের প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় তখন ছিলেন বালুরঘাটের অনতিপরিচিত একজন এম. এ. পাশ যুবক। 'মুক্তির ডাক' লিখেছেন সবেমাত্র। 'মুক্তির ডাক' প্রথম মৌলিক একাংক নাটক হওয়া সত্ত্বেও মন্মথ রায়ের প্রকৃত নাট্যকার পরিচিতি হলো 'চাঁদ সদাগর' লিখে। বলতে পারা যায়, এই একটি নাটক স্মরণীয় অভিনয়ের গুণে একজন নাট্যকারকে সাহসী করে তুলল। মুদ্রিত 'চাদ সদাগর' নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় তাই কৃতজ্ঞচিত্তে বলেছেন,

"মনোমোহন থিয়েটারে এই নাটকখানির প্রযোজনা কার্যে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-এর সেক্রেটারী অগ্রজ প্রতিম শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী যেরূপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া দেড় মাস সময়

মধ্যে যেরূপ মহাসমারোহে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

পরবর্তী তিনমাসের মধ্যে মনোমোহনে নতুন নাট্যানুষ্ঠানের খবর নেই। পুরোনো নাটক 'বঙ্গে বর্গী' পুজোর সময়ে মঞ্চস্থ হয়। এতে ভাস্কর সেজে-ছিলেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহনলাল এবং গৌরী—আশ্চর্যময়ী। দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখেরা ভাস্কর পণ্ডিতের অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন আগেই, এবারে সেই ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী অবতীর্ণ হলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনীত ভাস্করকে সমালোচকেরা অভিনন্দন জানালেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৬ অক্টোবর ১৯২৭) লেখা হলো—

"His 'Bhaskar' was of a purely criginal type and at the same time highly effective and his make-up was decidedly an improvement on his predecessors in the role."

১৯২৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে মনোমোহন মঞ্চে আর্ট থিয়েটার নতুন নাটক 'আরবীহুর' মঞ্চস্থ করলেন। ইটালীয়ান অপেরা রিগোলিটো অবলম্বনে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (যিনি 'পরদেশী' লিখেছিলেন) এই নাটকটি লেখেন।

এই নাটকটি সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন,

"পাঁচটি দৃশ্যে পাঁচ অংকের নাটক। অর্থাৎ এক একটি দৃশ্য এক একটি অংক। গোড়ার দিকটা বেশ অপেরার স্টাইলে লেখা কিন্তু শেষটা নিদারুণ ট্র্যাজেডী। যদিও ভাষা দুর্বল এবং প্রহসনের ধারায় সংলাপ লেখা তবু বেশ একটা নূতনত্ব ছিল।"

'আরবীহুরের' নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য মিলেছে। 'নাচঘর' [১৩।১।১৯২৮] লিখেছেন যে অভিনয় (কারও কারও) ভালো হলেও দর্শকাভাবে 'আরবী-হুর' অসফল নাটকাভিনয়ে পর্যবসিত। আবার অমৃতবাজার পত্রিকা [১৫।১।১৯২৮] বলছেন—'nice play'. স্বয়ং অহীন্দ্র চৌধুরীও বলেছেন—'দর্শকদের ভালোই লেগেছিল।' আমরা এইসব মন্তব্যপাঠে বলতে পারি, 'আরবীহুর' যতোই ভালো হোক না কেন 'চাঁদ সদাগরে'র মতো সফল হতে পারেনি, ব্যবসায়িক সাফল্যও পায়নি।

'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হলো ১৯২৭-এর শেষ ক'টি দিনে। তারপর ১৯২৮। এই বছরের শুরু থেকে মনোমোহন থিয়েটারে আর্ট চলচ্চিত্র দেখাতে থাকলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—"উত্তর কলিকাতায় তখন কর্নওয়ালিশ সিনেমা ছাড়া তো আর হাউস ছিল না।

ম্যাডান কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা নষ্টের ভয়ে বাঙালীর তোলা ছবি দেখাতে রাজী হলেন না—তাই মনোমোহনের এই ব্যবস্থা।"*

আর্টের নতুন ব্যবস্থার ফলে অভিনেতারা সকলে চলে গেলেন মলে ঘাটি হাতিবাগানে। সেখান থেকে অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখেরা উত্তরবঙ্গ-ঢাকা-ময়মনসিংহ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। এদিকে মনোমোহন মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যাপারটি পত্রপত্রিকার সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠল। আর্ট কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এই সমালোচনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবার নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। নতুন-পুরোনো বিখ্যাত নট-নটীদের সাহায্যে 'বিষবৃক্ষ', 'প্রফুল্ল', 'শ্রীরামচন্দ্র', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি নাট্যানুষ্ঠান চলতে থাকে। এপ্রিল থেকে জুন (১৯২৮) এইভাবে চলল।

কিন্তু এর মধ্যে আর্ট-এর পরিচালন-মণ্ডলীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। দুই নৌকোয় পা দিতে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিককে শেষ করেছিলেন, আর কয়েকটা বছর পার হতেই আর্টেরও অনুরূপ অবস্থা হলো। অবশ্য ক্লাসিক প্রথম ধাক্কাতেই শেষ হয়েছিল, আর্ট এ-যাত্রা আঘাত সামলে উঠল। আর্ট কর্তৃপক্ষ মনোমোহন থেকে ববাবরের জন্য উঠে এলেন স্থায়ী ঠিকানা স্টারে।

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরীর স্থান কোথায়—এ প্রশ্ন যদি কোনদিন ওঠে, তাহলে আর্ট থিয়েটারের এই এক বছরের ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করতে হবে। কারণ এই অল্পায়ু আর্ট থিয়েটার থেকেই অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর নট নামের সঙ্গে পরিচালক নামটি জুড়ে নিয়েছেন। আমরা আগেও বলেছি, আবার এখনও বলছি যে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের এই অধ্যায়ে সর্বমোট চারজন নট নাট্য-পরিচালক আখ্যা পেয়েছেন। এর মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মতো উচ্চমানের পরিচালক না হলেও পেশাদারী মঞ্চের উপযোগী প্রথম শ্রেণীর নির্দেশক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। সমসাময়িক যুগের দর্শকরুচি সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রখর জ্ঞান ছিল। দর্শককে কি ভাবে সচকিত করে তোলা যায়—মঞ্চমায়া দিয়ে, দেহকে ভেঙেচুরে, নাচে গানে—এইটাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

অন্যদিকে শিশিরকুমার বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পেশাদারী অভিনেতা হয়েও দর্শকরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁর নাট্যমন্দিরে মেক-আপ চমক, অহেতুক নাচ গান, ট্রিক সিন এবং দর্শকের হাততালির (শিশিরকুমার হাততালি দিতে নিষেধ করতেন) উপর জোর দেওয়া হয়নি। কিছু সৃষ্টি করার দিকে প্রবল আকর্ষণ ছিল শিশিরকুমারের। অভিনয়ের আঙ্গিক কৌশল তাই নাট্যমন্দিরে অনিয়ন্ত্রিত ছিল। সুতরাং ব্যবসায়িক দিকটি নাট্যমন্দিরে

* নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ২য় পর্ব, পৃঃ ৭৫

অবহেলিত হয়েছিল এবং মঞ্চকলার বিবর্ধনের দিকটি ছিল বিঘ্নিত। এদিক থেকে অহীন্দ্র চৌধুরীর কোনো ত্রুটি ছিল না। তিনি বারংবার পেশাদারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বলা বাহুল্য—আর্ট থিয়েটারে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করার পর থেকেই অহীন্দ্র চৌধুরী বিশেষ দিব্য-জ্ঞানটি লাভ করেছিলেন।

৫. মনোমোহন থিয়েটার—১৯২৮-৩১

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড মনোমোহন মঞ্চ ত্যাগ করার কয়েক বছর পরেও আমরা (নটী বিনোদিনী প্রতিষ্ঠিত) এই ঐতিহ্যশালী মঞ্চটিকে কিছুকাল সজীব থাকতে দেখি। তখন 'মনোমোহন' নামেই থিয়েটারটি চলেছে। শেষ পর্বের মনোমোহন চাঞ্চল্যকর কোনো পরিবর্তন না আনলেও নানা কারণে কিন্তু স্মরণীয়। শ্রীযুক্ত অনাদি বসু ও প্রবোধচন্দ্র গুহ সেই স্মরণীয় অধ্যায়ের দুই রঙ্গমঞ্চ-প্রেমিক মঞ্চমালিক।

মনোমোহন থেকে আর্ট পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলে অরোরা ফিল্ম কোম্পানীর অনাদি বসু এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ মনোমোহন ভাড়া নিলেন। থিয়েটার বাড়ি ভাড়া নেওয়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী ভাড়া নেওয়া শুরু হলো। এলেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দানীবাবু, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ দে, প্রকাশমণি, রাণীসুন্দরী, আশালতা, সুবাসিনী প্রমুখেরা। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মীরাবাই' (১৯২৮ এর ১১ মে) সর্বপ্রথম অভিনীত হলো। দানীবাবু 'মীরাবাই'তে অবতীর্ণ হননি। দলের অন্যেরা প্রায় সকলেই অংশগ্রহণ করলেন। 'ফরোয়াড' পত্রিকার মতে 'মীরাবাই' সাফল্যমণ্ডিত নাট্যানুষ্ঠান। অনেকদিন ধরে কর্তৃপক্ষ 'মীরাবাই' খুলে রাখলেন। কিন্তু 'মীরাবাই' তেমন কোনো সাড়া জাগাল না। একটি নাটক দিনের পর দিন মার খেলে পেশাদারী মঞ্চের উদ্যম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়—তা আমাদের জানা আছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

অনাদি বসু প্রমুখেরা যখন বেশ বুঝতে পারলেন যে পরীক্ষা-সমীক্ষা করতে গেলে ব্যবসা চলবে না তখন বাধ্য হয়ে মঞ্চে আহ্বান করতে হলো—'সরলা', 'জয়দেব', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি মঞ্চসফল পুরোনো নাটকগুলিকে। এই সময়ে মনোমোহনে যোগদান করলেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা। পুরোনো নাটকগুলির অভিনয়ে দানীবাবু আবার তাঁর প্রতিভার ছাপ রাখলেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমাণ করলেন নতুন যুগের অভিনেতা হিসেবে তিনি কতখানি প্রয়োগকুশল। আর নবীনা সরযূবালা পেশাদারী মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে সমালোচকের কাছ থেকে শুনতে পেলেন—

"'প্রফুল্ল' ও 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে যথাক্রমে প্রফুল্ল ও সতীর ভূমিকায় তাঁর সহজ, অনায়াস ও সুমধুর অভিনয় দেখে বুঝেছি যে, চর্চা না ছাড়লে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইনি নিজের নাম লিখে যেতে পারবেন।"

[নাচঘর, ২৩।১১।১৯২৮]

নিশিকান্ত বসুরায়ের সামাজিক নাটক 'পথের শেষে' (১৫।১২।১৯২৮) বছরের শেষে মনোমোহনে কিছুদিনের জন্য আলোড়ন তুলেছিল। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে সামাজিক, পারিবারিক নাটকের আদর বেড়ে গিয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই।

কাজেই 'পথের শেষে' সামাজিক নাটকটি মঞ্চস্থ করে কর্তৃপক্ষ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রবীন দানীবাবুও এই নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সরযূবালা নায়ক-নায়িকার অভিনয় করেন। 'পথের শেষে' বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও অভিনয় কুশলতায় নতুন ধরণের উপস্থাপনা হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু দর্শক টানতে পারল না।

অনাদি বসু এতেও দমে গেলেন না। নতুন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' (১ জুন ১৯২৯) মঞ্চস্থ হলো। 'রক্তকমল'কে এই যুগের আধুনিক নাটক বলা যেতে পারে। 'পুরুষের ক্ষেত্রে যা লীলা, নারীর ক্ষেত্রে তা পাপ'—আমাদের সমাজব্যবস্থার এই বিধানকে আঘাত করে শচীন সেনগুপ্ত এই নাটকটি লেখেন।

কিন্তু এহ বাহ্য; অবশ্যই 'রক্তকমল' অন্যদিক থেকেও আধুনিক নাটক। মাত্র সওয়া দু'ঘণ্ট কাল এই নাটকের ব্যাপ্তি, এবং পাঁচটি মাত্র দৃশ্য আছে এ নাটকে।

অনাদি বসুর উৎসাহে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত 'রক্তকমল'কে সবদিক থেকে নিখুঁত করার জন্য ব্রতী হলেন। তখন রিভল্‌ভিং স্টেজ নেই, ওয়্যাগন স্টেজের কল্পনাও করা যায় নি। অথচ পাঁচটি দৃশ্যে অন্তত, চারবার যবনিকা ফেলতে হবে দৃশ্য সাজাবার জন্য। শচীন সেনগুপ্তের কাছে ব্যাপারটি মনঃপূত হলো না। সুতরাং

"নজরুলকে বললাম গান বেঁধে দিতে হবে। নজরুল ওই নাটকের জন্য সাতখানা গান লিখে দিলেন; চারখানা গাইবে প্রতি দৃশ্যের শেষে কল্পিত চরিত্রটি, আর তিনখানা গাইবে নাটকের দুটি চরিত্র। নজরুল নিয়ে এলেন সংগীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালাকে, কল্পিত চরিত্রটির গান গাইবার জন্য। ইন্দুবালার সেই চারখানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল।"[১৬]

এত করেও 'রক্তকমল' জমল না। কারণ দর্শকের আপত্তি। আপত্তির প্রথম কারণ 'রক্তকমলে'র বিষয়বস্তু। পতিতা নারীর জীবন নিয়ে এর আগেও

অনেকগুলি ছোটখাট নাটক লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলিও সাধারণ দর্শকের আপত্তিতে দীর্ঘায়ু হয়নি মঞ্চে। যেমন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'ডালিম'।*

'রক্তকমলে'র বিপক্ষে দর্শক সমাজের দ্বিতীয় আপত্তির কারণ হলো এর ক্ষুদ্রায়তন। ১৯২৯ সালের দর্শকেরা সওয়া দু' ঘণ্টার নাটক দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন চার-পাঁচ ঘণ্টার কমে কোনো নাট্যপ্রদর্শন হোতো না। কাজেই 'রক্তকমল' অকালে শুকিয়ে গেল।

২৭ জুন ১৯২৯, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাণের দাবী' অভিনীত হয়। ২৯ জুন 'বেঙ্গলী পত্রিকা'য় লেখা হলো –

"The opening performance of Sri Jaladhar Chatta-padhyya's social drama 'Praner Dabi' at the Monomohan Theatre on Thursday last (June 27) was thoroughly attractive from all stand points,····Sri Nirmalendu Lahiri in the role of Keshab gave a splendid show. While Robi Roy in the role of Keshab's brother, Monindra Ghose in the role of servant and Miss Sarajubala in the role of Achola were also quite remarkable."

১৯২৯ সালে এই পর্বের শেষ নাটক সুধীন্দ্র রাহার 'সমুদ্রগুপ্ত' মঞ্চস্থ হয়। 'সমুদ্রগুপ্ত' মনোমোহনের ভাগ্য পরিবর্তনের খুব সহায় হয়নি। (যদিও 'সমুদ্রগুপ্ত' নাট্যানুষ্ঠানে কয়েকজন অভিনেতা ভালোই অভিনয় করেছিলেন।) কয়েক দফা মার খাবার পর অনাদি বসু অগত্যা মনোমোহন ছেড়ে দিলেন। এই সময় প্রবোধচন্দ্র গুহ আবার নতুন করে একাই মনোমোহনে সংসার পাতলেন। এটিই মনোমোহনের শেষ নাট্যসংসার।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ পরিচালিত মনোমোহন মঞ্চের অন্তিম নাট্যানুষ্ঠান-গুলি মনে রাখার মত। নাট্যরসিক প্রবোধবাবুর নেতৃত্বে এই অধ্যায়ে যে উন্নত মানের প্রযোজনা আমরা পেয়েছি, তাতে অভ্রান্তভাবে নবনাট্য আন্দোলনের ভাবী স্বাক্ষর আছে। যেসব শিল্পী এই সময়ে প্রবোধচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের নামগুলি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পুরোনোদের মধ্যে একমাত্র দানীবাবু ছাড়া আছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, রাধিকানন্দ

* 'ডালিম' চিত্তরঞ্জনের লেখা একটি ছোটগল্প; নারায়ণ, পৌষ ১৩২১ (?)। এর নাট্যরূপ দেন বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩১ আষাঢ় ১৩৩২। তিন অঙ্কের এই নাটকটি শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, সন্তোষ দাস, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, সরযূবালা, নিভাননী, নীহারবালা, শশিমুখী প্রমুখেরা।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে দুটি নাট্যানুষ্ঠান হয় মনোমোহনে। একটি 'জাহাঙ্গীর' (২৫।১২।১৯২৯), অন্যটি 'মহুয়া' (৩১।১২।১৯২৯)। প্রথমটি মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অপরটি মন্মথ রায়ের নাটক। 'জাহাঙ্গীর' উতরে গেল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ের গুণে এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রতিভার জোরে। কিন্তু 'মহুয়া' প্রতিষ্ঠা পেল অভিনব বক্তব্যের দুরন্ত বেগে। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিকল্পনা, নবীন কবি নজরুলের গান এবং অভিনেতৃবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছিল। 'মহুয়া' সম্পর্কে 'নাচঘর' লিখলেন—

"'মহুয়া' পাঠ ক'রে আমরা বড় খুশী হয়েছি। এই নাটকখানিকে আধুনিক নাট্য সাহিত্যের অন্যতম রত্ন বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক্।...হুমড়ো সর্দারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর বহুমুখী শক্তির আর একটি বিচিত্রতার বিকাশ দেখিয়েছেন।...শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদের চাঁদ'ও তাঁর পূর্ব-খ্যাতিকে ম্লান করেনি। শ্রীমতী সরযূবালার 'মহুয়া' যে কত সুন্দর হয়েছে, সকলকেই তা দেখতে অনুরোধ করি। এই নবীনা নটীর শক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে।...তবে নাচে ও গানে তাঁকে আরো উন্নত হতে হবে—" (১০।১।১৯৩০)।

'নাচঘর' পত্রিকার সমালোচনা যে কতখানি সঠিক ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা উত্তরকালে নাচ, গান প্রধান অভিনয় বাদ দিয়েছিলেন। সরযূবালার অভিনয়ের যেটা সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য আমাদের চোখে পড়ে তা হলো তাঁর ব্যক্তিত্ব। পেশাদারী মঞ্চে প্রবীণা সরযূবালাকে অভিনয় করতে দেখে আমাদের একথা মনে হয়েছে। সরযূবালার কণ্ঠ প্রেক্ষাগৃহের শেষ অবধি পৌঁছয় এটা ঠিক, তাঁর মুখে চোখে নতুন নতুন অভিব্যক্তি আসে এটাও সত্য, কিন্তু মঞ্চে তাঁর চলাফেরাটি সহজ ও স্বাভাবিক নয়। সরযূবালার অভিনয় দেখে বেশ বুঝতে পারা যায়—নির্দেশকের ইঙ্গিতেই তিনি মঞ্চে নড়াচড়া করেন, কোনো চরিত্রকে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন না। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিনেত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি মঞ্চসফল, তিনি নাট্যসম্রাজ্ঞী—এই তাঁর শেষ পরিচয়।

১৯৩০ সালের প্রথমদিকে প্রবোধ গুহ-র দলে এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিভাননী ও সুশীলাসুন্দরী। এই সময় 'অলীকবাবু', 'রাজসিংহ', 'গৃহলক্ষ্মী', 'মুক্তির উপায়', 'সীতারাম' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয় চলে। এই সব অভিনয়ে দলের সুখ্যাতি হয় এবং শেষবারের মতো মনোমোহনে

দর্শকের পদধূলি পড়তে থাকে। এই সময়ে অভিনেত্রী নীহারবালাও এসেছেন মিনার্ভা ছেড়ে মনোমোহনে।

১৯৩০ সালের জুন মাসে মনোমোহন মঞ্চ কাঁপিয়ে দেখা দিল 'গৈরিক পতাকা'। 'গৈরিক পতাকা' যুগান্তরের বাণী বহন করে নিয়ে এল বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এই একটি মাত্র নাটকের জন্যই প্রায় অমর হয়ে রইলেন। 'গৈরিক পতাকা'র উৎসর্গপত্রটি পাঠ করলেই প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি কথা জানা যাবে—

"বাংলার যৌবন-আন্দোলনের ঋত্বিক, কারারুদ্ধ নেতা
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর
উদ্দেশে

১৩৩৭ সালে নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয় নেতাজী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নাটকখানি তাঁহার জাতি-সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম।"

২৮ জুন 'গৈরিক পতাকা'র (মনোমোহন মঞ্চে) প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকমহলে সাড়া পড়ে যায়। বাঙালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে চলতে পেরেছিল বলেই 'গৈরিক পতাকা'কে অচিরে নমিত হতে হয়নি। পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক না হয়েও মনোমোহন কেন, বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে এই অধ্যায়ে 'গৈরিক পতাকা'র মতো মঞ্চসফল ও সৎ নাটক একটিও নেই। তাই প্রতি সপ্তাহে চারদিন করে এই নাটকটির অভিনয় চলে। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত—

"চিত্তে যাঁহারা উত্তেজনার নৃত্যনূপুরের চিক্কন শুনিতে চান, রক্তে যাঁহারা উন্মাদনার বন্যাপ্রবাহ বহাইতে চান, চক্ষে যাঁহারা অগ্নির শ্মশান-জাগানো তাণ্ডব দেখিতে চান, তাঁহারা এই 'গৈরিক পতাকা'র মূলে আসিয়া সমবেত হউন।"

আশা করি, গৈরিক পতাকার এই বিজ্ঞাপনটি পাঠের পর সবিশেষ পরিচয় নেবার প্রয়োজন হবে না। ১৯৩০ সালের পটভূমিকাটি মনে রেখে 'গৈরিক পতাকা'র দানকে আমরা যেন কোনদিন অস্বীকার না করি—উত্তরকালের কাছে আমাদের এইটুকুই প্রার্থনা।

কয়েক মাস দুরন্ত গতিতে 'গৈরিক পতাকা' এবং 'মেঘনাথ' অভিনয় করার পর মনোমোহন মঞ্চে পালাবদলের নাটক 'কারাগার' মঞ্চস্থ হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩০। 'কারাগার' নাট্যাভিনয় একাধিক কারণে অবিস্মরণীয় কীর্তি। প্রথমত, বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অনেকদিন পর একটি মৌলিক ও নতুন ধরণের পৌরাণিক নাটক হলো 'কারাগার'। দ্বিতীয়ত, 'কারাগার' যুগের বাণীকে স্পর্ধা ভরে প্রকাশ করতে সমর্থ হলো। তৃতীয়ত, এই নাটকটির অভিনয় সংবাদ

শাসকদলকে আবার আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। সর্বোপরি অভিনয়ের দিক থেকে 'কারাগার' নতুন কালকে নতুন কিছু দেখাতে সমর্থ হয়। নাট্যানুষ্ঠান দেখে 'নাচঘর' সেদিন নির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন,

> ' 'কারাগার' হয়েছে রঙ্গালয়ের বিশেষ একটি সৃষ্টি, বিশিষ্ট একটা সম্পদ। বড়দিনের উৎসবকেই নয়, রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই 'কারাগার' দিয়েছে একটা শ্রী যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের সাধনা। 'কারাগারে'র নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের লেখায় যে কেবল জোরই আছে, তা নয়। তাতে আছে বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। আর তা আছে বলেই তাঁর লেখা মানুষের মনকে যেমন নাড়া দিতে পারে তেমি পারে তার চোখের সামনে পরিপূর্ণ রূপকে জীবন্ত করে ফলিয়ে ধরতে।'' (২।১।১৯৩১)

নাট্যকার মন্মথ রায় সম্পর্কে 'ন্যাচঘর' এর পুরোনো সমালোচনার সাথে আজও আমরা একমত। রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা নাট্যসাহিত্যে মন্মথ রায়ের দানের কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখব। নাট্যসংগ্রামী ও স্বদেশপ্রেমিক মন্মথ রায় দীর্ঘকাল বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে নানা রসের নাটক উপহার দিয়ে জাতির মহান কর্তব্যকর্ম সাধন করেছেন। বিশেষ করে তিরিশের পর্বে তাঁর ঐতিহাসিক আগমন ও নাট্যব্রত উদ্‌যাপনের স্মৃতিটি আজও অনেকের শ্রদ্ধার কারণ হয়ে আছে। জাতীয় সংকটে নাট্যকারের ভূমিকা কেমনতর হওয়া প্রয়োজন—মন্মথবাবু আমাদের তা জানিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বক্তৃতায়—

> "এক রাজা বহুকষ্টে পাশের রাজ্যটিকে জয় করলেন। জয় করেই বিজয়ী রাজা বিজিত দেশের বাদ্যকরদের ধরে এনে তাদের কোতল করবার হুকুম দিলেন। বাদ্যকরেরা অবাক। জোড়হস্তে তারা বললো—'মহারাজ! আমাদের কি দোষ? আমরা তো আপনাদের সঙ্গে লড়াই করিনি।' রাজা বললেন, 'তোমরাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। যুদ্ধকালে বাদ্য বাজিয়ে তোমরা তোমাদের দেশের সৈন্যদলকে এমন রণোন্মত্ত করে তুলেছিলে যে, দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও এদেশ জয় করতে পারিনি আমি।'
>
> জাতীয় সংকটে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা এই বাদ্যকরের দল; দেশের জনসাধারণ—সৈনিক। নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার নাট্যশালার কর্তব্য দেশব্যাপী এই সৈনিকদলের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।"
>
> —[১৯৬৩ সালের 'গিরিশ ঘোষ বক্তৃতামালা' থেকে উদ্ধৃত]

মন্মথ রায়ের উপরোক্ত মন্তব্যে কোথাও বাড়িয়ে বলার চেষ্টা নেই, দায়িত্বহীন মন্তব্য করে সরে যাবার নাট্যকার নন তিনি। ফলে আমরা দেখেছি এই সাহসী নাট্যকার 'কারাগার' চলা কালে ব্রিটিশ সরকারের নোটিশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

'কারাগার'এর জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করে সরকার পক্ষ যখন স্বদেশচেতনার গন্ধ পেলেন এই নাট্যানুষ্ঠানে—তখনই আদেশ জারি করা হলো নিম্নোক্ত ভাষায়—

The Government of Bengal
POLITICAL DEPARTMENT
POLITICAL BRANCH
No. 1695 P.
order

Calcutta, the 4th February 1931

Whereas it appears to the Goveronr-in-Council that the play entitled 'Karagar' by Manmath Ray, M. A. printed by him at the Sree Gourangha Press at No. 71/1 Mirzapur Street, Calcutta, and published at Barada-Bhaban, Balurghat, (Dinajpur), which has been performed at the Monomohan Theatre, Calcutta is likely to excite feelings of disaffection towards the Goverment established by law in British India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic Performance Act, 1876 (XII of 1876) the Governor-in Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor in Council
Sd/- R. N. Reid
Offg. Chief Secretary to
The Government of Bengal

'আনন্দবাজার' (৯।২।১৯৩১), 'অমৃতবাজার' (১১।২।১৯৩১), 'বঙ্গবাণী' (৭।৩।১৯৩১)-তে নাট্যানুষ্ঠানের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু কার কথা কে শোনে! আঠারো রাত্রি অভিনয়ের পর 'কারাগার' বন্ধ হয়ে গেল। 'কারাগার' বন্ধ হবার পর মনোমোহনে 'গৈরিক পতাকা'র অভিনয় হয়—১ মার্চ ১৯৩১। এটিই অধুনালুপ্ত মনোমোহনের সর্বশেষ নাট্যানুষ্ঠান। কারণ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের পথের দাবীর জন্য মনোমোহনকে চিরকালের জন্য সরে যেতে হলো (আজও কিন্তু মন্দিরটি আছে), এবং প্রবোধচন্দ্র রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে গড়ে তুললেন নাট্যনিকেতন।

মনোমোহনের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু স্মৃতিবিজড়িত বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের একটি যুগের অবসান হলো।

৬. নাট্যনিকেতন : ১৯৩১-১৯৪১

মনোমোহন থিয়েটার চিরকালের মতো ভূগর্ভে লীন হবার পর নাট্যরসিক প্রবোধচন্দ্র গুহ নিজেই একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলেন—রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে—নাম দিলেন 'নাট্যনিকেতন'। নাট্যনিকেতন বর্তমানে 'বিশ্বরূপা' নামে পরিচিত। বিশ্বরূপা বহিরঙ্গে আধুনিক থিয়েটার বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গে আজও নাট্যনিকেতন। দুঃখের বিষয় নাট্যনিকেতন মঞ্চের বাইরে একটা প্রাকৃতিক শোভা ছিল—আজ আর তা নেই। প্রকৃতির অঙ্গনে আজকাল মোটরগাড়ি শোভা পায়।

প্রবোধচন্দ্র গুহের 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চটির উদ্বোধন হয় ১৪ মার্চ ১৯৩১। উদ্বোধন রজনীতে কোনো নাট্যানুষ্ঠান হয়নি। ১৬ মার্চ-এ পুরোনো নাটকের কিছু কিছু দৃশ্য দেখানো হতে থাকে। দানীবাবু একাধিক মঞ্চসফল নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে। বলা বাহুল্য দানীবাবু তাঁর সুখ্যাত চরিত্রগুলিতেই রূপ দিয়েছিলেন।

২৩ মার্চ ১৯৩১ রাজা যতীন্দ্রনাথ সিংহের 'ধ্রুবতারা' মঞ্চস্থ হয়। 'ধ্রুবতারা'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হেমেন রায়। নাটকটির ভূমিকালিপিতে ছিলেন—

উপেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অরুণ—মণি ঘোষ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চারুলতা—নীহারবালা, বনলতা—শেফালিকা (পুতুল)। 'উপেন' ও 'চারুলতা'র অভিনয় ভালো হয়। নবাগতা শেফালিকাও যথেষ্ট প্রশংসা পান 'বনলতা' চরিত্রাভিনয়ের জন্য। তথাপি 'ধ্রুবতারা' দীর্ঘস্থায়ী দাগ রাখতে পারেনি দর্শকের মনে।

মে ৩০ মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যানুষ্ঠানে অভিনেতা কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায় সত্যবানের ভূমিকায় খুব ভালো অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রূপদান করেন নীহারবালা, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

সদ্য আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে শিশিরকুমার ভাদুড়ী কোনো মঞ্চ না পেয়ে তিনরাত্রির জন্য নাট্যনিকেতন ভাড়া করেন। দানীবাবু তখন একরকম থিয়েটারে আসেন না বললেই হয়। শিশিরকুমার দানীবাবুকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন তিনদিনের জন্য। বলাবাহুল্য, এই তিনদিনে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে দানীবাবু-শিশিরকুমার যুগলবন্দীতে একটা সাড়া পড়ে গেল। দানীবাবুর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে প্রবোধচন্দ্র গুহ ২১ জুলাই ১৯৩১-এ ক্ষেত্রমোহন মিত্রের

সহযোগিতায় 'বলিদান' নাটকটির অভিনয় করান। দানীবাবু এই অনুষ্ঠানে 'করুণাময়ে'র চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। ১৩ নভেম্বর ১৯৩১-এ নাট্য-নিকেতনে শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' প্রদর্শিত হয়। বিখ্যাত মঞ্চপরিচালক সতু সেনের নামটি 'ঝড়ের রাতে' প্রযোজনার সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত স্মৃতিকথায় সতু সেন লিখেছেন,

"এই বছরের (১৯৩১) শেষের দিকে আমি নাট্যনিকেতনে পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক রূপে যোগদান করি। সেখানে আমার প্রথম পরিচালিত নাটক শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত 'ঝড়ের রাতে'। অভিনয়াংশে মুখ্যত ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা ও পুতুল। নাটকটি বিভিন্ন কারণে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যানুষ্ঠানের কোনো ধরা বাঁধা সময় ছিল না। অভিনয় হচ্ছে তো হচ্ছেই, দর্শকরা ইচ্ছেমত প্রবেশ ও প্রস্থান করছেন। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার আগে কোনো নাটক অভিনয় সমাপ্ত হতো না। প্রযোজনার এই সময় ও পরিস্থিতি বোধের অভাব আমাকে একান্তভাবে পীড়িত করে। তিনঘণ্টার নির্দিষ্ট সময়রেখার মধ্যে আমি 'ঝড়ের রাতে' নাটকটিকে বেঁধে দিই ও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দু'বার করে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করি।..."[১]

নিরুপমা দেবীর 'দিদি' (শিবরাম চক্রবর্তী কৃত নাট্যরূপ) অভিনীত হয়েছিল ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে। তারপর 'সতীতীর্থ' (২০।৬।১৯৩২), 'আঁধারে আলো' (৮।৭।১৯৩২) প্রভৃতি নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। নভেম্বর মাসে শিশিরকুমার এলেন কয়েকদিনের জন্য সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'মহাপ্রস্থান' নাটক নিয়ে। 'মহাপ্রস্থানে' অংশগ্রহণ করলেন—শিশির ভাদুড়ী, কংকাবতী, নীহারবালা, ভূমেন রায়, শেফালিকা, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত লিখেছেন,

"Neither the drama nor its performance impressed anybody and Bhadhuri then left for the Star Theatre."

শচীন সেনগুপ্তের 'জননী' (জুলাই, ১৯৩২) অভিনয়ের পর নাট্য-নিকেতনের সাড়া জাগানো মঞ্চসফল নাটক হলো 'মা'। 'মা'র লেখিকা অনুরূপা দেবী। নাট্যরূপ অপরেশচন্দ্রের। নানা কারণে আর্ট থিয়েটারে এই নাটকটি অভিনীত হয়নি। নাট্যনিকেতনের কপাল ভালো; 'মা' মঞ্চস্থ হবার পর আসর সরগরম হয়ে উঠল। 'মা' নাটকের প্রথম অভিনয় রাত্রির তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৩। 'মা' মঞ্চস্থ হবার সময় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্যনিকেতনে যোগ দেন। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া 'মা'তে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীহারবালা, সরযূবালা,

চারুশীলা, কুসুমকুমারী। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন যে " 'মা' বেশ সাড়ম্বরে চলছিল তখন। পঞ্চাশ রজনী অতিক্রম করলেও দর্শকসংখ্যা একটুও কমেনি।"

১৯৩৪ সালের ৭ মার্চ মঞ্চমুক্তি পেল যোগেশ চৌধুরীর 'পূর্ণিমা মিলন'। কৌতুককর এই নাটকটির বিষয়– এক বৃদ্ধের যুবতী নারীর প্রতি আকর্ষণ। বৃদ্ধের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। ২৩ মে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'চক্রব্যূহ' নাটকটি অভিনীত হয় প্রথম। এই নাটকে 'শকুনি'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অহীন্দ্র চৌধুরী আর ভীম সাজতেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। এরই মাঝে স্বল্পকালের জন্য এস. করের 'স্বর্ণলংকা' মঞ্চস্থ হয়।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ব্রতচারিণী' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৩৫ সালের ১৯ এপ্রিল 'ব্রতচারিণী' সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। 'ব্রতচারিণী'র আগে নাট্যনিকেতনের নতুন নাটক বলতে 'জন্মাষ্টমী'র নাম পাচ্ছি। অহীন্দ্র চৌধুরীর মতে, "ব্রতচারিণী মোটামুটি ভালই চলেছিল।" এই এপ্রিল মাসেই নাট্যনিকেতনে একটি সম্মিলিত অভিনয় হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' মঞ্চে আসে। শিশিরকুমার উক্ত নাটকে 'রডা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয়ে তিনি কিছু পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

কয়েক বছর থিয়েটার চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। সুতরাং ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি 'নাট্যনিকেতন'-এ ক্যালকাটা থিয়েটারস্ লিমিটেড এর উদয় হলো। শ্রীযুক্ত যশোদানারায়ণ ঘোষ এই সময়ের 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর'। যশোদানারায়ণ ঘোষের নির্দেশনায় সর্বপ্রথমে মঞ্চস্থ হয় 'চিরকুমার সভা'। নাট্যানুষ্ঠানের কোনো তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে, এই নাটকে 'চন্দ্রবাবু' ও 'নীরবালা'র অভিনয় করেন যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী ও নীহারবালা।

১১ জুলাই ১৯৩৫-এ মঞ্চস্থ হয় মন্মথ রায়ের কাল্পনিক ইতিহাস-নির্ভর নাটক 'খনা'। ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন,

> "আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গৃহীত হয়। দিনাজপুর নাট্য-সমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয়।···অবশেষে বর্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে—২৮শে আষাঢ়, ১৩৪২ (১১ জুলাই, ১৯৩৫)···খনার কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা ও চারি আনা কিম্বদন্তী।"

অখিল নিয়োগীর সংগীত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সুর সংযোজনা ও নীহারবালার নৃত্য পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে 'খনা' মঞ্চসফল হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫, মঞ্চস্থ হয় শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'নরদেবতা'। বিখ্যাত বিলাতি লেখিকা মেরী করেলীর 'টেম্পোর্যাল পাওয়ার' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে শচীন সেনগুপ্ত 'নরদেবতা' লেখেন। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "এই নাটকখানির বিষয়বস্তু দর্শকমহলে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কয়েক রাত্রি অভিনয় হবার পর 'নরদেবতা' আমাদের তদানীন্তন শাসক সম্প্রদায়ের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকেই তা বন্ধ করে দিতে হয়। বিংশ অভিনয় ছিল 'নরদেবতা'র শেষ অভিনয় ৪-১-৩৬ তারিখে। ভূমিকায় ছিলাম আমি, নীহারবালা ও অন্যান্য অনেকে।"

২১ ডিসেম্বর অভিনীত হলো 'বিদ্যাসুন্দর'। অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী 'সুন্দর' সাজলেন, চারুবালা 'বিদ্যা'। হীরামালিনীর অভিনয় করেছিলেন 'নীহারবালা'।

অভিনীত নাটকের নাম দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, যে কোন প্রকারে পয়সা রোজগারের একটা ব্যবস্থা করার জন্য প্রবোধচন্দ্র নাটক নির্বাচনে যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন এই সময়ে।

নাট্যনিকেতনের ভরা অমানিশায় অভূতপূর্ব পূর্ণিমার বার্তা নিয়ে এসেছিল 'কেদাররায়'। নাট্যকার রমেশচন্দ্র গোস্বামী। 'কেদাররায়' নাটকটির দু'চার কপি এখনও বাজারে পাওয়া যায়! কিছুদিন আগেও অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের খুবই পছন্দসই ছিল এ নাটকটি। তার কারণ তুচ্ছ এই নাটকটির সংলাপ এবং ঘটনা প্রবাহ খুবই উত্তেজক। সর্বোপরি অতি সাধারণ মঞ্চমায়া সৃষ্টি করা যায় এই নাট্যপ্রদর্শন কালে। নাট্যনিকেতনে 'কেদাররায়' প্রথম (৪ এপ্রিল, ১৯৩৬) আবির্ভাব কালেই জনঅভ্যর্থনা পেয়েছিল অতি সহজেই। অবশ্য একাধিক শীলিত নটনটীও এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ভূমিকালিপিটি পাঠে সেকথা জানা যায়—

কেদাররায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, চাঁদরায়—রবি রায়, শ্রীমন্ত—নরেশ মিত্র, কার্ভালো—ভূমেন রায়, ঈশা খাঁ—জহর গাঙ্গুলী, কাল্লুসর্দার—মণি ঘোষ, সোনা—নিরুপমা, রত্না—চারুবালা, মায়া—রেণুকা রায়।

'কেদাররায়'-এর ভূমিকালিপিতে নির্মলেন্দু লাহিড়ির নাম নেই। কারণ নির্মলেন্দু লাহিড়ী এই সময়ে নাট্যনিকেতনের কাজে ইস্তফা দেন। নাট্যনিকেতনে এ সময়ে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অনপস্থিতির কারণ নির্দেশ করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তিনি লিখেছেন ঃ

"একদিন রিহার্সাল চলছে, অথচ নির্মলেন্দু রিহার্সালে ঠিকমতো যোগ না দিয়ে টিপ্পনী কেটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। নরেশবাবু ব্যাপারটা

যশোদাবাবুর কাছে বলতে, যশোদাবাবু নির্মলেন্দুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আপনি বিশিষ্ট অভিনেতা, অথচ এ-ধরণের আচরণ করছেন কেন? আপনার আচরণ থেকে কি শিখবে ছোট ছোট শিল্পীরা।

নির্মলেন্দু বরাবর ছিলেন একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। সে একটু চড়া সুরেই বললে, আমি আর কি করবো, ওরাই তো সব করছে। এভাবে রোজ রোজ আমি রিহার্সাল দিতে পারবো না।

শান্ত প্রকৃতির মানুষ যশোদাবাবু। ব্যক্তিগত জীবনে চিরকুমার এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির। বললেন, আমি থিয়েটারের শৃংখলা কারো জন্যে ভাঙতে রাজী নই, নির্মলেন্দুবাবু।

নির্মলেন্দু সেই কথাতেই থিয়েটার ছেড়ে দিলে।"[২২]

নাট্যনিকেতন মঞ্চে দীর্ঘকাল 'কেদার রায়' সগৌরবে অভিনীত হতে থাকে। 'কেদার রায়' যশোদাবাবুকে যশ এনে না দিলেও অর্থ এনে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৬ এর ১৯ ডিসেম্বর। 'গোরা' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন—নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা, রাজলক্ষ্মী, মনোরমা, চারুবালা প্রভৃতিরা। নরেশ মিত্র কর্তৃক নাট্যরূপ পেয়ে 'গোরা' প্রথম যেদিন মঞ্চস্থ হয়—সেদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাট্যানুষ্ঠান দেখতে আসেন। নাটক শেষ হওয়া অবধি তিনি থাকতে পারেন নি। এর কারণ সম্পূর্ণ 'গোরা' দেখাতে সময় লেগেছিল ছয় ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট।

১৯৩৭ সাল থেকে 'নাট্যনিকেতনে'র পতন শুরু হলো। মন্মথ রায়ের 'সতী', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বভ্রুবাহন', 'মোগল মসনদ', 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি নাট্যানুষ্ঠানের পর ক্যালকাটা থিয়েটারস্ চলে গেলেন চিৎপুরের রঙ্গমহালে। নাট্যনিকেতনের ভাঙা হাটে এলেন শ্রীযুক্ত রবি রায় ও জীতেন গাঙ্গুলী। শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হয় ২৯ জুন ১৯৩৮। 'সিরাজদ্দৌলা' আবার নাট্যনিকেতনকে প্রাণবায়ুর স্পর্শ দিল। কিন্তু নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও রবি রায়ের প্রস্থানের পর নাট্যনিকেতন আবার তিমিরাচ্ছন্ন।

মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' অভিনীত হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮। বিশিষ্ট নট ছবি বিশ্বাস 'মীরকাশিমে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু এতেও ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল না। 'পথের দাবী' মঞ্চমুক্তি পাওয়ার পর নাট্যনিকেতন আবার কিছুদিনের জন্য দর্শকের মুখ দেখে। 'পথের দাবী' প্রথম অভিনীত হয় ১৩ মে, ১৯৩৯।

যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের 'মহামায়ার চর' ১ ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ (নাট্যনিকেতনে) মুক্তি পায়। 'মহামায়ার চর' অভিনন্দিত হয় নি। অনুরূপভাবে

সত্যেন্দ্র গুপ্তের 'অগ্নিশিখা' (৩০ ডিসেম্বর) মার খায়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' (১২ই জুলাই? ১৯৪১) মঞ্চস্থ করেও নাট্যনিকেতন সুদিনের মুখ দেখল না। শেষপর্যন্ত 'মহাশক্তি' মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সংগে নাট্যনিকেতন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। গড়ে উঠল 'শ্রীরংগম'। যার কর্ণধার প্রবোধচন্দ্র গুহের বদলে শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

এই দশবছরের ইতিহাসে অনেক সুখ্যাত নট ও নাট্যকার এই থিয়েটারের দরজায় এসেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ পুরুষের পদধূলিও পেয়েছে নাট্যনিকেতন। সতু সেনের মতো মঞ্চবিশেষজ্ঞ, অখিল নিয়োগীর মতো সংগীত রচয়িতা, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো সুরকার—নাট্যনিকেতনে নানা সময়ে যুক্ত থেকেছেন। তথাপি নাট্যনিকেতন ভালোভাবে চলেনি। পেশাদারী থিয়েটার চালাতে গেলে কতকগুলো প্রলোভন ত্যাগ করতে হয়। বিশেষ করে বলতে চাই, নতুন নাট্যকারের নাটক নিয়ে সমীক্ষা চালাতে গেলেই পেশাদারী মঞ্চমালিককে ধারের অংক-স্ফীতির একটা ঝুঁকি নিতে হয়। প্রবোধচন্দ্র নতুন নাট্যকারদের সুযোগ দিয়ে বহু অর্থের অপচয় ঘটিয়েছেন।

আমাদের কাছে নাট্যনিকেতন বর্তমানের বিশ্বরূপা নয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১-এ নাট্যনিকেতনে পেশাদারী থিয়েটার হয়েও একেবারে নগ্ন ব্যবসায়ে নামেনি, শিল্পের চর্চাও করেছে। সুতরাং এই থিয়েটার হলটি আমাদের নব্যসংস্কৃতির পালাবদলের অন্যতম সাথী।

৭ রঙমহল ঃ ১৯৩১-৪৫

১৯৩১ সালের ৮ অগাস্ট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক নিয়ে 'রঙমহল' নামক একটি নতুন থিয়েটারের যাত্রা শুরু হল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমবেত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"সহৃদয় সুধীবৃন্দ !

আজ একটি নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে।...এই শুভ উদ্বোধন কার্যে পৌরোহিত্য করবার লোক [কর্তৃপক্ষ] খুঁজেছেন এবং নটজাতির মধ্যে আমার বয়স বেশী মনে করেই আমাকে পৌরোহিত্যের ভার দিয়ে শুধু আমার গৌরব বাড়াননি, বাংলার নটজাতির সম্মান রক্ষা করেছেন। তার এইজন্যেই আযোগ্য আমি এই ভার নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হইনি, বরং আনন্দিতই হয়েছি।

আনন্দিত হবারই কথা। নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে, এতে আমাদের চেয়ে আনন্দ আর কার বেশী? আনন্দের কারণ একটা নূতন থিয়েটার

জন্মাচ্ছে বলে, গোত্র বৃদ্ধি হচ্ছে বলে। গোত্রবৃদ্ধি হলে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আনন্দ বেশী হয় বাড়িতে যারা বুড়ো আছে তাদের।…

…এই রঙমহলের জীবন সুদীর্ঘ হোক, এ সবল হোক, সুস্থ ও সুন্দর হোক বঙ্গনাট্যবাণীর মুখ উজ্জ্বল করুক। আমার বিশ্বাস এ তা করবেই। কারণ এর লালনপালনের ভার যিনি নিয়েছেন, তিনি স্বনামধন্য নট আমার স্নেহের ও শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী।…"

অপরেশচন্দ্রের এই ভাষণটি পাঠে রঙমহল থিয়েটারের ইতিবৃত্ত জানার পক্ষে একটু বাধা আছে। কারণ অপরেশচন্দ্রের ভাষণে শিশিরকুমার ভাদুড়ীকেই রঙমহলের কান্ডারী হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। কিন্তু আমরা জানি, রঙমহল শিশিরকুমারের উদ্যোগ ছাড়াই গড়ে উঠেছিল এবং শিশির-কুমারের সঙ্গে এই থিয়েটারের যোগ খুব স্বল্পকালের।

মূলত, রবীন্দ্রমোহন রায় ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র পরিকল্পনাতেই রঙমহলের জন্ম হয়। এঁরা দুজনে মিলে একটি লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করেন। এঁরা ৬৫।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের জমিটি লিজ নিলেন। তারপর শেয়ারের টাকায় গড়ে উঠতে থাকল থিয়েটারটি। এই ফাঁকে রঙমহলের দল বিভিন্ন স্থানে 'দীপ্তি সংঘ' নামে অভিনয় দেখাতে থাকলেন। দীপ্তি সংঘের প্রাথমিক সভ্য হিসেবে আমরা নরেশ মিত্র, শ্রীমতী লাইট ও নিভাননীকে দেখতে পাই। 'রঙমহল' মঞ্চটি গড়ে ওঠার পর দীপ্তি সংঘের সভ্যেরা ১৯৩০ সালের মে মাসে গৃহপ্রবেশ করলেন।

এই সময়ে আমেরিকা থেকে সদলবলে ফিরে এসেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। রঙমহলের উদ্যোক্তাদের আহ্বানে তিনি প্রধান অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষকরূপে যোগদান করলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে সতু সেনকেও রঙমহলে দেখা যাচ্ছে এই সময়। ৮ আগস্ট ১৯৩১-এ রঙমহল "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" নাট্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। উক্ত নাট্যানুষ্ঠানের ভূমিকালিপিটি এইরকম ঃ

নিমাই - শিশিরকুমার, অদ্বৈত—যোগেশ চৌধুরী, শ্রীবাস—শীতল পাল, নিতাই—নৃপেশ রায়, পাগল—কৃষ্ণচন্দ্র দে, আচার্য—অমলেন্দু, রামরূপ—কার্তিক দে, বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভাদেবী, শচীমাতা—কংকাবতী, মালিনী—রাজলক্ষ্মী, নারায়ণী—সরযূবালা।

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'র পর কয়েকটি পুরোনো নাটকের অভিনয় চলতে থাকে। শিশিরকুমার এর সব ক'টিতেই অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩২ সালের প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাদুড়ী দলের মনোমালিন্য হয় এবং এক রাত্রিতে প্রায় তের-চোদ্দ জন অভিনেতা অভিনয় করতে বিরত হন। শিশিরকুমার চলে গেলেন নাট্যনিকেতনে সম্মিলিত অভিনয় করতে—আর ফিরে এলেন না।

রঙমহল মঞ্চ শিশিরকুমারের প্রস্থানে খুবই বিপদে পড়ে। রবীন্দ্রমোহন রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে'র উদ্যোগে নাট্যনিকেতনের কিছু ধার করা শিল্পী সহযোগে 'রূমেলা' মঞ্চস্থ হয় (১৭।১।১৯৩২)। 'রূমেলা' সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের নাটক। এতে প্রধান ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন শেফালিকা ও রবি রায়। কৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীমতী লাইটও দুটি গৌণ চরিত্রে রূপ দেন।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে অভিনীত হয় 'দেবদাসী', 'রঙের খেলা'। প্রথমটি শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ও শেষোক্তটি দোলের সময়ে অভিনীত হয়। উৎপল সেনের 'সিন্ধুগৌরব' ১৯৩২ সালের ২৫ জুন মঞ্চস্থ হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন—রবি রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরযূবালা প্রভৃতিরা। মঞ্চের কারুকার্য ও ব্যবস্থাপনার দিকটি সতু সেনের তত্ত্বাবধানে ছিল।

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'অসবর্ণ' অভিনীত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরযূবালা ও কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখেরা। নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা সত্ত্বেও রঙমহল দেনার দায়ে অচল হয়ে পড়ে। বড়দিনের সময়ে থিয়েটারের অবস্থা চরমে উঠল। শিল্পীরা থিয়েটারে আসতে বিরত হন।

১৯৩৩ সালে রঙমহল থিয়েটারটি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, আই. সি. এস.-এর পুত্র শিশির মল্লিকের দখলে চলে গেল। শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র ও সতু সেনের সাহায্যে থিয়েটারটি পরিচালনা করতে থাকেন। নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৭ এপ্রিল ১৯৩৩-এ রঙমহলের নাটক 'মহানিশা'। মূল রচনা অনুরূপা দেবীর, নাট্যরূপ যোগেশ চৌধুরীর। অভাবিত ভাবে 'মহানিশা' দেখতে জনসমাগম শুরু হলো। এর কারণ 'মহানিশার' কাহিনীর নতুনত্ব ও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। উত্তরকালে সতু সেন লিখেছেন,

> "১৯৩৩ সালে আমি রঙমহল থিয়েটারে যোগ দিই। 'সিন্ধুগৌরব', 'পতিব্রতা' ইত্যাদি নাটক পরিচালনার পর আমি এক দুরূহ মঞ্চনিরীক্ষায় হাত দিই। সেটি হল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণ। স্থানু মঞ্চের উপর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন, বিভিন্ন চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রমণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হতো; দ্বিতীয়ত, নাটকের গতি ও সচলতাও তাতে রীতিমতো বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার প্রয়াসেই আমি ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে ব্রতী হই।…
>
> …ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক 'মহানিশা'। এ জাতীয় মঞ্চে অভিনয়ে অনভ্যস্ত অভিনেতৃবর্গকে তালিম দিতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। আজব মঞ্চ দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভেঙে পড়ত।…[২০]

শুধু 'আজব মঞ্চ' দেখার জন্য নয়, সুঅভিনয়ের গুণেও 'মহানিশা' দর্শক বন্দিত হয়। বার্মা ফেরত 'মুরলীধরের' ভূমিকায় রবি রায়, 'রাধিকাপ্রসন্নের' রূপদানে যোগেশ চৌধুরী, 'বেহারীর' ভূমিকায় নরেশ মিত্র, ভূমেন রায়ের 'ব্রজরাজ', শেফালিকার 'অপর্না' ও চারুলতার 'ধীরা' সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মন্মথ রায়ের 'অশোক' (২-১২-৩৩), সৌরীন মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন রায়ের 'কাজরী' (৭.৮.১৯৩৪) প্রভৃতি অভিনয়ের পর ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-এ প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'পথের শেষে' অবলম্বনে যোগেশ চৌধুরীর 'বাংলার মেয়ে' মঞ্চস্থ হলো। 'বাংলার মেয়ে' রঙমহলকে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দেয়। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতির অভিনয়ে 'বাংলার মেয়ে' সবদিক থেকে সুচারু অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখে।

'বাংলার মেয়ে'র পর যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' কোনো ছাপ রাখতে পারেনি দর্শকের মনে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ৯ মে 'পথের সাথী' (অনুরূপা দেবীর কাহিনী ; যোগেশ কৃত নাট্যরূপ) আবার সাড়া জাগিয়ে দেয়। এই সময়ে শিশির মল্লিক রঙমহল ছেড়ে দেন। অমর ঘোষ তখন মঞ্চের মালিক। শিশির মল্লিক চলে গেলে রবি রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুলতা রঙমহল পরিত্যাগ করেন।

১৯৩৫ সালের ২০ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' মঞ্চস্থ হয়। চরিত্রহীন নাট্যানুষ্ঠানে আমরা যোগেশ চোধরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শান্তি গুপ্তা, শেফালিকা ও সুবাসিনীর নাম পাচ্ছি।

সুধীর রাহার 'সর্বহারা' মঞ্চস্থ হয় ৩০ মে ১৯৩৬ এবং যোগেশ চোধুরীর 'নন্দরাণীর সংসার' ২০ আগস্ট অভিনীত হয়। দুটি নাটকই দর্শক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। শেষোক্ত নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃ-বর্গের মধ্যে—প্রভাদেবী, মনোরঞ্জন ভটাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য ও যোগেশ চৌধুরীর নাম পেয়েছি। 'নন্দরাণীর সংসার' মঞ্চস্থ হওয়ার পর রঙমহল কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে।

১৯৩৭ সালের রঙমহলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন যামিনী মিত্র, রঘুনাথ মল্লিক ও কৃষ্ণচন্দ্র দে। ১৫ মে ১৯৩৭ অভিনীত হয় 'অভিষেক'। এই সময় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায় রঙমহলে যোগদান করেন। শচীন সেনগুপ্তের 'প্রলয়' তেমন কোনো প্রলয়কাণ্ড বাধাতে পারেনি। 'ডিটেকটিভ' এবং 'বন্দিনী'ও বেশিদিন চলেনি। কিন্তু 'স্বামী-স্ত্রী' ১৯৩৭ এর ২৪ ডিসেম্বর নতুন সুর নিয়ে এল রঙমহলে। শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' চার

রাত্রি অভিনীত হয়েছিল এই পর্যায়ে। এই চার রাত্রির অভিনয়ে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়ে নিয়েছিলেন।

'স্বামী-স্ত্রী' চাররাত্রি অভিনয়ের পর রঙমহল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত গদাই মল্লিকের সহায়ে থিয়েটারটির পুনরুজ্জীবন ঘটে। ১৯৩৮ সালের ১৩ জুলাই 'মেঘমুক্তি' নাট্যানুষ্ঠানের পর এল শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার'।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৮। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এসময়ে রঙমহলে নেই। তবে অহীন্দ্র চৌধুরীর যোগদানে রঙমহল তখন জমজমাট। 'তটিনীর বিচার' প্রথম রাত্রি থেকেই দারুণ জমে গেল।

১৯৩৯-এর শুরুতে পূর্বোক্ত লেসীরা রঙমহলের কর্তৃত্ব ছাড়লেন। আবার এলেন অমর ঘোষ, এলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়ের নাটক 'মাকড়সার জাল' (২০।৫।১৯৩৯), 'মাটির ঘর' (১।৯।১৯৩৯), 'বিশ বছর আগে' (২৭।১২।৩৯) প্রভৃতি।

১৯৪০-৪১ সালে রঙমহলে মঞ্চস্থ হয় 'আগামী কাল' (১১.৫-১৯৪০), 'মালা রায়' (১৪.৮.১৯৪০), 'ঘূর্ণি' (১৪.১২.৪০), 'রত্নদীপ' (২৪.১২.৪০), 'কপালকুণ্ডলা' (২১.৬.৪১), 'রক্তের ডাক' (১২.৭.৪১), 'মায়ের দাবী' ও 'তুমি ও আমি' (৩.১২.১৯৪১)।

১৯৪২ সালে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রঙমহলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। শরৎবাবু কর্তৃত্বভার গ্রহণের পর অহীন্দ্র চৌধুরীকে আচার্য পদে বৃত করেন। মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' মঞ্চস্থ হয় এই সময়ে (৫ জুন ১৯৪২)। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল 'মধুসূদন ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল দেখানো হবে।' 'মাইকেল' খুবই জনপ্রিয় হয়।

অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাষ্টার' (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২) এই পর্যায়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন,

" ....The play is of two acts, the first one being devoid f interest and in the second Choudhury with appropriate make-up, charecteristic of him, carried the audience night after night."[২১]

রঙমহলে 'ভোলামাষ্টার' দুই শত রজনী অতিক্রম করে। যদিও বোমার ভয়ে কলকাতা তখন জনশূন্য পুরী।

১৯৪৩ সালের ৫ ডিসেম্বরে রঙমহলে একই সঙ্গে পুরোনো নাটক 'রিজিয়া' ও নতুন নাটক 'সানিভিলা' (প্রমথনাথ বিশীর) অভিনীত হয়। 'সানিভিলা' সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য, "নাটক কেমন হয়েছে সে বিচার করিনি তবে এটুকু দেখলাম দর্শকসাধারণ দারুণ ভাবে হেসেছে।"

সত্তু সেনের নির্দেশনায় ১৯৪৪ সালের ২২ জানুয়ারি শরৎচন্দ্রের 'গ্রামের সুমতি' অভিনীত হয়। নারায়ণীর ভূমিকায় সুহাসিনী খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এই বছরে একাধিক পুরোনো নাটকের অভিনয় হতে থাকে যেমন—'পি-ডব্লিউ-ডি', 'সানিভিলা', 'ভোলা মাস্টার', 'কর্ণার্জুন', 'দোললীলা', 'দুইপুরুষ', 'সাজাহান', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি।

বছর শেষ হওয়ার আগে রঙমহল উপহার দিলেন তারাশংকরের 'বিংশ শতাব্দী' (২৫.১২.৪৪)। 'বিংশ শতাব্দী'র বেশ কয়েকটি অভিনয় হয়। কিন্তু এই নাটকটির কাছে লেখক ও মঞ্চমালিকের যে প্রত্যাশা ছিল তা পূর্ণ হলো না। 'বিংশ শতাব্দী' ম্লান হয়ে গেল অচিরেই।

'সন্তান' ('আনন্দমঠে'র নাট্যরূপ) নাটকটি নিয়ে ১৯৪৪ সালে রঙমহলের সংসারে বিস্তর ঝড় উঠেছিল। সন্তানের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বাণীকুমার পণ্ডিত অশোক শাস্ত্রীর সহায়ে। 'আজাদ' পত্রিকার 'বন্দেমাতরম্' গানটির ওপর আপত্তি থাকায় অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখেরা 'সন্তান' বন্ধ রাখেন। এ থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অবশ্য আমরা জেনেছি 'সন্তান' শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪৫ এর ১৮ই জনুয়ারি। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন,

> "এ-নাটক উদ্বোধন হবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সুধী দর্শকদের মনে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। উদ্বোধন রজনীর অভিনয়ে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।
>
> নাটকে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সত্যানন্দের ভূমিকায়, মহেন্দ্রর ভূমিকা ছিল শরতের, জীবনানন্দ ছিলেন অমল আর ভবানন্দের ভূমিকাটি ছিল মিহির ভট্টাচার্যের; স্ত্রী-ভূমিকায় অন্যতম শিল্পী ছিল শান্তি গুপ্তা আর সুহাসিনী।
>
> নাটকে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি গাইতো মৃণালকান্তি ঘোষ। এই 'বন্দেমাতরম' সংগীত গীত হবার সময়ে দর্শক সাধারণ উঠে দাঁড়াতেন।"

আজ পর্যন্ত নানা হাত ঘুরে এই পেশাদারী থিয়েটারটি বেঁচে আছে। ১৯৪৪-৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত রঙমহলের চেহারা সবদিক থেকে একই রকম আছে—তার কোথাও পরিবর্তন হয়নি। রঙমহল থিয়েটারটি ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত পেশাদারী থিয়েটারের খাঁটি চরিত্র পেয়েছে। এই থিয়েটারের কাছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা ততটা পূরণ হয়নি, তবে মঞ্চকারুর দিক থেকে অবশ্যই এই থিয়েটারের কিছু গুরুত্ব আছে।

৮. কয়েকটি অপ্রধান নাট্যশালা—

নাট্যভারতী ঃ রংমহাল ঃ কালিকা থিয়েটার।

ক. নাট্যভারতী — ১৯৩৯-১৯৪৩

ভূতপূর্ব আলফ্রেড মঞ্চটি (বর্তমানে গ্রেস সিনেমা) দখল নিয়ে রঘুনাথ মল্লিক নাট্যভারতীর উদ্বোধন করেন। নাট্যভারতীর উদ্বোধন হয়েছিল শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' নাটক দিয়ে। ৫ অগাস্ট ১৯৩৯-এ মঞ্চস্থ হয় 'তটিনীর বিচার'। অহীন্দ্র চৌধুরী এই মঞ্চটির সংগে যুক্ত হন ১৪ অক্টোবর। নজরুল ইসলামের 'মধুমালা' মঞ্চস্থ হওয়ার পরে নাট্যভারতীর উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রয়াস —'সংগ্রাম ও শান্তি'। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত; উদ্বোধনের তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। এই নাটকে চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অহীন্দ্র চৌধুরী, অবিনাশ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ - জহর গংগোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ -মনোহর রায়, প্রমীতা রাণীবালা।

শচীন সেনগুপ্তের 'নার্সিং হোম' মঞ্চস্থ হয় ৩০ জুন ১৯৪০। এই নাট্যানুষ্ঠানে ডাঃ বিক্রমাদিত্য সাজেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী —মহাদেব রায় ও কুন্তলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রাণীবালা। জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁথির সিঁদুর' অভিনীত হয় ২৪ অগাস্ট ১৯৪০।

নাট্যভারতীর এক উল্লেখযোগ্য নাট্যানুষ্ঠান জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পি. ডব্লিউ ডি (১ ১০. ১৯৪০)। এতে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ সেন, নির্মলেন্দু লাহিড়ী—রায়বাহাদুর, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—সোমেন, সন্তোষ সিংহ —সনৎ এবং রাণীবালা—অঞ্জলির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

অয়স্কান্ত বক্সীর 'রিহার্সাল' নাটকটি উদ্বোধনের তারিখ ২৮ মে ১৯৪১। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকটির পরিচালনা করেন। নটনাথের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন, আর অহীন্দ্র চৌধুরী রূপ দেন কুমার বাহাদুরের।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্থানের পর নাট্যভারতীর সর্বময় কর্তা হন অহীন্দ্র চৌধুরী। অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনায় মনোজ বসুর 'প্লাবন' অভিনীত হয় ২৯ জুলাই ১৯৪১। এই নাটকের নীলাম্বর সাজেন অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—কমলেশ, সন্তোষ সিংহ—ব্রজলাল, এবং রাণীবালা—নিশারাণীর অভিনয় করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের 'কংকাবতীর ঘাট' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। 'কংকাবতীর ঘাট' নাট্যভারতীর সফল নাট্যানুষ্ঠান। দীর্ঘদিন এই নাটকটির অভিনয় হয়। 'কংকাবতীর ঘাট' অভিনয় চলার সময়ে রঘুনাথ মল্লিক নাট্যভারতী হস্তান্তরিত করেন মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ও শিশির মল্লিকের কাছে। থিয়েটারের মালিকানা বদলের ফলে অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা চলে আসেন রঙমহলে।

এঁদের বদলে আর একদল শিল্পী এসে যোগ দিলেন নাট্যভারতীতে। তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রবি রায়, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, প্রভাদেবী প্রভৃতিকে দেখতে পেয়েছি। তারাশংকরের 'দুই পুরুষ' অভিনীত হয় ২৮ মে ১৯৪২। 'দুই পুরুষ' নাটকে যোগেশ চৌধুরীর 'শিবনারায়ণ'-এর অভিনয় খুব ভালো হয়। মৃত্যুর পূর্বে এটিই তাঁর শেষ চরিত্রাভিনয়।

তারাশংকরের 'পথের ডাক' অভিনীত হয় ৮ জানুয়ারি ১৯৪৩। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মিহির ভট্টাচার্য ও প্রভাদেবী। 'পথের ডাকে' প্রভাদেবীর অভিনয় দেখে হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন,

"Prabha was very natural and she approached now the correct standard in social dramas after so many years."[২২]

'প্রফুল্ল' প্রভৃতি কয়েকটি পুরোনো নাটকের অভিনয়ের পর নাট্যভারতীতে প্রদর্শিত হয় 'দেবদাস'। মূল কাহিনী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যরূপ, শচীন সেনগুপ্ত। নামভূমিকায় অভিনয় করেন জহর গাঙ্গুলী। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন – রবি রায়, নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শেফালিকা ও সরযূবালা।

১৯৪৩ সালের নাট্যভারতীর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'ধাত্রীপান্না'। সরযূবালা এই নাটকের নামভূমিকায় অবতীর্ণা হন। প্রভাদেবী, রবি রায়, জহর গাঙ্গুলী অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন।

অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের পর শেষ পর্যন্ত নাট্যভারতী বন্ধ হয়ে গেল। শিশির মল্লিক ক্রমাগত লোকসানের মুখে পড়ে আর 'লিজ' নিতে সক্ষম হলেন না। ১৯৪৪ সালের (২ জানুয়ারির পর) নাট্যভারতীর মঞ্চে নতুন সিনেমা হাউস চালু হয়ে যায়। বর্তমানে উক্ত সিনেমা গৃহটির নাম 'গ্রেস সিনেমা'।

খ. রঙ্গমহাল ১৯৩৪ - ?

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে ৮৬ নম্বর আপার চিৎপুর রোডে 'রঙ্গমহাল' থিয়েটারের উদয় হয়। এই নাট্যশালাটির আদিতে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পাচ্ছি। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহামানব' রঙ্গমহালের প্রথম নাট্যাভিনয়। পরে 'রূপমহল' নামের ছায়াছত্রতলে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মাহুতি' মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৫ এর জুলাই মাসে। অতঃপর শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' মঞ্চস্থ হয় নভেম্বর ১৯৩৫-এ। এই নাটকে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালে 'রঙ্গমহালে' (নাট্যনিকেতন থেকে চলে এসে) যশোদা ঘোষ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। অভিনীত হয় 'উত্তরা'। পরবর্তীকালে রঙ্গমহালের অস্তিত্ব কতদিন ছিল তা জানা যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা খুব বেশিদিন এই নাটশালাটির আয়ু ছিল না। যশোদা ঘোষ আসার পরেই থিয়েটারটি উঠে যায়।

গ. কালিকা থিয়েটার—১৯৪৪

১৯৪৪ সালের একেবারে শেষদিকে (১৫.১২.১৯৪৪) দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের সহযোগিতায় একটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। ১৫ ডিসেম্বর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ঐ দিন শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র দুটি দৃশ্য দেখানো হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, রঞ্জিত রায়, বেচু সিংহ ও রমা চৌধুরী। ২২ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় পূর্ণাঙ্গ 'বৈকুণ্ঠের উইল'। নাট্যরূপ দেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ১৯৪৪-এর পর অনেকগুলি বছর কালিকা মঞ্চে নাট্যাভিনয় চলেছিল। অবশ্য সে সব অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তনের চিহ্ন কিছুই ছিল না। বর্তমানে কালিকা থিয়েটার নামেই থিয়েটার মাত্র, কারণ সেখানে আজ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

পেশাদারী যুগের এই তিনটি অপ্রধান নাট্যশালার কার্যক্রমের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি আরোপ করলে দেখা যাবে শুধুমাত্র দর্শনীয় বিনিময়ে থিয়েটার প্রদর্শন ব্যাপারটিই যেন কর্তব্য হয়ে উঠেছিল একশ্রেণীর নাট্যব্যবসায়ীর কাছে। এঁরা যে-কোনো প্রকারে কিছু পেশাদারী অভিনেতার সাহায্যে মঞ্চসফল নাট্যানুষ্ঠান করতে পারলেই সুখী হয়েছেন। এতে নাট্যশালা ও নাট্যকলার পালাবদল ঘটতে যে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছে—তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য পেশাদারী মঞ্চ থেকে 'অনেক কিছু' আশা করাটাই অন্যায়।

৯. বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার : ১৯২১-১৯৪৪

> বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন
> প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর !—
> চমকি' চাহিনু ঊর্ধ্বে, নিশার চিকুর
> দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন।

হেরিলাম, কলালক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য লীলায় ধরি' নবতম সুর,
নয়ন মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইত বঙ্গে আর নহে উদাসীন!

ছন্দ যেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান।
শব্দ-অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত রস-রাগে!
হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান,
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকুতি জাগে!
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা সমান—
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্য সুধা মাগে!

['নট-কবি শিশিরকুমার', 'ছন্দ চতুর্দশী'—মোহিতলাল]

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্থান কতখানি—তা বোধহয় আজ আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'নটরাজ' 'নাট্যাধিনায়ক' বলে সম্বোধন করেন, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে যিনি নট স্বীকৃতি আদায় করেন; অবনীন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে যাঁকে বরণ করেন, যাঁর শেষ বয়সের অভিনয় দেখে আমরা অভিভূত হই, যিনি সর্বপ্রথম স্বাধীন সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেন—তাঁর নাম প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

আমরা ইচ্ছে করেই অনেক পরে শিশিরকুমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। কারণ ১৯২১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত যে পালাবদলের চিহ্ন আমরা লক্ষ্য করি, তার অনেকটা কৃতিত্ব শিশিরকুমারের। স্বীকার করছি তিনি পেশাদারী নট, তিনি তথাকথিত অনাধুনিক নাটকেরই নায়ক, তিনি আমেরিকায় ব্যর্থ, তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্ফুলিং বা বন্দিত মননশীল রীতিধারা, তাৎপর্যমণ্ডিত বোধানুসারী ঘরানা আজ নেই, জীবনে নাটক লেখেননি একটিও। তথাপি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ অধ্যায় শিশির-স্নিগ্ধ। শিশিরকুমার আমাদের চোখে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, নাট্যবোধ ও দুর্জয় সাহস সেকালে কারো ছিল না। আমাদের নাট্য-ঐতিহ্য থেকে শিশিরকুমারকে কোনো অবস্থাতেই বিযুক্ত করা যাবে না। একদা 'সীতা' নাট্যাভিনয় দেখে 'বিজলী' পত্রিকায় অচিন্ত্যকুমার সমগ্র বাঙালীর হয়ে যা বলেছিলেন (কবিতায়) আমরা তার শেষ দুটি লাইন এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করছি—

"তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা।"

সৌখীন নট হিসেবে শিশিরকুমার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ছাত্রাবস্থায়।

পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেই খ্যাতি আরো বর্ধিত হয়। অবশেষে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ১৯২১ সালের ২০ ডিসেম্বর পেশাদার অভিনেতা হয়ে শিশিরকুমার পাদপ্রদীপের সামনে বাদশা আলমগীর বেশে উপস্থিত হলেন।

শিশিরকুমারকে মাসিক হাজার টাকা বেতন দিয়ে পেশাদারী মঞ্চে আহ্বানের কৃতিত্ব ম্যাডান কোম্পানীর ম্যানেজার জে এফ. ম্যাডান ও তদীয় জামাতা রুস্তমজী সাহেবের। এই ম্যাডান কোম্পানী একদা সারা ভারতের সিনেমা জগতের অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের দুঃসময়ে এঁরা ঠিক করলেন কলকাতায় একটি থিয়েটার খুলবেন। 'পারসী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' নামে এঁরা একটা থিয়েটারও খুলেছিলেন। সেখানে অভিনীত হয়েছিল — 'নলদময়ন্তী', 'ভগীরথ', 'আলাদিন'।

অতঃপর ১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানী কলকাতায় দুটি মঞ্চ স্থাপন (ক্রাউন ও কর্নওয়ালিস) করেন। একটিতে সিনেমা দেখানো শুরু হলো। অপরটিতে (কর্নওয়ালিশে) শনি ও রবিবার ম্যাটিনীতে খোলা হলো— 'বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'। এই দলের সঙ্গে যুক্ত হন—প্রবোধ বসু, হীরালাল দত্ত, গোপাল ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী, প্রভাদেবী, বসন্তকুমারী প্রভৃতিরা। সবশেষে মন্মথমোহন বসু ও স্যার আশুতোষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। কলকাতা শহরে বিজ্ঞাপনের মারফতে ঘোষিত হলো—

কর্নওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে

বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর নাট্য নিবেদন

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ. বিরচিত

নূতন ঐতিহাসিক নাটক

আলমগীর

নাম ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ.

প্রথমাবির্ভাবেই শিশিরকুমার দিগ্বিজয়ী সম্রাটের গরিমা লাভ করলেন। বিদগ্ধ দর্শকেরা (যেমন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ) বললেন—এমন একজন মানুষ এলেন যিনি বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে আবার খাড়া করে তুলে ধরতে পারবেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিশিরকুমারের 'আলমগীর' দেখে নিখুঁত বিশ্লেষণের সাহায্যে লিখেছেন, "তাহার আলমগীর নির্মম, কুটকৌশলী, আত্মগোপন দক্ষ মোগল সম্রাটের এক অপূর্ব প্রতিকৃতি। তাহার লৌহ-বর্মের পিছনে যে আবেগ-স্পন্দিত, কোমল রক্তমাংসে গড়া হৃদয়-নিঃসঙ্গতার ছদ্মবেশের মধ্যে সহানুভূতির কাঙাল-প্রকৃতি লুকান ছিল তাহা কোন

ঐতিহাসিক আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার ক্ষীণ ইংগিত দিয়াছেন, কিন্তু নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারই ইহাকে পরিপূর্ণ সর্বজন সংবেদ্য রূপ দিয়াছেন—দূর ইতিহাসের আলোছায়ায় আবৃত, নাট্যকলায় ঈষৎ প্রতিভাত রহস্যময় চরিত্রটি একেবারে আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের সহজ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।"[২৬]

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমালোচনার মধ্যে অভিনেতা শিশিরকুমারের যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়েছে। বিশ শতকের তিনটি দশক জুড়ে শিশিরকুমার অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে খুব কম সংখ্যক নাটকই ড্রামাটিস্টের লেখা। কিন্তু শিশির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হলো অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকারকে অতিক্রমণ। সেই কারণে শিশিরকুমার স্রষ্টা, শিশিরকুমার 'নাট্যাধিনায়ক'। অবশ্য 'আলমগীর' অভিনয়ে শিশিরকুমার প্রয়োগাচার্য খেতাব পাননি। কারণ 'আলমগীরে' তাঁর অভিনয়-ক্ষমতা অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হলেও রুস্তমজীর অনুশাসনে বাঁধা থাকতে হয়েছে সব সময়। প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার এখনও তাঁর কাংক্ষিত ভূমি পাননি। তবে তাঁর 'অলৌকিক আবির্ভাবে' চারিদিকে যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাতে আমরা নিঃসন্দেহ। স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ আলোচনার সময়ে আমরা সে কথা বলেছি। অর্থাৎ শিশিরকুমারের দিকে তাকিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর গতানুগতিক মঞ্চে বিশ শতকের আগমনী গান তান ধরেছিল।

১৯২২ সালের ১২ মার্চ কর্নওয়ালিন থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' মঞ্চস্থ হয়। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—শিশিরকুমার। 'রঘুবীর'-এ শিশিরকুমারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর, বীরত্বব্যঞ্জক মহিমা সমস্ত দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিল। সারা নাট্যজগতে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হলো—দলে দলে দর্শক আসতে শুরু করল শুধু শিশিরকুমারের 'রঘুবীর' দেখতে। প্রবীণ শিশিরকুমারের 'রঘুবীর' দেখে উত্তরকালে শম্ভু মিত্র লিখেছেন :

"...রঘুবীরের রঘুয়াতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর যে অভিনয়, তাঁর তুলনা করতে গেলে পৃথিবীর মহৎ শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে। যে ভংগীটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর সেইটা কী করে বিরাট climax রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে ঐ দৃশ্যের অভিনয় দেখা দরকার। আমি যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বছর। ঐ বয়সী একজন ভদ্রলোক যদি দুই পায়ে মল পরে স্টেজের ওপর দুহাত উঁচু লাফাতে থাকেন তাহলে হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত হাসি শুকিয়ে যাবে সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় দেখলে। আমার মনে

হয়েছিল যেন ঈগলের মতো ছোঁ মেরে তিনি আমার মনটাকে কোথায় কোন ঊর্ধ্বে যে নিয়ে গেছেন, যেখানে মহান মৃত্যুর সঙ্গে আমি মুখোমুখি একা। সে উপলব্ধি আমি জীবনে ভুলবো না।"

১৯২২-এর ১ জুলাই কর্নওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হলো। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এটিই শিশিরকুমারের প্রথম 'চন্দ্রগুপ্তের' অভিনয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য শিশিরকুমারকে আরও কিছুটা প্রতিষ্ঠা দিল। কিন্তু অগাস্ট মাসেই তিনি ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। এর একটিই কারণ, তা হলো—থিয়েটারের মালিক কারণে-অকারণে নাটকের ওপর হস্তক্ষেপ শুরু করে দিয়েছিলেন। যেমন, 'আলমগীর নাটকে রূপনগরের ভুঁইয়া রাজার বাড়ির দৃশ্য · গরীব রাজা—চাষবাস করেন··· তাঁর প্রাসাদ হবে ভাঙাচোরা পাথরের বাড়ি তেমনি দৃশ্য তৈরি হোল। কিন্তু কোম্পানীর মালিক বললেন—না। তা হবে না। পেণ্টার হুসেনবেগকে হুকুম দিলেন · সব সোনে লাগাও! ব্যাস্, জমকালো প্রাসাদ তৈরি হোল।' শিশিরকুমার ধনী মালিকের হুকুম মানতে রাজী হলেন না—তিনি মঞ্চে কলাচর্চা করতে এসেছিলেন। কাজেই ১৯২২ সালের অগাস্ট মাসে তিনি ম্যাডানের হাজার টাকার চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

ম্যাডানের চাকরিতে ছেদ ঘটিয়ে শিশিরকুমার বছরখানেক বাড়ী বসেছিলেন। বহু প্রলোভন দেখিয়েও কোনো পেশাদারী মঞ্চ তাঁকে দলে টানতে পারেনি। এইখানে অন্যান্যদের সঙ্গে শিশিরকুমারের পার্থক্য। অতঃপর ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়ে শিশিরকুমারকে অস্থায়ী ইডেন গার্ডেনের মঞ্চে দেখতে পাওয়া গেল। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' আবার নতুন করে দেখা দিল। বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হয়েছিল,

"ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের জন্য গঠিত হইলেও এই অভিনয় ক্ষণভঙ্গুর হইবে না—ইহার স্মৃতি যাহাতে বহুদিন পর্যন্ত দর্শকদের হৃদয়ে অংকিত থাকে তাহার সমস্ত আয়োজন আছে—কোথাও কার্পণ্য নাই।"

'সীতা' নাট্যানুষ্ঠানে সত্যিই কোথাও কার্পণ্য ছিল না। শিশিরকুমার শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে মহলা পরিচালনা শুরু করছিলেন। একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুললেন একটি নাট্যদল। এই দলে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, ললিতমোহন লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রভাবতী, নীরদাসুন্দরী, শেফালিকা (পুতুল) প্রমুখ ছিলেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ীও প্রথমে এই দলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি মহলাও দিয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

ইডেন গার্ডেন-এ 'সীতা' অভিনয়ের সাফল্যে নতুন প্রাণ পেয়ে শিশির-

কুমার ঠিক করলেন নিজেই থিয়েটার খুলবেন। এবং নতুন মঞ্চের প্রথম নাটক হবে 'সীতা'। কিন্তু যা ভেবেছিলেন তা করতে পারলেন না। শিশির-কুমারের উদ্যোগে ঈর্ষিত হয়ে কবিপুত্র দিলীপ রায়ের কাছ থেকে 'সীতা' অভিনয়ের অধিকার নিয়ে নিলেন আর্ট কর্তৃপক্ষ। এই 'সীতাহরণ' ব্যাপারটি অবশ্যই শিশিরকুমারকে আকস্মিক আঘাত দিয়েছিল, কিন্তু বিপদের মুহূর্তে ভারতীগোষ্ঠীর শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধুরা শিশিরকুমারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আলফ্রেড মঞ্চে 'বসন্তলীলা' নাটক অভিনীত হলো (৮ চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। পরের মাসেই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সুধীরচন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় 'নাচঘর' পত্রিকার আবির্ভাব হয়। ২৬ বৈশাখ ১৩৩১। প্রেমাংকুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায় হলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। ইতিমধ্যে শিশিরকুমার আলফ্রেড ছেড়ে দিলেন। সবদিক থেকেই এই মঞ্চটি অসুবিধার কারণ ছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলটি ভদ্রলোকের চলাফেরার পক্ষে খুব নিরাপদ ছিল না। আর প্রকৃত থিয়েটার পাড়া থেকে এর অনেকটা দূরত্বও ছিল।

মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে থিয়েটারের 'লিজ' গ্রহণ করা হলো এবং ১৯২৪ সালের ৬ অগাস্ট মনোমোহনে স্থাপিত হয় 'মনোমোহন নাট্যমন্দির'। উনিশ দিন আগে থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। মনোমোহন থিয়েটারটি হাতে পেয়ে শিশিরকুমার বোধহয় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সব দিক থেকে রঙ্গমঞ্চকে নাট্যমন্দিরে পরিণত করতে হবে। সুতরাং ১৯২৪-এর ৬ অগাস্টে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করে দর্শকেরা দেখলেন গৃহটি আলোকমালায় সমুজ্জ্বল— দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব আর কদলীবৃক্ষের মাঙ্গলিক চিহ্ন। দর্শককুলকে আমোদিত করছে নহবতের তান। তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করছেন 'প্রবেশপত্র' নিয়ে যেটা পাওয়া গেছে 'দর্শনী'র বিনিময়ে। প্রবেশপত্রে ইংরাজি কায়দায় 'রো' বা 'সীট নং' লেখা নেই তার বদলে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি এবং আসনসংখ্যা ১, ২, ৩, ৪ ক্রমে। নাট্যমন্দিরের প্রথম নাটক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত অভিনব পৌরাণিক নাটক 'সীতা'।' উদ্বোধনের আগে প্রবীণ নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বলেছিলেন,

> "কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছিল। সারাজীবন ধরে আমি এই কলার সাধনা করে এসেছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন—আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ করে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্তক।"

অভিনয় শেষে অমৃতলাল বসু শিশিরকুমারকে আশীর্বাদ করে বলছিলেন — জয়যাত্রায় যাও গো'।

নাট্যমন্দিরের 'সীতা' অভিনয়ের পঞ্চম প্রদর্শনীতে (১ ভাদ্র, ১৩৩১, রবিবার) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন। একাদিক্রমে চার-পাঁচ ঘণ্টাকাল বিমুগ্ধ প্রাণে বসে অভিনয় দেখলেন। অভিনয় শেষে শিশিরকুমারের বাচনভঙ্গির অকুণ্ঠ প্রশংসা জানিয়ে তাকে 'মৌলিক' আখ্যা দিলেন। 'নাচঘর' (৬ ভাদ্র. ১৩৩১) পত্রিকায় নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ ও শিশিরকুমারের অভিনয় ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য প্রভৃতি নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলো। শিশিরকুমারের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষিত হয়ে আর্টগোষ্ঠী প্রকাশ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও নিন্দা করতে থাকলেন। আর্ট গোষ্ঠীর একটি মার্জিত নিন্দাপূর্ণ পত্রাংশ আমরা উপস্থিত করছি ঃ

"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ সীতা অভিনয় দেখিয়া আদৌ তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে মণিলালবাবুর চিঠির প্রতিবাদ করেন নাই। তবে এ লইয়া আর বাড়াবাড়ি করিলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইবেন।"

আর্টগোষ্ঠীর নিন্দাবিদ্রূপের কথা রবীন্দ্রনাথের গোচরে এল। তিনি বিদেশযাত্রার পূর্বে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখলেন ঃ

কল্যাণীয়েষু

মণিলাল,

আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে সীতা অভিনয়ের পর আমার নাম নিয়ে কোন কোন লোক শিশির ভাদুড়ীর নিন্দা রটনা করছে। যদি প্রয়োজন হয় তুমি জানাতে পার যে তাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো প্রকার আলাপ মাত্রই হয়নি—এবং শিশিরকে আমি ক্ষমতাশালী লোক বলেই জানি।

আমি শীঘ্রই বিদেশে যাচ্ছি—আশংকা হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিকালে এইরূপ মিথ্যা রটনা প্রশ্রয় পাবে। তোমার উপর ভার রইল তুমি এদের মিথ্যাচারণের প্রতিবাদ করবে। ইতি

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক হিসেবে 'সীতা' (যোগেশ চৌধুরীর) অতি দীন। তথাপি উপস্থাপনা কৌশলে 'সীতা' নাট্যাভিনয় শিশির প্রতিভার একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মনে রাখতে হবে, 'সীতা' নাটকটির ওপর শিশির কুমারের বিশেষ দুর্বলতাও ছিল। আমেরিকাতেও 'সীতা' নাট্যানুষ্ঠান হয়েছে। তাহলে

বলতে বাধা নেই যে, শিশিরকুমার নিজেও এটিকে প্রয়োগসফল নাট্যানুষ্ঠান মনে করেছেন।

আমাদের কাছে 'সীতা' তাই মহৎ সৃষ্টি। কিন্তু কিসের কারণে সীতা প্রশংসিত হলো? কেনই বা রবীন্দ্রনাথ বললেন—"শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই-একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।" এর কারণগুলি কয়েকটি প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতে পারে। হেমেন্দ্রকুমার রায় 'সীতা'র অভিনবত্বের দিকটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে দিচ্ছি:

"* আগাগোড়া একই ভঙ্গী অনুসারে একসুরে বাঁধা নূতন আদর্শের অভিনয়।

* পাদপ্রদীপের ব্যবহার বন্ধ। স্বভাবত আলো আসে ওপর থেকে এবং এপাশ ওপাশ দিয়ে। পাদপ্রদীপের আলো নীচ থেকে ওঠে ওপরে। তাই পাদপ্রদীপ নিভিয়ে 'সীতা'র প্রত্যেক দৃশ্যে স্বাভাবিক আলোর ব্যবস্থা করে বাংলা রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে আলোকপাত কৌশলের নিদর্শন দেখান হয়।

* ঐকতান বাদন বন্ধ। বাংলা রঙ্গালয়ের ঐকতান বা 'কনসার্ট' নাটকীয় ক্রিয়ার সহগামী ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ছিল তার পরিপন্থী। তার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক সংগীতের ব্যবস্থা। এও ছিল অভাবিত।

* পিছন থেকে টেনে তোলা সমতল ক্ষেত্রে আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার তুলে দেওয়া। সীতার ঘরবাড়ি ছিল সত্যিকার ঘরবাড়ির মত, তার প্রত্যেক দরজার ভিতর কিংবা নগর বা অরণ্যের পথ দিয়ে প্রমাণ আকারের মত মানুষ আনাগোনা করতে পারত। আগে এমন দৃশ্য সংস্থান দেখা যায়নি।

* নাট্যক্রিয়ার অনুসারী যুগোপযোগী গানের সুর এবং নৃত্যে নূতনধারা —প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নৃত্যভঙ্গী গ্রহণ বাংলা রঙ্গালয়ে অভূতপূর্ব।

* আগাগোড়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজ-পোশাক এই প্রথম।

* সংলাপে শব্দের অর্থ বুঝে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন।

* মঞ্চের উপরে অবস্থানকালে সংলাপ না থাকলেও কোনো অভিনেতাই স্থির বা আড়ষ্ট ভাবে থাকবে না—উপযোগী ভাবাভিনয় দ্বারা নাটকীয়

ক্রিয়াকে সাহায্য করবে। সীতার শেষ দৃশ্যে মঞ্চের উপরে দেখা যেত শতাবধি নটনটীকে—তাদের অধিকাংশেরই মুখে কথা ছিল না বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গে ছিল ভাবের অভিব্যক্তি। আগেকার নাট্যশিক্ষকরা এদিকে বড় দৃষ্টি দিতেন না।

* অধিকন্তু আগে এখানে সকলের উপরে প্রয়োগকর্তা বলে কোনো স্বাধীন কর্মীর অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। শিশিরকুমারই হচ্ছেন বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম প্রয়োগকর্তা।"

একথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে (১৯২১-১৯৪৪) শিশিরকুমারই সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রয়োগকর্তা বলে নিজেকে দাবি করতে পারেন। শিশির-সমসাময়িক কয়েকজন অভিনেতা হয়তো প্রয়োগ ব্যাপারটি ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁরা প্রয়োগবিদ্ অভিধা লাভ করতে পারেন নি। প্রথম কথা এবং খুব সত্য কথা—শিশির-সমসাময়িক নামকরা অভিনেতারা, মঞ্চশিল্পীরা—শিক্ষাদীক্ষায়, নাট্যভাবনায় শিশিরকুমারের সমকক্ষ ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, এঁরা কেউই সাহসী হয়ে নিজের দল গড়তে পারেন নি। ফলে তাঁরা প্রায় সর্বদা মঞ্চমালিকের আদেশ পালন করেছেন, আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের রুচি ও ইচ্ছার কাছে। ফলে সম্ভাবনা যাঁদের মধ্যে ছিল (যেমন অহীন্দ্র চৌধুরী, সতু সেন) তাঁরা আজকের চোখে প্রয়োগাচার্য নন।

আসলে প্রয়োগ কথাটির ব্যাখ্যা এঁদের কাছে পরিষ্কার থাকলেও ব্যবহারিক মূল্য পায়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'প্রয়োগ' কথাটি উনিশ-বিশ শতকের পাশ্চাত্য থেকে ঋণ করা কথা নয়। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর শুরুতে সূত্রধার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্'-এর মধ্য দিয়ে কালিদাসের সূত্রধার যেন আমাদের জানাতে চান—'বিদ্বানদের পরিতুষ্ট করতে পারলেই প্রয়োগবিজ্ঞান সার্থক এবং বিদ্বানদের পরিতুষ্ট করতে হলে সমদর্শী হতে হবে।' আচার্য ভরতের ভাষায় প্রয়োগাচার্য মানে—যিনি

> 'চারিত্রাভিজনোপেতাঃ শ্রুতবৃত্তশ্রুতান্বিতাঃ
> যশোধর্মরতাশ্চৈব মধ্যস্থা বয়সান্বিতাঃ
> ষড়ঙ্গনাট্যকুশলা প্রবুদ্ধা শুচয়ঃ সমাঃ
> চতুরাতোদ্যকুশলা বৃত্তজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনঃ
> দেশভাষাবিধানজ্ঞাঃ কলাশিল্প প্রযোজকাঃ
> চতুর্ধাভিনয়জ্ঞাশ্চ রসভাব বিকল্পনে
> শব্দছন্দোবিধানজ্ঞা নানা শাস্ত্র বিচক্ষণাঃ'

ভরতের এই নির্দেশপাঠে মনে হতে পারে বর্ষীয়ান বিজ্ঞজন মাত্রেই বুঝি প্রযোজক। কিন্তু আচার্য ভরত বলেন—প্রয়োগকর্তাকে শাস্ত্রজ্ঞানের সংগে সংগে কলাজ্ঞানও রাখতে হবে।

ভরতের ভাষায়—'রসাভাবা অভিনয়াধর্মী বৃত্তিপ্রবক্তয়ঃ
সিদ্ধিস্বরাস্তথাতোদ্যঃ গানং রঙ্গস্য সংগ্রহঃ
উপাচারস্তথা বিপ্রা মাস্তুপশ্চেতি সর্ব্বশঃ
ত্রয়োদশবিধো হ্যেষ হ্যাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ'—

সর্বমোট তের রকম রঙ্গসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার এই পরামর্শের মধ্য দিয়ে প্রয়োগাচার্যকে পঞ্চমবেদের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিয়েছেন আচার্য ভরত।

দুঃখের কথা, আজ পর্যন্ত আমরা যথার্থ প্রয়োগাচার্য বলে চিহ্নিত করতে পারি খুবই মুষ্টিমেয় প্রতিভাকে। এর কারণ, একটু ভালো অভিনয় করতে পারলেই সহজে হাততালি পাওয়া যায় এদেশে। এবং হাততালি যখন দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হতে থাকে তখন আমরা এক একজন বড় 'নির্দেশক' হয়ে যাই এবং সংগে সংগে ভুলে যাই আমাদের অভিজ্ঞতা ও নাট্যবোধের সঞ্চয় কতখানি। যাই হোক, পরিশেষে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের অপেশাদার এবং পেশাদারী (বিশ শতকের প্রথমার্ধে) থিয়েটারে দু'জন প্রয়োগাচার্যের নাম আমাদের জানা আছে। একজনের নাম রবীন্দ্রনাথ, অপরজনের নাম শিশির-কুমার ভাদুড়ী। 'সীতা' প্রযোজনার পর থেকেই পেশাদারী মঞ্চে শিশির-কুমার অভিনেতা থেকে প্রয়োগাচার্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হলো দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বিতর্কিত নাটক 'পাষাণী'। 'পাষাণী' নাটকে অংশ নিয়েছিলেন—

ইন্দ্র ও গৌতম শিশিরকুমার, চিরঞ্জীব—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বামিত্র—অমিতাভ বসু, শতানন্দ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মদন—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, রাম—রবি রায়, রতি—উষাদেবী, মাধুরী—মনোরমা, অহল্যা—প্রভাদেবী।

'পাষাণী' মঞ্চসফল হয়নি। এর কারণ পাষাণী নাটকের মধ্যে যে মন্থরতা আছে এবং যে সিদ্ধরসের ব্যত্যয় আছে—তা সাধারণের পক্ষে বোধগম্য হয়নি। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকদের মতে, "শিশিরকুমার এখানে হাততালির মোহ এড়িয়ে নিজের অসাধারণ রূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সংযমের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

[হেমেন্দ্রকুমার রায়]

৩ জুন ১৯২৫-এ গিরিশচন্দ্রের মঞ্চসফল পৌরাণিক নাটক 'জনা' প্রদর্শিত হলো নাট্যমন্দিরে। শিশিরকুমার 'জনা'র জন্য প্রবীণা অভিনেত্রী তারা-

সুন্দরীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে নাট্যনিকেতনে নিয়ে এলেন। 'জনা'কে আধুনিক কালের উপযোগী করে মঞ্চস্থ করার জন্য প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার কেটেকুটে সম্পাদনা করে নিলেন। এত বিদূষক চরিত্রটি বাদ পড়ল। এবং

"In the final scene, for instance, 'Jana' commits suicide in Mr. Bhadhuri's play, whereas in the original the Goddess Ganga appears from under the water and takes 'Jana' into her bosom."

['সার্ভেন্ট' পত্রিকার মন্তব্য]

খুব মজাদার খবর এই যে, নাট্যমন্দিরে যখন 'জনা'কে প্রয়োগবিদ্ শিশিরকুমার সাজিয়ে গুছিয়ে নতুন চিন্তা দিয়ে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন তখন হাস্যকর ভাবে আর্ট থিয়েটার একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনের ভাষাটি থেকে শিশির সমসাময়িক থিয়েটারগুলিকে চিনতে পারা যাবে। আর্ট থিয়েটার লিখলেন,

'হেথা অংগহীন নহে বংগ পূর্ব অবয়ব
এসো, দেখো যেই জনা গিরিশ গৌরব।'

এই দু'টি চরণে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের ধারার কবিতার সন্ধান পাই বটে, কিন্তু 'গিরিশ গৌরব' দেখতে পাই না।

'জনা'র ওপরে শিশিরকুমারের অস্ত্রোপচার নিয়ে বেশ কিছুকাল বিতর্ক চলেছিল। সেকালে এই বিতর্কের কোনো সমাধান হয়নি। তবে বিজ্ঞজনেরা 'জনা'র সফল মঞ্চায়নের কথা আমাদের জানিয়েছেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

"তিনি [শিশিরকুমার] সেজেছিলেন প্রবীরের ভূমিকায়, সে অভিনয়ে আমরা প্রবীরের আসল রূপ দেখেছিলাম এবং তাঁর শিক্ষায় তারাসুন্দরী জনার ভূমিকায় যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন—তাতে পুত্র গর্বে জননীর গৌরব এবং পুত্রবধের প্রতিশোধ স্পৃহার যে সংযত মনোভাব তাও বাঙলা রংগমঞ্চে সম্পূর্ণ অভিনব।"

১৯২৫-এর ১৩ অগাস্ট 'পুণ্ডরীক' অভিনীত হয়। নাটকটি ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসুর লেখা। 'পুণ্ডরীক' কোনো দিক থেকেই নাট্যমন্দিরের মুখ উজ্জ্বল করেনি। 'শিশির' পত্রিকার সমালোচনায় (১৫।৮।১৯২৫) অন্তত সেকথা বুঝতে পারা যায়—

"এগার মাস গর্ভযন্ত্রণার পর 'পুণ্ডরীক' প্রসব হইল। অনেক আশা লইয়াই গত বৃহস্পতিবার 'পুণ্ডরীক' দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া

বুঝিলাম ভাদুড়ীমহাশয়ের এই গর্ভযন্ত্রণার কারণ। এতবড় rubbish নাটক অভিনয় করিতেছেন বলিয়া বোধহয় ভাদুড়ী মহাশয় নিজেই লজ্জিত হইতেছিলেন। প্রথমেই তিনি ভূমিকায় বলেন, দেশবন্ধু-রাত্রে কি বই অভিনীত হইবে এই প্রশ্ন মীমাংসার সময় আসিলে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু তাঁহার নাটক 'পুণ্ডরীক' বইখানি ঐ রাত্রে অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। —এবং সেইজন্যেই এই নাটকখানি দেশবন্ধু-রাত্রে অভিনীত হইতেছে। নাটকখানি রুচির দিক দিয়া পাষাণীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। লেখার মধ্যেও কাঁচা হাতের আভাস প্রতি লাইনে পাওয়া যাইতেছিল।…"

২০ অগাস্ট মনোমোহন নাট্যমন্দিরে 'বসন্তলীলা', 'পুনর্জন্ম' এবং 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' অভিনীত হয়। গীতিনাট্য 'বসন্তলীলা'য় কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং সরলাবালা অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে বসন্তদূত, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা রূপে।

'পুনর্জন্ম' প্রহসনে যাদব, অশ্বিনী ও সৌদামিনী রূপে দেখা দিলেন যথাক্রমে নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং চারুশীলা। 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' প্রহসনে প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় (চাটুজ্যে) ও নরেশ মিত্র (বাঁড়ুজ্যে) অংশগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল বসুর দুটি পরিচিত প্রহসন নাট্যমন্দিরের প্রযোজনায় নতুন হয়ে ওঠে। 'নাচঘর' পত্রিকা মন্তব্য করলেন—

> "…'পুনর্জন্ম' ও 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যের' অভিনয় যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন যে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়েছি তাঁদের 'পুনর্জন্ম' ও 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে'র মতো দুখানি বহু পুরাতন ক্ষুদ্রতম হাস্যরসাত্মক নক্সাকে এমন নবভাবে সুরসাল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করে অভিনয় করতে দেখে!"
>
> [২৮।৮।১৯২৫]

বোধকরি ১৯২৫-এর নভেম্বরের শেষদিকে নাট্যমন্দিরে 'আলমগীর' মঞ্চস্থ হয়। এবারে উদিপুরী রূপে অবতীর্ণা হলেন তারাসুন্দরী। প্রবীণা তারাসুন্দরী ও নবীন শিশিরকুমার 'আলমগীর' উপস্থাপনায় আবার সাড়া জাগিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের মনোমোহন নাট্যমন্দির মঞ্চে আবির্ভাবের দেড়বছর পূর্ণ হলো এই সময়ে।

খুব কম সময়ের মধ্যেই মনোমোহন নাট্যমন্দির একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় পরিণত হয়। এবং বলতে বাধা নেই, এই অল্প সময়ের মধ্যে অজস্র অর্থ যেমন ব্যয়িত হয়েছিল, তেমনি অজস্র অর্থ ঘরে এসেছিল। অথচ আয়-ব্যয়ের হিসেব বুঝতেন না বলে শিশিরকুমার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নাট্য-

মন্দিরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু শিশিরকুমার বন্ধুভাগ্যে গরীয়ান। দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কলারসিক শিশির-অনুরাগীরা। ১৯২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর নাট্যমন্দির লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। মূলধন—পাঁচ লক্ষ টাকা। পরিচালন সমিতিতে রইলেন—তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরকুমার নিজস্ব ব্যবসা লিমিটেড কোম্পানীর কাছে বিক্রি ক'রে নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার পেলেন। কর্তৃত্ব আগের মতো মেসার্স ভাদুড়ী এ্যাণ্ড কোং-এর হাতে রইল। এবং নাট্যমন্দির আসর পাতলেন ম্যাডানদের কর্নওয়ালিস (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) মঞ্চে।

শিশিরকুমার মনোমোহন মঞ্চ ত্যাগ করলেন একটি গুরুতর কারণে। অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিচারণায় সেই কারণটি নির্দেশিত আছে ঃ

> "দোতলায় ছিল মনোমোহনবাবুর নিজস্ব বৈঠকখানা। সমস্ত থিয়েটার বাড়িটা ভাড়া দিলেও উক্ত বৈঠকখানাটি কিন্তু নিজের অধিকারেই রেখেছিলেন মনোমোহনবাবু। সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাশা খেলার আসর বসাতেন তিনি। আর মাঝে মাঝে খেলার উৎসাহে সব ভুলে কেউ কেউ চিৎকার করে উঠত—'কচ্চে বারো'। তখন যে মঞ্চে প্লে চলছে সে হুঁশ তাদের থাকতো না। মঞ্চ-কর্মীরা বা অভিনেত্রীরা মাঝে মাঝে অসুবিধা বোধ করতেন। সময়ে সময়ে দর্শকদের কানেও সে চিৎকার গিয়ে পেঁছুত। হয়তো মঞ্চে কোনো একটা দারুণ নাটকীয় মুহূর্তের সময় সোল্লাস চিৎকার ভেসে এল—'কচ্চে বারো'—
>
> শিশির ভাদুড়ী মশাই যখন এখানে মনোমোহন নাট্যমন্দির করেছিলেন তখনো চলতো। শিশিরবাবু এ নিয়ে বহুবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও যখন মনোমোহনবাবুর পাশা খেলা বন্ধ হোল না, তখন শিশিরবাবু ওখান থেকে উঠেই গেলেন।…"[১৪]

মনোমোহন থেকে উঠে যাবার পর নাট্যমন্দিরকে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি কর্নওয়ালিশ মঞ্চে ২৩ জুন ১৯২৬। কর্নওয়ালিস মঞ্চে নাট্যমন্দিরের গৌরবময় ইতিহাসটি বিধৃত আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, শিশিরকুমার এই মঞ্চে এসে নাট্যকলার বিবর্ধনে সবচাইতে বেশি মনোযোগী হতে পেরেছিলেন। ফলে নাট্যমন্দিরের প্রকৃত ভূমিকাটি এই মঞ্চেই প্রকাশিত হয়েছিল। ২৩ জুন 'সীতা' মঞ্চস্থ হবার পর ২৫ জুন ১৯২৬ অভিনীত হয় 'বিসর্জন'। 'বিসর্জন' শিশিরকুমারের যুগান্তকারী প্রযোজনায় সব দিক থেকে আধুনিক হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়—

> "…কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহপূর্ণ আদেশে ও তাঁহার সুনিপুণ

নির্দেশে নাট্যমন্দিরে অভিনয়ার্থ এই নাটক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে। দৃশ্যাবলীর সংস্থানেও অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। কাজেই এই বিসর্জনে নূতনত্বের অভাব হইবে না। কবির সুরভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুশিক্ষায় এই নাটকের গানগুলি সঠিক রূপে তৈরী হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাবোপযোগী দৃশ্যপট রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন নাটক নূতন হইয়াছে।—

বিসর্জন

নাটকের এই নূতন রূপ দেখিবার জন্য সুধীবৃন্দকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছি।"

"বিসর্জন' যে কতটা ভালো হয়েছিল তার সবিস্তার আলোচনা আজ আমাদের হস্তগত। বাহুল্য বোধে সে সব তথ্যের পুনরুল্লেখ করছি না। শুধু এইটুকু উল্লেখ করব যে—অভিনয়ের দিক থেকে, মঞ্চকুশলতার পরিচয়ে ও মুডলাইটের সর্বপ্রথম প্রয়োগে 'বিসর্জন' কালজয়ী মঞ্চপ্রয়াসে পরিণত হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনীত হয় ১৯২৬-এর ১ জুলাই। পরস্পর বিরোধী তিনটি চরিত্রে (ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ) রূপদান করলেন শিশিরকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শীতল পাল, যোগেশ চৌধুরী, ধীরেন দাস, চারুশীলা, শেফালিকা (পুতুল) ও প্রভাদেবী।

বিশিষ্ট চিত্র ও নাট্যপরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের মতে শিশিরকুমারের ভীম রাম-চরিত্রায়ণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ—"ভীমে প্যাঁচ ছিল না, কিন্তু বিপরীতমুখী ভাবধারার এমন অপূর্ব সাম্য ও প্রকাশ ছিল য াহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

১৯২৬-এর ১ ডিসেম্বর নাট্যনিকেতনের নতুন নাটক 'নরনারায়ণ'। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটকটি প্রণয়ন করেন অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের প্রভাবে। 'নরনারায়ণ'-এর প্রথম নাম ছিল 'কর্ণ''। পরে শিশির-কুমারের কথামত ক্ষীরোদপ্রসাদ 'নরনারায়ণ' নাম দেন। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে শিশিরকুমারের সাহিত্যবোধের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুধু নাটকের নামকরণে নয়, 'নরনারায়ণ' নাট্যানুষ্ঠানেও প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের দান যথেষ্ট।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন,

"......শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের নর-নারায়ণকে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং প্রযোজনার অতি সহজ সংকেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন সার্থকভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনিও প্রতিফলিত করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি, দুটো ভাঙা রথের চাকা, কিছু দলিত-মথিত বৃক্ষশাখা এবং থমথমে আবহ সৃষ্টি করে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটা দ্বৈরথ-সংগ্রাম হয়ে গেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-সম্পদ অপরেশচন্দ্রের চেয়ে বেশি ছিল, এবং কাব্যাবৃত্তিতে নাট্যাচার্য আর তাঁর শিষ্যরা অধিকতর দক্ষ ছিলেন বলেই নর-নারায়ণে জটিলতা বেশি থাকলেও নাট্যাচার্য তাকে সার্থক সৃষ্টি করে তুলতে পেরেছিলেন।"[২৫]

শিশিরকুমার পেশাদারী মঞ্চে সর্বপ্রথম সামাজিক নাটকের অভিনয় করলেন ১৯২৭ সালের ১ জুন। নাট্যানুষ্ঠান 'প্রফুল্ল'। বলাবাহুল্য যোগেশ সাজলেন শিশিরকুমার। অভিজ্ঞ নাট্যসমালোচকদের মতে শিশিরকুমারের যোগেশ একটি অভিনব সৃষ্টি। দর্শকদের মুখের দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনায় তিনি 'যোগেশ' চরিত্রটির বিশ্লেষণ করলেন। এই বিশ্লেষণের সহায়ক ছিল শিশিরকুমারের বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী। এ প্রসঙ্গে 'নাচঘর' পত্রিকার সমালোচনাটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"......'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কথাগুলি বলবার সময়ে শিশিরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্নামাখা হাসির অবতারণা করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব। এ হাসি তাঁর নিজের সৃষ্টি। কথিত আছে গিরিশচন্দ্র এখানে প্রস্তরীভূত মূর্তির মত স্তম্ভিত হয়ে থাকতেন, অর্ধেন্দুশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন এবং দানীবাবু অর্ধচেতন ও অর্ধ-অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন। কিন্তু শিশিরকুমার এই দৃশ্যে যোগেশ চরিত্রে যে conception বা ধারণা করেছিলেন তাতে এই অর্ধ-উন্মাদের মত কান্নামাখা হাসি তাঁর মুখে চমৎকার মানিয়েছিল।"

১৯২৭ সালের ২৭ জুলাই 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ হয়। 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদকে প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার 'কমিক চরিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করলেন না। তাঁর মতে 'নিমচাঁদ একটি হতাশাগ্রস্ত যুবক। সে ইংরাজি-শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক। কিন্তু সে পেল কেরাণীর চাকরি। কৃতবিদ্য যুবক হয়ে কেরাণীর করবে সে? ফলে বিদ্রোহী হয়ে উঠল নিমচাঁদ। সে মদ ধরল, উৎসন্নে গেল।'

'সধবার একাদশী' নাটক সম্বন্ধ শিশিরকুমারের মন্তব্য,

"আমি মনে করি this is one of the best plays in Bengali literature. এর মুখ্য উদ্দেশ্য মদ খাওয়াকে গালাগালি দেওয়া নয়, বাঙালীর মধ্যে যে নকল সাহেব হওয়ার আদিখ্যেতা তাকেই স্যাটায়ার করা।.."[১৬]

শিশিরকুমার প্রযোজিত 'সধবার একাদশী' পরে শ্রীরঙ্গমেও মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাট্যাচার্যের অপরাহ্নবেলার অভিনয় দেখে বিমুগ্ধ হয়েছেন একজন কবি ও একজন নট-নাট্যকার। এঁরা হলেন কবি বুদ্ধদেব বসু এবং নাট্যকার নট উৎপল দত্ত। এযুগের খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত স্বভাবসিদ্ধ দ্যুতিপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন ঃ

"......সাতটা বাজে তবু পর্দা ওঠার নাম করছে না—এমনি সময়ে প্রেক্ষাগৃহের আলো যেন এক ধমক দিয়ে নিবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ন্যাকড়াটা দু ফালি হয়ে সরে গেল। একটা অতিকায় দুর্গন্ধপূর্ণ রংচটা বাগানবাড়ির সীন বাঁকা হয়ে ঝুলছে ; শ্রাবণের বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে বাগানবাড়ি। সামনে শূন্য মেজেয় একখানা জাজিম পাতা—তাতে দুই ভদ্রলোক বসে। একটা আসবাব পর্যন্ত নেই সে দৃশ্যে। উইংসে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দেখা যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে। উপরের টাঁজার বর্ডারগুলো ফালি ফালি হয়ে বাতাসে উড়ছে। এহেন যুদ্ধোত্তর নৈরাশ্য ও দারিদ্র্যের চরম অভিব্যক্তির মধ্যে একজন বললেন ওহে, অটল নাকি মদ ধরেছে। অন্যজন মৃদু হাসলেন—বিদ্যুৎ খেলে গেল সে হাসিতে ; বললেন—পানায়, খায় না। শিশিরকুমারের পরিচালনায় 'সধবার একাদশী' আরম্ভ হোলো।

...তারপর থেকে পেশাদার নাট্যশালা মানেই আমার কাছে শ্রীরঙ্গম হয়ে উঠল ; আর কোথাও যাওয়ার জো রইল না।"[১৭]

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাতে সমাজের উপকারই সাধিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রকে আহ্বান জানালেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের অনুরোধে শরৎচন্দ্র নিজের হাতে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটিকে কেটেকুটে 'ষোড়শী'তে রূপান্তরিত করেন। মনীন্দ্র রায়কে একটি পত্রে তিনি লেখেন (১ জুন ১৯২৭) :

" দু-একদিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখবো। (বইখানি ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। আমি আবার জটখোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের জন্যে তৈরি করে দিয়েছি বোধহয় নেহাত মন্দ হয়নি।...)"[১৮]

ষোড়শী মঞ্চস্থ হলো ৬ অগাস্ট ১৯২৭। এই নাটকটির ভূমিকালিপি এই-রকম :

জীবানন্দ—শিশির ভাদুড়ী, এককড়ি—গোপাল ভট্টাচার্য, জনার্দন—যোগেশ চৌধুরী, শিরোমণি—অমলেন্দু লাহিড়ী, প্রফুল্ল—রবি রায়, তারাদাস—হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, নির্মল—শৈলেন চৌধুরী, সাগর সর্দার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হৈমবতী—পদ্মা, ষোড়শী—চারুশীলা।

১৩৩৪ বংগাব্দের ২৩ ভাদ্র তারিখের একটি পত্রে শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে লিখেছেন,

"ষোড়শী বইটা পোড়ো। বোধহয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুশি হবে। শিশির কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেছি।"

অন্য একটি পত্রে লিখেছেন,

"বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির! আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি। অদ্ভুত ধৈর্যের সংগে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একদা লিখেছিলেন, "আমার মনে হয় মাইকেল ও জীবানন্দ—এই দুটি চরিত্রই শিশির-জীবনের নিকটতম আত্মীয়, নিজ ব্যক্তিত্ব প্রক্ষেপের সার্থকতম পটভূমিকা। ...জীবানন্দের বেপরোয়া অসংযম; অকুণ্ঠ আত্মপ্রসার ও শেষ জীবনের মর্মদাহী অনুশোচনা - মনে হয় যেন এর ভেতর দিয়ে শিশিরের ব্যক্তিজীবনের দৃপ্ত সাহসিকতা ও করুণ আত্মগ্লানির কিছুটা সুরমূর্ছনা মিশেছিল।"

'ষোড়শী' 'সীতা'র মতো লোকলক্ষ্মীর সমাগমে ধন্য হয়নি প্রথমটায়। তাই বাধ্য হয়ে শিশিরবাবু খুব দ্রুত মহলা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ধরলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর 'শেষরক্ষা' মঞ্চমুক্তি পেল। এখানে স্মর্তব্য যে 'গোড়ায় গলদ' শিশিরকুমারের জন্য 'শেষরক্ষা'য় পরিণত হয়। 'শেষরক্ষা' যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগুণান্বিত কমেডি, ঠিক তেমনি 'শেষরক্ষা' প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের এক অনবদ্য সৃষ্টি। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে সমাপ্তি দৃশ্য পর্যন্ত 'শেষরক্ষা'র কোথাও গলদ ছিল না। সর্ব-প্রথম এই নাট্যানুষ্ঠানেই নাট্যমন্দিরের পক্ষ থেকে দর্শক ও অভিনেতার ব্যবধানটি ঘুচিয়ে দেওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নাট্যনিকেতনে 'শেষরক্ষা' দেখে গেলেন, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবি-সাহিত্যিকদেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল সেদিন।

১৯২৭ সালের ২৩ নভেম্বর নাট্যনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' মঞ্চস্থ হলো। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিশিরকুমার। ৩১ ডিসেম্বর নামলেন 'ঔরংজেব'এর ভূমিকায়।

১৯২৮ সালে শিশিরবাবু কয়েকটি পুরোনো নাটকের মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেন। সে-নাটক ক'টি হলো: 'বলিদান' (২৫: ১ ১৯২৮), 'বিল্বমঙ্গল' (২৯. ৫. '২৮), 'প্রফুল্ল' (৩. ১০. '২৮)। শেষ নাট্যানুষ্ঠানে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে দানীবাবুর সঙ্গে অভিনয় করেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৮-এ নাটামন্দিরের নিবেদন 'দিগ্বিজয়ী'। নাট্যকার যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকটি পাঠ করে – শিশিরকুমারের প্রযোজনা সম্পর্কে কোনো ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। এই নাট্যগ্রন্থটিকে গ্রন্থ না বলে খসড়া বলাই সমীচীন। উৎসর্গ পত্রে যোগেশ চৌধুরী সেকথা স্বীকার করেছেন—

"শিশিরবাবু,
এ নাটক আপনিই লিখতে বলেছিলেন, নামকরণেও ইঙ্গিত ছিল। আমি কোনোগতিকে নাটকখানিকে পাঠক সমাজে বার করলাম; কিন্তু শুধু পাঠেই তো নাটকের পরিপূর্ণ ও সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না। আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান, সতেজ ও জীবনরসমণ্ডিত করে তুলেছেন। সুতরাং, নাটকখানির উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকবির উক্তি দিয়েই আমি আমার যুক্তি সমর্থন করলাম 'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ'। আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

ইতি—
গুণমুগ্ধ
যোগেশদা"

'দিগ্বিজয়ী' নাট্যানুষ্ঠানের সালংকার বর্ণনা আমরা প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি। তা থেকে বেশ বুঝতে পেরেছি 'দিগ্বিজয়ী' প্রয়োগাচার্য শিশির-কুমারের সর্বশক্তি প্রয়োগের আলম্বন বিভাব মাত্র। এবং এই প্রয়োগ সাফল্যের মধ্য দিয়েই তিনি হয়েছেন নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত।

এ যুগের প্রয়োগ-প্রধান শম্ভু মিত্র 'দিগ্বিজয়ী'র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনাটি আমাদের কাছে পরম সম্পদ। আমরা উক্ত সমালোচনার কিছু কিছু অংশ পাঠকের গোচরে আনতে চাই,

'[দিগ্বিজয়ী দেখে]…এই প্রথম বুঝলুম যে এমন একজন লোক দরকার হয় যার চিন্তাটা এইরকম প্রত্যেকটা চরিত্রাভিনয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

তাতে যে সম্বন্ধতা আসে, মুখে কিছু না বলেও যে বিচিত্র মানে প্রকাশ করা যায়, তা অন্যভাবে অসম্ভব। এরই আর এক উদাহরণ হচ্ছে প্রথম অংকে যেখানে নাদির শাহ সিতারার পরিচয় নিচ্ছে। সেইখানে সিতারা যখন বলে যে, তার সদ্যবিবাহিত স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে তখন - নাটকে যেটা লেখা নেই—নাদির 'শোভান আল্লা' বলে হঠাৎ অতর্কিত ক্ষিপ্র হাতে সিতারার কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোরা তুলে নেয়, তারপরে সেটা নিজের কোমরবন্ধে গুঁজে রাখতে রাখতে বলে – 'তোমায় ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।'

…ধরা যাক্, ঐ-নাটকেরই তৃতীয় অংক। নাটকে লেখা আছে, দৃশ্য হচ্ছে একটা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গন। কিন্তু চোখে দেখেছিলুম একটা ছাত। ছাতটার পিছন দিকের অংশ বোধহয় এক ধাপের মতো উঁচু ছিল। তারই শেষে হ'লো ছাতের নীচু পাঁচিল। এবং তার পরে পিছনে পটে আঁকা দূরের বাড়িগুলোর উপর অংশ ও আকাশ।

এই দৃশ্য দেখামাত্র মন ভ'রে গিয়েছিলো। ছবিতে যেমন বেশীরভাগ জায়গাটা ফাঁকা রেখেই ভরাট ক'রে তুলতে পারেন এক একজন শিল্পী, এ সেইরকম।

…'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অংকে নাদির শাহ্ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল্ ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শব্দ হ'তো মুহুর্মুহু, আর তার মধ্যে সৈনিকদের চীৎকার ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যেতো। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হয়ে যেতো, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতো সেই লালের মধ্যে।

……এই নাট্যাভিনয় যদি না-দেখতুম তাহলে 'নবান্ন'র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হ'তো না একথা অনস্বীকার্য।" [৩০]

১৯২৯ সালের ৮ জুন নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্দ্র রচিত 'বুদ্ধদেব' মঞ্চস্থ হয়। তারপর 'রমা'। 'রমা' 'পল্লীসমাজ'-এর নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র নিজেই। ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫-এ আর্ট থিয়েটার কর্তৃক সর্বপ্রথম 'রমা'র অভিনয় হয়। আর্টের কর্তৃপক্ষ 'রমা'কে অচল বলে বাতিল করে দেন। এতে শরৎচন্দ্র নিদারুণ আঘাত পান। তিনি নাকি এ সময়ে শিশিরকুমারকে বলেছিলেন, ভায়া, ওরা বোঁদে তৈরী করতে জানে, সন্দেশ নয়। তুমি সন্দেশ তৈরী করে একবার দেখিয়ে দাও যে, এটা অচল নয়।' বলা বাহুল্য শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের কথার মর্যাদা রেখেছিলেন। নাট্যমন্দিরের 'রমা' একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার স্বীকৃতি পেয়েছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শংখধ্বনি' মঞ্চস্থ হয় ২ নভেম্বর ১৯২৯। এই নাটকে 'কেতনলালে'র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দক্ষতা বিশ্বরঙ্গমঞ্চের

কীর্তিমান অভিনেতাদের স্পর্শ করেছিল। বড়দিনের সময় অভিনীত হলো 'তপতী' (২৫.১২.১৯২৯)। 'তপতী' দেখার মতো দর্শক খুব কমই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ আর্ট থিয়েটারে তখন সগৌরবে চলছে 'মন্ত্রশক্তি'।

বন্ধুজনে শিশিরকুমারকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরে শিশিরকুমার বলেছিলেন—"ব্যবসা করছি সত্য, তা বলে ব্যবসাদারী খাতিরে 'তপতী' নাটকের অভিনয় করব না। গতানুগতিক রীতিতো শুধু গ্যালারি-মাতানো......তা আমি পারব না।" 'তপতী' মঞ্চস্থ করে নাট্যমন্দিরকে বিস্তর লোকসান দিতে হয়। তথাপি সান্ত্বনা এইখানে যে অবনীন্দ্রনাথ এই নাটক দেখে বলেন, "রবি কাকাকে লিখব, শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছে চমৎকার—তিনি দেখলে খুশী হবেন খুব—তাঁকে লিখব একবার এসে যেন শিশিকুমারের তপতী দেখে যান। রবিকাকার অভিনয়ের চেয়ে কোনও অংশে খাটো নয়।"

১৯৩০ সালে কর্নওয়ালিস মঞ্চের 'লিজ' ফুরিয়ে যায়। ম্যাডান কোম্পানী তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা বাড়ীভাড়া (মাসিক) পেয়েও সন্তুষ্ট ছিলেন না। অগত্যা শিশিরকুমার মঞ্চটি ছেড়ে দেন। কয়েক মাসের জন্য শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন। তারপর সতু সেনের যোগাযোগে মিস মার্বেরীর আমন্ত্রণে, শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। শিশিরকুমারের আমেরিকার নাট্যানুষ্ঠানগুলির বিস্তৃত আলোচনা এপর্যন্ত বেরিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সতু সেনের 'আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া গেছে।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শিশিরকুমার কিছুদিনের জন্য রঙমহলে যোগদান করেন। তারপর ১৯৩৪-এ চলে আসেন আর্টের শূন্য মঞ্চে। এই পর্যায়ে স্টার থিয়েটারের নাম 'নব-নাট্যমন্দির'। ১৯ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় যদুনাথ খাস্তগীরের 'অভিমানিনী'। ফেব্রুয়ারি মাসে নরেন্দ্র দেব রচিত 'ফুলের আয়না' অভিনীত হয়। এই দুটি নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য দানের ইতিহাস নেই। তবে 'ফুলের আয়না' সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য নাট্যাভিনয় হিসেবে স্মরণীয়।

২৮ জুলাই ১৯৩৪ নব-নাট্যমন্দিরের প্রযোজনা শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'। নাট্যরূপ—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন:

নীলাম্বর—শিশিরকুমার, পীতাম্বর—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজেন—শৈলেন চৌধুরী, ভুলু মুখুজ্যে—ইন্দ্র চক্রবর্তী, গাজন সন্ন্যাসী—শান্তশীল গোস্বামী, নিতাই গাঙ্গুলী—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাজ—কংকাবতী, মোহিনী—রাণীবালা, সুন্দরী- রাধারাণী।

'বিরাজ বৌ' নাট্যানুষ্ঠানে দর্শকেরা শিশিরকুমারের 'নীলাম্বর' দেখে অবাক হয়েছিলেন। বিচক্ষণ দর্শকেরাও শিশিরকুমারের অভিনয় প্রতিভার তারিফ না করে পারেননি। তাঁরা বলেছেন, 'কোথায় আলমগীর, কোথায় চাণক্য, আর কোথায় এই একটা পল্লীবাসী আকাট মুর্খ গাঁজাখোর নীলাম্বর, ইহাকেই তো বলে প্রতিভা।' [হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

১৯৩৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরমা' ও ৭ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' মঞ্চস্থ হয়। প্রতাপাদিত্যে নাট্যাচার্য 'রডা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রডা চরিত্রের মুখে হিন্দি সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন, শিশিরকুমার 'রডা'র মুখে চট্টগ্রামের সংলাপ বসিয়ে দেন। 'রডা' চরিত্রের মুখে এই নতুন সংলাপ বসাবার কারণঃ প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের কয়েকদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পঠন-পাঠন। 'রডা'র মুখে চাটগেঁয়ে সংলাপ শুনে কতিপয় দর্শক বলে ওঠেন—"রডা চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল করে?" শিশিরকুমার এ মন্তব্য শুনতে পান। বিরতির সময়ে চাদর গায়ে দিয়ে একগাদা বই ও ম্যাপ নিয়ে শিশিরকুমার দর্শকদের ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হন। হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন দর্শকেরা। কয়েকজন অবশ্য মন্তব্য করলেন—"রিমার্কসগুলো ওভারলুক করেন না কেন? এটা তো ক্লাসরুম নয়।"

১৯৩৪-এর ২৪ নভেম্বর ও ২৪ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় 'দশের দাবী' ও 'বিজয়া'। প্রথমটির রচয়িতা শচীন সেনগুপ্ত, পরেরটি শরৎচন্দ্রের লেখা 'দত্তা'র নাট্যরূপ। 'বিজয়া'র বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল,

"মঙ্গলঘট স্থাপিত। অভিনেতৃগণ শুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত।"

এই নাটকের চরিত্রগুলিকে বণ্টন করা হলো এইভাবেঃ রাসবিহারী—শিশিরকুমার, নরেন—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, বিলাস—শৈলেন চৌধুরী, দয়াল—শীতল পাল, পরেশ—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া—কংকাবতী, নলিনী—রাণীবালা।

শিশিরকুমারের 'রাসবিহারী' চরিত্রাভিনয় সম্পর্কে একটু বিতর্ক আছে। বুদ্ধদেব বসু শিশিরকুমারের 'রাসবিহারী'কে 'ম্লান' চরিত্রাভিনয় বলে উল্লেখ করেছেন। আবার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"তাঁহারা বোধহয় লক্ষ্য করেন নাই যে তাহার বাহিরের মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির নীচে তাহার এই স্থূলতা দেখানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" আমরা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিকে অভ্রান্ত বলে বিবেচনা করি। কারণ উপন্যাসের পাঠ নিয়েছি তাঁর কাছেই।

নবনাট্যমন্দিরে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'শ্যামা' নাটকটি মঞ্চমুক্তি পায় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫-এ। বৌদ্ধজাতকের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত এই নাটকের 'শ্যামা' চরিত্রের রূপদান করেন প্রভাদেবী, শিশিরকুমার 'উত্তীয়' সাজেন।

এই বছরের ১১ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'রীতিমত নাটক'। নাট্যকার—জলধর চট্টোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপনে কিন্তু জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিশির-কুমারের নামও মুদ্রিত হয়েছিল। নাট্যকার হিসেবে শিশিরকুমারের নামটি বিজ্ঞাপিত হলে সাধারণের মনে এরূপ ধারণা জন্মায় যে শিশিরকুমারই প্রকৃত নাট্যকার—জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নামটি উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। বোধ করি এই ভ্রান্তি নিরসন করার জন্য 'রীতিমত নাটকে'র তৃতীয় সংস্করণে 'কৈফিয়ৎ' স্বরূপ জলধর চট্টোপাধ্যায় লিখলেন,

> "আমার লিখিত মূল পাণ্ডুলিপির নাম ছিল 'রঙ্গমঞ্চ'। 'রীতিমত নাটক' নামটি শিশিরবাবুর দেওয়া। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে "গল্পটিকে ঢেলে সাজাবার" জন্য শিশিরবাবু আমাকে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দেন। আমিও তদনুসারে নাটকখানি 'রিরাইট' করি। চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা সমাবেশ, সংলাপ যোজনা বিষয়ে শিশিরবাবু আমাকে কোন সাহায্যই করেননি।'

'নিবেদন' অংশে শিশিরকুমার লেখেন,

"এই নাটকের আখ্যায়িকা জলধরবাবু আমার কাছে এনেছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর অভিনয়ার্থে যতকিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছি, অসীম ধৈর্য সহকারে সেবিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। এই নাটকের নাট্যকার হিসাবে নামটা যে আমার দেওয়া হয়েছে, সে শুধু তাঁরই অনুরোধে। নতুবা এই নাটকের মধ্যে যা কিছু নাট্য—তা জলধরবাবুর নিজের, তা' আমার নয়। তবে আমি নিজের নাম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছি কেন? তার কারণ, আমার মনে হয়েছে আমি যদি নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতাম, তাহ'লে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।"

'রীতিমত নাটক' জলধর চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চোপযোগী ঘটনাবহুল ও চমকপ্রদ নাটক। অতিনাটকীয়তা আছে এই নাটক—সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই নাটকের সম্পদ দিগম্বর মজুমদার। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিকই বলেছেন, "দিগম্বর চরিত্রের পরিকল্পনা একদিক দিয়া যেমন বাস্তবধর্মী, অন্যদিক দিয়া তেমনই বিদগ্ধ মানস-প্রসূত। একটি উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যভাববিলাসী চরিত্রের পক্ষে আকস্মিক মানসিক আঘাতের ফলে যে বুদ্ধি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক, তাহার সুনিপুণ সরস বর্ণনায় ইহা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।"...[৩১]

'রীতিমত নাটক' স্মরণীয় হয়ে থাকবে—একমাত্র কারণ প্রফেসর দিগম্বর

তথা শিশিরকুমার ভাদ্‌ড়ীর জন্য। নিত্য নতুন সংলাপ তৈরী করে, নিত্য নতুন কবিতা আবৃত্তি করে, শিশিরকুমার প্রফেসর দিগম্বরকে অক্ষয় আসন দান করেছেন বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'রীতিমত নাটকের' অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন ('শিলালি' পত্রিকায়):

"স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ-অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। সে রাত্রের অভিনয়ের কথা এখনও আমার মনে আছে—'এই করেছ ভাল নিঠুর' কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে শিশিরকুমার হঠাৎ লাইন ভুলে গিয়ে একটু থমকিয়ে যান—তারপরেই সামলে নেবার জন্য একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করলেন—মনে হচ্ছিল কবিকে দর্শকের প্রথম সারিতে দেখে ইন্সপায়ারড হয়ে সেদিন কবির রচনা রিসাইট করেছিলেন।" [৩২]

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। 'গৃহদাহ' শিশিরকুমারের হাতে পড়ে 'অচলা' হয়ে যায়। ২২ অক্টোবর ১৯৩৬-এ 'অচলা' মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যানুষ্ঠানে শিশিরকুমার 'কেদার' ও 'সুরেশে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই বছরের ডিসেম্বর মাসের ২৪-এ রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হয়। 'যোগাযোগ' সাধারণ দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারেনি। [৩৩] ফলে নব-নাট্যমন্দির কিছুটা অসুবিধার মধ্যে পড়ে। কিন্তু শিশিরকুমার শত অসুবিধার মধ্যেও আপন ব্রত থেকে বিরত হননি। সুখের কথা, রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ দেখে বলেছিলেন,

"নবনাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণাকায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না··· তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতাদের মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে তবে সে জন্যে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদ্‌ড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।"

'যোগাযোগ' নাট্যানুষ্ঠানের পর নাট্যমন্দিরে আর কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হয়নি। নতুন নাটক নিয়ে ক্ষতির পরিমাণ যখন ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলল, যখন বাড়ীভাড়ার টাকা পর্যন্ত যোগাড় করা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে শিশিরকুমার কয়েকটি পুরোনো নাটকের অভিনয় করলেন। কয়েক মাস এই ভাবে অতিক্রান্ত হলো। কিন্তু ১৯৩৭ সালের জুন মাস নাগাদ শিশিরকুমার আবার মঞ্চহারা হলেন। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

"রঙ্গমঞ্চ থেকে যেদিন শিশিরকুমারকে চলে আসতে হয়, সেদিনকার দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছে। ঘুম থেকে উঠে সকালবেলাই দেখলেন, বাড়িওয়ালার লোক তাঁর জিনিসপত্র সমস্ত রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। গায়ে জামাটা দিয়ে রাগে

কাঁপতে কাঁপতে শিশিরকুমার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তখন রাস্তা দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে, তাঁর ভক্তের দল, ট্রাম-বাস থেকে উঁকি মেরে দেখেন, পায়ে হেঁটে যাঁরা চলছিলেন তাঁরা কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ান। কোন কোন রসিক মন্তব্য করে ওঠেন। বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারকে সেখান থেকে সরে যেতে হয়। এ-জাতীয় ঘটনার ব্যথা দেহের ভেতর হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে। শিশিরকুমারের ছিল। তাই স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের আশা, তাঁর কাছে শুধু স্বপ্ন ছিল না, সেইটেই ছিল তাঁর অস্তিত্ব।"...[৩৪]

দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর মঞ্চহারা শিশিরকুমারকে আমরা কয়েকটি অভিনয় করতে দেখি বিভিন্ন মঞ্চে। তারপর স্মরণীয় ১৯৪১-এ তিনি নিজের মঞ্চ পেলেন। প্রবোধচন্দ্র গুহের নাট্যনিকেতনে শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গম' প্রতিষ্ঠিত হলো। এটিই তাঁর সর্বশেষ কীর্তিস্তম্ভ। শ্রীমণি বাগচি বলেছেন, ১৯৪২ সালের ১০ জানুয়ারি 'শ্রীরঙ্গম'এর উদ্বোধন হয়। কথাটি অযথার্থ। কারণ আমরা সঠিকভাবে জানি, ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর তারাকুমার মুখোপাধ্যায় 'জীবনরঙ্গ' নাটক নিয়ে শ্রীরঙ্গমের যাত্রা শুরু হয়।

অকৃতদার নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায় হাওড়া জেলায় বালি-র একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে নাটুকে তারাকুমারের পরিচয় হয় শ্রীরঙ্গম অধ্যায়ে। তারাকুমারের নাট্যবোধ শিশিরকুমারকে প্রাণিত করে। শিশিরবাবু এই অখ্যাত নাট্যকারকে দিয়ে 'জীবনরঙ্গ' লিখিয়ে নেন। এবং অনেক আশা নিয়ে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 'জীবনরঙ্গ' নাটকটি নিয়ে এপর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয়নি। আমাদের মনে হয়েছে যে, এই নাটকটির মধ্যেই শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিটি লুকিয়ে আছে। তাছাড়া এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নবাগত শচীন মিত্রকে নিয়ে। নবাগতা বন্দনা দেবী এই নাটকে নিভার ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। কিন্তু 'জীবনরঙ্গ' জনবন্দিত হয়নি।

মণি বাগচি সে সময়ে লিখেছিলেন—

"Even though original in conception and powerful in construction and above all, perfect in production, the new drama is destined to be a flop."

শিশিরকুমার এই মন্তব্য পাঠে মণি বাগচিকে বলেছিলেন—"মনের কথাই লিখেছ।"

'জীবনরঙ্গ'কে দর্শক গ্রহণ করতে পারলেন না। 'শ্রীরঙ্গমে'র শ্রী প্রথম থেকেই অনুজ্জ্বল হয়ে গেল।

শিশিরকুমারের ছাত্র নিতাই ভট্টাচার্যর 'উড়ো চিঠি' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪২-এর ১১ মার্চ। 'উড়ো চিঠি' নাটক হিসেবে দুর্বল, নাট্যাচার্যের অভিনয়ের সাহায্য পেয়েও এই দুর্বলতা মোচন করা যায়নি। শ্রীরঙ্গমের দ্বিতীয় প্রয়াসও

ব্যর্থ হলো। আলফ্রেড ন্যমান-এর 'দি পেট্রিয়ট' অবলম্বনে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাটক 'দেশবন্ধু' অভিনীত হয় ১১ সেপ্টেম্বর। অভিনয় প্রসঙ্গে 'শিলালি' পত্রিকা লিখেছিলেন :

"নাট্যাচার্য অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে দেশভক্ত রাজ অমাত্য কল্হনের ভূমিকার রূপায়ণ করেছিলেন। শেষ দৃশ্যে তিনি অভিনয়কে গ্রেট অ্যাকটিং-এর হাইটে তুলেছিলেন।"

অভিনয় যতোই ভালো হোক্ না কেন, 'দেশবন্ধু' শিশিরকুমারকে আর্থিক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করল। ২৩ ডিসেম্বর 'মায়া' নাটক অভিনীত হওয়ার পর শ্রীরঙ্গমে কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হয়নি।

নিতাই ভট্টাচার্যকে দিয়ে শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম উদ্বোধনের অনেক আগেই 'মাইকেল' নাটক লেখাতে শুরু করেন। শিশিরকুমার এই সময়ে গড়পারের বাসা থেকে প্রায়ই হ্যারিসন রোডের একটি মেসে আসতেন সকাল ন'টায়, ফিরতেন বেলা একটা কি দুটোয়। ঐ মেসে থাকতেন শিশির-ছাত্র নিতাই ভট্টাচার্য। একদিন সুলেখক মণি বাগচিকে তিনি ট্রামে বলেছিলেন,— "আমি মাইকেলের যে conception দেব তাই হবে real মাইকেল।"

অনেক দিনের পরিশ্রমে 'মাইকেল' লেখা হয়। অভিনীত হয় ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩। এর কিছুদিন আগে রঙমহলে এইরকমের একটি নাটক অভিনীত হয়। সেখানে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। কথিত আছে রঙমহলে 'মাইকেল' দেখে এসে একজন শিল্পী যখন শিশিরকুমারকে বলেন—"বড়বাবু, দেখলাম ওরা মাইকেলের ব্যবহৃত টেবিল চেয়ার দেখিয়েছে।" এ কথা শুনে শিশিরকুমার বলেছিলেন—"আমি টেবিল চেয়ার দেখাব না, অভিনয় দেখাব।"

শিশিরকুমারের 'মাইকেল' অভিনয় যে কতটা প্রত্যয়ী হয়েছিল তার বিস্তারিত প্রমাণ আছে। একাধিক বিদগ্ধ সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন শিশিরকুমারের সাফল্যের কথা। বিশেষভাবে মনে পড়ছে আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। তিনি লিখেছেন, "মাইকেলের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের এই চিরন্তন অতৃপ্তি, পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখির এই অশান্ত পক্ষ-বিক্ষেপ আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত রূপ পেয়েছিল। মেঘনাদ রচনাকালে কবির অস্থির পাদচারণা, উচ্ছল কল্পনার বহিঃপ্রকাশে শব্দভাণ্ডার ও ভাষা প্রয়োগের অপ্রাচুর্যজনিত বাধার ক্ষুব্ধ অনুভূতি শিশিরের অন্তরবেদনার, কৃপণ প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর রাজোচিত চিত্ত-প্রশস্তির দৃপ্ত প্রতিবাদেরই অনিবার্য সংকেত।"...[৩৫]

শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্য প্রাণপাত পরিশ্রমে 'মাইকেল' অভিনয় করেও

আগের মতো অর্থ পেলেন না। তাই ২৫ নভেম্বর আবার শরৎচন্দ্রের স্মরণ করতে হলো। 'বিপ্রদাস' (বিধায়ক ভট্টাচার্যের) নাট্যরূপ পেয়ে মঞ্চস্থ হয় ২৪ নভেম্বর ১৯৪৩। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন,

"শুভক্ষণে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' খোলা হইল ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে। বিশ্বনাথবাবু বিপ্রদাসের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেন আর ফিল্মের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মলিনা বন্দনার ভূমিকায়ও চমৎকার অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকাও বেশ হয়। বিপ্রদাস প্রচুর অর্থদান করে।"

[ভারতীয় নাট্যমঞ্চ। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত]

এই বছরের বড়দিনের নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো'। 'বিপ্রদাস' নাট্যানুষ্ঠানে শিশিরকুমার প্রথমে নামেননি, পরে নেমেছিলেন (বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুর পরে)। কিন্তু 'তাইতো' নাটকে শিশিরকুমারকে অভিনয় করেতে দেখি না। বিধায়ক ভট্টাচার্যের আলোচ্য নাটকটি যথার্থ অর্থে বড়দিনের নাটক। 'বিধবা বিবাহ না করিলে মামার সম্পত্তি পাইব না"— খবরের কাগজের এইরকম একটা বিজ্ঞাপন থেকে নাটকের উৎপত্তি। নানা রকমের উদ্ভট দৃশ্যের মধ্য দিয়ে 'তাইতো'র সমাপ্তি হয় জোড়ায় জোড়ায় গাঁটছড়া বেঁধে। তবে স্বীকার করতে হবে—'তাইতো' নাটকের একটা গতি আছে, নতুনত্ব আছে, আধুনিক সংলাপও আছে। বিধায়ক ভট্টাচার্য এই কারণে আধুনিক নাট্যকার।

'তাইতো' অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

বিরূপাক্ষ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, জীবনময়—শৈলেন চৌধুরী, দীননাথ—রঞ্জিত রায়, সমর—জীবেন বসু, সমীর—মিহির ভট্টাচার্য, মল্লিকা—শ্রীমতী মলিনা দেবী। বল্লিকা—রেবা বসু।

১৯৪৪ সালের প্রথমদিকের ন'মাসে কোনো নতুন নাটক নেই শিশিরকুমারের প্রযোজনায়। তবে উল্লেখযোগ্য যে এই বছরের ১০ জুলাই ও ২৪ অক্টোবর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হয়। শিশিরকুমার এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। 'নবান্ন' নাটকের প্রধান সমাদ্দারের দিকে তাকিয়ে বিচলিত শিশিরকুমার অনুজকে বলেছিলেন—

'জানিস বিশে সেই যে আমাদের ধোপা। মনে পড়ছে না তোর…"

বিজন ভট্টাচার্য বলেছেন:

"তাঁর ক্ষণিকের সেই বিভ্রান্তির মধ্যে আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলাম রামচন্দ্র যেন গুহক চণ্ডালরূপী এক রজকের ভূমিকায় পরোক্ষভাবে ধন্য হতে চাইছেন।"

১৯৪৪ সালে সংশয়াতীত ভাবে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে একটা পালাবদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'বন্দনার বিয়ে' (২৬.১০.১৯৫৪) কোনো দাগ কাটতে পারল না। ২০ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো শরৎচন্দ্রের সুপরিচিত 'রামের সুমতি'। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাদেবী ও সাবিত্রী। কয়েক রাত্রি চলার পরে শিশিরকুমার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জায়গায় 'যাদব' চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৪৪-এর পর পালাবদলকে লক্ষ্য করে আমরা নিশ্চয়ই এ সিদ্ধান্ত করছি না যে, ১৯৪৪-এর পর শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমে উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় নেই। ১৯১৪-এর পর শ্রীরঙ্গমের উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা—'দুঃখীর ইমান' (১১৪৬, ডিসেম্বর) 'পরিচয়' (১০ ৮ ১৯৪৯), 'তখৎ-এ-তাউস' ১০.৫ ১৯৫১), 'প্রশ্ন' (৩.১ ১৯৫৩)। সর্বমোট এই চারটি নাটকের নাট্যকারেরা হলেন যথাক্রমে—তুলসী লাহিড়ী, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংকুর আতর্থী ও তারাকুমার মুখোপাধ্যায়। অন্তত, এই চারটি নাটকের তিনটিতে অভিনয় করে এবং সূক্ষ্ম নির্দেশনা দিয়ে শিশিরকুমার আরো কিছুকাল প্রাণশক্তি সঞ্চয় করতে পারতেন—লোকলক্ষ্মীর আগমনে সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হতেন যদি। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারীতে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের পর শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল—"এই কয়দিন অভিনয়ের পর, কিছুকালের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকিবে।" আত্মাভিমানী শিশিরকুমার সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য 'শেষ অভিনয়' কথাটি লেখেননি। নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনায় আমরা বারবার শিশির-প্রশস্তি করেছি। এর কারণ শিশিরকুমার তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োগাচার্য এবং পরবর্তী যুগেরও অগ্রপথিক। ১৯২১ থেকে ১৯৪৪ এর মধ্যে শিশিরকুমারের মতো আর একজন প্রয়োগবিদ্ জন্মগ্রহণ করেননি। অপরেশচন্দ্র বা অহীন্দ্র চৌধুরীরা যুগের দাবি মিটিয়েছেন, শিশিরকুমার যুগের দাবিকে প্রাধান্য দিয়েও যুগোত্তীর্ণ প্রতিভা বলে স্বীকৃত হয়েছেন। শিশির-সান্নিধ্য পেয়েই নাট্যশালা নাট্যমন্দিরে বিবর্তিত হয়।

তথাপি আমাদের উল্লেখ করা দরকার যে শিশিরবাবুর প্রতি 'অতি-আধুনিক' সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা যাবে না। কারণ অভিনেতা ও প্রযোজক হিসেবে শিশিরকুমার ছিলেন রোমান্টিক শিল্পী। তিনি যে যুগের মধ্যে লালিত হয়েছেন, বিবর্ধিত হয়েছেন সে যুগটিতে সকলেই অল্পবিস্তর

রোমাণ্টিক। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছে তার মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যকই রোমাণ্টিকতা বর্জিত। আবার যে নাটকগুলি শিশিরকুমারের যশ এনে দিয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু ষোল আনা রোমাণ্টিক। তবে শিশিরকুমারের যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার স্বরূপটি কি এবং কোথায় ?

রোমাণ্টিক শিল্পী-মনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শিশিরকুমার ধরাবাঁধা একই রীতিতে অভিনয় করতেন না। নানা রীতি ও রূপের মিলন হয়েছিল তাঁর মধ্যে। শ্রদ্ধেয় নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> "শিশিরকুমার প্রধানতঃ ইম্প্রেসনিষ্ট ছিলেন। চরিত্র ও গোটা নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটাকে ভাবময় অভিনয়ের দ্বারা দর্শকচিত্তে গভীরভাবে অংকিত করে দিতে চাইতেন তিনি। ভঙ্গীর চাইতে ভাবের দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর বেশি। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে তিনি এক্সপ্রেসনিস্টও হতেন। বক্তব্যটিকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য সেসব ক্ষেত্রে তিনি ভঙ্গীটিকে প্রাধান্য দিতেন। আবার কোথাও কোথাও তিনি প্রতীকধর্মীও হয়ে উঠতেন।"

বাংলাদেশে যাঁরা নাট্যচর্চা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই দু'টি ব্যক্তির কথা কোনো দিনই বিস্মৃত হবেন না। একজন প্রবোধচন্দ্র গুহ, অপর জন শিশিরকুমার। মূলতঃ, এঁরা দুজনে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একাধিক নবীন নটকে উৎসাহিত করেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রশ্রয়ে মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতিরা নাট্যচর্চা করেছেন। অন্যদিকে শিশিরকুমার প্রবীণ ও নবীন নাট্যকারদের সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছেন। এসেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ নতুন হয়ে, এসেছেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, প্রেমাংকুর আতর্থী, নিতাই ভট্টাচার্য, তারাকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানালেন শিশিরকুমারের সৌজন্যে। আবার শরৎচন্দ্র নাট্যকার হিসেবে কলম ধরলেন প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষার প্রেমে পড়ে। বিশ শতকের নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে শিশিরকুমারের দানটি তাই সর্বজনস্বীকৃত।

নিঃসন্দেহে শিশিরকুমারের কয়েকটি ত্রুটি ছিল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "তাঁর রঙ্গমঞ্চ সংস্কার ও প্রযোজনাকলা অভাবনীয় উন্নতিলাভ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক যুগোপযোগী নাটক লেখার প্রেরণা তিনি দিতে পারেন নাই। তাঁর প্রযোজিত যে সমস্ত নাটক পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নয়, আধুনিক সমাজবিষয়ক ও তাঁর তত্ত্বাবধানে লেখা, সেগুলিও নাট্যসাহিত্যের দিক থেকে খুব উন্নত পর্যায়ের নয়। তাঁর

অভিনয়কলার যে অত্যুন্নত মান তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কোন নাটকই লেখা হয়নি।"[৩৬]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা একমত। এই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শিশিরকুমার অনেক ভালো নাটক হারিয়েছেন, আবার ভালো নাট্যকারদের কাছ থেকে জোর করে সৎ নাটক আদায় করতে ভুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর যাতায়াত থাকলেও রবীন্দ্রনাথকে জোর করে থিয়েটারে আনেননি শিশিরকুমার, আবার শরৎচন্দ্রকে তিনি চটিয়েছেন। আবেগপ্রবণ শিশিরকুমার এমন কয়েকজন নাট্যকারকে প্রশ্রয় দিলেন যাঁরা কালের বিচারে চিরদিনই অতি দীন। সমকালে এবং একালে তাঁদের কোনো প্রভাবই রইলো না। এই প্রতিপাদ্য রচনার কালে বারবার শিশির অনুরাগীদের প্রশ্ন করেছি—কেন তিনি জলধর চট্টোপাধ্যায়, তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরীর নাটক সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করলেন? কেন তিনি বললেন যে, আমি সব নাটকের ভক্ত? উত্তর মেলেনি। উত্তর মেলেনি বলেই শিশিরকুমার সম্পর্কে আমাদের একটু সংশয় থেকে গেছে।

শিশিরকুমার তাঁর জীবনের প্রথম অভিনীত নাটক থেকেই মঞ্চের এক এবং অদ্বিতীয় অভিনেতা। এটি শিশির-অনুরাগী হিসেবে আমাদের গর্ব। আবার এইখানেই আমাদের শিশিরকুমারের প্রতি ক্ষোভ। নাট্যনিকেতনের শিল্পী তালিকায় অন্তত দুজন ছিলেন যাঁরা নানা দিক থেকে শিশিরকুমারের সমতুল। একজন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অপরজন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কিন্তু নাট্যমন্দির, নব-নাট্যমন্দির বা শ্রীরঙ্গমে এঁরা কেউই 'শ্রেষ্ঠাংশে' বিজ্ঞাপিত হলেন না। এঁদের নির্দেশনায় কোনো নাটকই মঞ্চস্থ হলো না। শিশিরকুমার যখন ক্ষয়িত হয়ে গেলেন—সেই সময়ে শ্রীরঙ্গমে (দু'একজন ছাড়া) নতুন মুখ দেখা গেল না। শ্রীরঙ্গমের 'দুঃখীর ইমান' প্রযোজনাকে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

শেষজীবনে শিশিরকুমার বারবার আক্ষেপ করেছেন জাতীয় নাট্যশালা তৈরী হলো না বলে। আমরা শিশিরকুমারের এই দাবিটিকে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত মনে করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়—ইচ্ছে করলে শিশিরকুমার নিজেই পারতেন একটি জাতীয় রঙ্গালয় গড়ে দিতে। নাট্যনিকেতনে দর্শনীর হার সেকালের পক্ষে বেশ চড়া ছিল। প্রচুর পয়সাও রোজগার করেছিলেন শিশিরকুমার। কিন্তু এই অর্থ দিতে পারল না একটি নাট্যশালা বা অভিনয়ের বিদ্যালয়। বাংলা দেশে শিশিরকুমারের অভিনয় অনেকেই দেখেছেন। বর্তমানে এঁরা অনেকেই জীবিত। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক

ব্যক্তিই বলতে পারেন শিশিরকুমারের মহলা দেওয়ার কায়দাকানুন। কারণ শিশিরকুমার ব্যক্তি নামে যতটা প্রসিদ্ধ অভিনেতা হিসেবে ততটা অনুসৃত নন। কথাটিকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়—একদা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শিশিরকুমার বরাবরই সাধারণের থেকে একটা দূরত্ব রেখে চলতেন। এই দূরত্ব নির্মিতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি উপকৃত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে শিশির-বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি।

শিশির-সমসাময়িক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের মতো মর্যাদা আর কেউই পাননি। শিক্ষাদীক্ষায়, আভিজাত্যে, চলাফেরায় ও বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান পুরুষ আর কে-ই বা ছিলেন সে সময়ে? কিন্তু 'আলমগীরের' জীবনের নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডিটি বোধহয় শিশিরজীবনেও নেমে এসেছিল। অস্থিরচিত্ত শিশিরকুমার, বিশেষভাবে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর, এক উচ্ছৃংখল জীবনযাপন শুরু করেছিলেন। শিশিরকুমারের এই উচ্ছৃংখলতা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যে দেখা যেতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সারা বাংলাদেশে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়। নাট্যনিকেতনের শেষ পর্যায়ে এবং শ্রীরঙ্গমে দর্শকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার এটি অন্যতম কারণ ছিল। আমরা স্বচক্ষে 'আলমগীর'কে প্রকাশ্য রাজপথে ধূলিশয্যা নিতে দেখেছি। আমাদের বক্তব্যকে তথ্যনিষ্ঠ করার জন্য 'নাচঘর' পত্রিকার (৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯, পৃঃ ৩-৪) একটি মন্তব্য চয়ন করেছি। মন্তব্যটি এই—

> "যে যুগে শিশিরকুমারকে একদিন পথ দিয়ে যেতে দেখলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান মনে ক'রত, যে যুগে শিশিরকুমার হয়ে উঠেছিলেন আমাদের Demi-God আজ আর সেদিন নেই। নিজের হাতে শিশিরকুমার নিজেকেই বহুনিম্নে এনে ফেলেছেন। মনে হয় যেন তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতে চাইছেন ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কতদূর।"

নাট্যমন্দিরের গুণমুগ্ধ 'নাচঘর' পত্রিকার এই সমালোচনা পতনশীল শিশিরকুমারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিশিরকুমারকে মঞ্চহারা করেছেন শিশিরকুমার নিজে[৩৭] —একথা বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। এর পরে বলব, শিশিরকুমারকে পতনের পথে এগিয়ে দিয়েছে যুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজ, বাঙালী দর্শক। নাট্যাচার্যের শত ত্রুটি সত্ত্বেও বাঙালীর থিয়েটার বিমুখতা শ্রীরঙ্গমের শ্রী ভ্রষ্ট করে বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে।

শিশিরকুমারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক ছিল বলেই তাঁর কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করলাম। এ থেকে যেন মনে করে নেওয়া না হয় যে শিশিরকুমারের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা আছে। আমরা শিশিরকুমারকে আজও পৃথিবীর একজন বড়ো প্রয়োগপ্রধান বলে মনে করি। আমাদের

এই মনে করার পেছনে কোনো বিদেশী সমালোচকের শিশির-প্রশস্তি ক্রিয়াশীল নয়। শিশিরকুমারেই নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে (তা সংখ্যায় যতো স্বল্প হোক না কেন) তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে আমদের জানিয়েছেন,

"একটা মস্ত ধারণা সকলে পোষণ করেন যে, নট নাট্যকারের পুত্তলিকা মাত্র ; তিনি যে ভাবে নাচান—সেই ভাবে নাচতে হয়। কিন্তু আর্ট (Art) বলিয়া যদি কোনো পদার্থ থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক আর্টিস্ট স্বতন্ত্র অর্থাৎ self-contained, —অর্থাৎ, অভিনয় কলাবিকাশ নাট্যকারের অপেক্ষা রাখে না এবং সেইজন্যই যাহাকে ইংরেজীতে good play বলে, তাহা সব সময় নাট্য সাহিত্যে good drama হইয়া দাঁড়ায় না। তবে, নটের কৃতিত্ব কোথায় ? চতুঃষষ্টি কলার অন্তরে আছে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা।··· ······নটের বৃত্তি হীনবৃত্তি নহে ; সর্বদেশে সর্বকালে—গ্রীস, প্রাচীন ভারত, সেক্সপীয়রের ইংলন্ড, গ্যায়টে শিলারের জার্মানি,—যে দেশে যখন কর্মপ্রেরণা জাগিয়াছে—তখন তাহাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের নাট্যসাহিত্যে এবং সজীব হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের রঙ্গমঞ্চে নটের অভিনয়ে।

······লোকমুখে শুনি আমি ভাল অভিনেতা। অনেকে বলেন, আমার অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, এবং সময় সময় প্রশ্ন করেন, "আপনি কি সত্য সত্যই সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন ?" আমি তাঁহাদের বলি, সত্য সত্যই ভাবে অভিভুত হইলে - চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। যে মুহূর্তে 'লবের' মুখ দেখিয়া আমি 'সীতার' কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই মুহূর্তেই 'লবকে' আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ঐ পাঁচশো ওয়াট-ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের (watt-candle power) সবটুকু আলোর সুযোগসুবিধা গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা সম্ভব হয় ? 'সু-অভিনয়' মানে "দৃশ্যপট স্বকীয় পরিচ্ছদ পারিপার্শ্বিক আলোক-সম্পাত,- সর্ব বিষয়ে সজাগ থাকা।··· প্রত্যেক সুঅভিনেতা প্রত্যেক আর্টিস্ট (artist) শিল্পী—নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন করেন। একজন—যিনি সৃষ্টি করেন, আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন 'বিচারক', —একজন 'কর্মী'।"[৩৮]

অধ্যাপক শিশিরকুমার বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে যোগদান করার পর বাংলাদেশে থিয়েটার সম্পর্কে যে দীর্ঘকাল পোষিত একটা হীন ধারণা ছিল—তা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়। শিশিরকুমার নাট্যমন্দির স্থাপন করে প্রমাণ করেন নটের বৃত্তি হীনবৃত্তি নয়। পেশাদারী মঞ্চ সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টি পরিবর্তন

তো ঘটলোই, এলেন শিক্ষিত, শ্রেষ্ঠ মানুষেরা শিশিরকুমারের সাহায্যার্থে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শেষ জীবনে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেন।

শিশির সান্নিধ্যে এসে আমরা সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিলাম যে 'এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলা'কেই অভিনয় বলে না। অভিনয় কর্মটি বহু সাধনলভ্য একটি কলাবিশেষ। এবং এই অভিনয় কলাচর্চা করতে গেলে শিল্পীকে বসতে হবে স্রষ্টার আসনে। শূন্যগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে শিশিরকুমার শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেননি—আজীবন সাধনার শেষে শেষ কথাটি বলেছেন।

শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগের পরেও যে শিশিরকুমার সারা পৃথিবীর নাট্যসংসার সম্বন্ধে খবর রাখতেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিলেতে থাকাকালীন শ্রীযুক্ত অশোক সেন, শিশিরকুমারের একটি পত্র পান। উক্ত পত্রে শিশির-কুমার লিখেছিলেন, (১.৯.১৯৫৬)।

"Bertolt Brecht সম্প্রতি অল্প বয়সে মারা গেছেন। তার বই এখানে পাওয়া যায়না। যদি দু' একখানা আনতে পারো, সংগে এনো। Three Penny Opera'র খুব নাম। Claudel-এর ইংরাজী অনুবাদ আমি পাইনি। Tolstoy-এর চারখানি বড় নাটক—তার মধ্যে একখানির শেষ অংকের dialogue নেই, শুধু synopsis আছে—অমূল্য। আর একটা কথা—Foyles-এর দোকানে (119-125 Chairing Cross) একবার খোঁজ নিতে পার যদি, খোঁজ নিও Gordon Craig-এর The Art of the Theatre ও Books & Theatre out of print হয়েছে কি? পুরাতন কপি ওদের দোকানে পাওয়া গেলে দাম কত পড়বে?"

শ্রীযুক্ত অশোক সেনকে লেখা উপরোক্ত পত্রাংশ থেকে জ্ঞানতাপস শিশির-কুমারকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি। উদাসীন যোগী সন্ন্যাসীর মতো শেষ বয়সেও শিশিরকুমার বিশ্ব নাটকের কথা ভেবেছেন, পড়েছেন। জীবনের শেষ ক'টা বছরও তিনি বোধহয় মনে মনে একটি জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখতেন। হয়তো ভাবতেন সেইখানেই তিনি শিল্পীজীবনের শেষ কিরণচ্ছটা ছড়িয়ে দেবেন। কিন্তু শিশিরকুমারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি আজও।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

১৯২১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের সাধারণ পরিচয়টি প্রথম পর্বে দেওয়া গেল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের এই সাধারণ পরিচয় থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যযুগ থেকে এই সময়ের রঙ্গমঞ্চের কিছু মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই আছে। অর্থাৎ এই কালবৃত্তে নাটক, নাট্যকার, সংলাপ, গান, মঞ্চ, দৃশ্য, আলোক, অঙ্গরচনা ও সংজীব, অভিনয়, দর্শক প্রভৃতির পালাবদল ঘটেছে। আর এই পালাবদলের সাক্ষী হয়ে আছে শহর কলকাতার কিছু প্রাচীন ও নবীন নাট্যশালা।

আশার কথা, ১৯২১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে কলকাতার বুকে কয়েক নাট্যামোদী মঞ্চমালিক অজস্র অর্থব্যয়ে কয়েকটি নতুন নাট্যশালা গড়েছেন। এবং সেই নাট্যশালাগুলির অন্তত দু'টি আজও সজীব ও সচল। শুধু রঙ্গমঞ্চ কেন, এসেছেন কয়েকজন গুণী নাট্যকার, কিছু সার্থক প্রয়োগাচার্য, স্বল্পসংখ্যক মঞ্চকুশলী ব্যক্তি, রাজনৈতিক গগন থেকে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, সাহিত্যের প্রাঙ্গন থেকে রঙ্গমঞ্চকে সাহায্য করলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক শাস্ত্রী, আর এই সঙ্গে অসংখ্য কৃতবিদ্য দর্শকের কথাও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়।

সক্রিয়ভাবে সাহায্য না করলেও এই অধ্যায়ের বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ সমসাময়িক স্বাদেশিকতার সুরটি জনমনে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। বাংলা দেশের বিবিধ সামাজিক সমস্যার মরমী আলেখ্য গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে বিবিধ নাট্যশালা। আবার বাঙালীর বিশিষ্ট ধর্মীয় চিন্তাকেও নানাভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিবিধ অসুবিধার মধ্য দিয়েও (সরকারী অনুশাসন, রাজনৈতিক ডামাডোল অর্থনৈতিক সংকট, নাট্যকার সংকট, দর্শকের বিদ্রূপ) কিন্তু বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ এই অধ্যায়ে অনায়াসে গিরিশযুগকে অতিক্রম করেছে।

অবশ্য ১৯২১ এর প্রথম দিনটি থেকেই এই পালাবদল ঘটেনি। কারণ ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত কয়েকটি মঞ্চে আমরা সেই পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে বিকিকিনি করতে দেখেছি। অপরেশচন্দ্র, অমৃতলাল বা দানীবাবুরা অস্তমিত হবার মুহূর্তে যখন পশ্চিম দিগন্তে শেষ রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়ে গেলেন ঠিক তখন থেকেই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে আরেকটি পালাবদল ঘটল। মঞ্চের ইতিবৃত্ত

রচনাকালে আমরা পালাবদলের স্বরূপটি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি, এবারে তাকে নির্দিষ্ট করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

॥ নাটক ॥

গিরিশযুগের মতো নানা জাতের অসংখ্য নাটক লেখা না হলেও বর্তমান কালসীমায় মঞ্চের প্রয়োজনে নতুন নতুন নাটকের উদয় হয়েছে। এইসব নাটকের খুব কম সংখ্যকই আজ পর্যন্ত অনুসৃত বা আলোচিত। তথাপি নানা কারণে স্মরণীয় নাটকের দৃষ্টান্ত এগুলি। আমরা সবক'টি (অভিনীত) নাটকের তালিকা না দিয়ে মঞ্চে আদৃত নাটকগুলির একটি তালিকা প্রদান করছি।

মিনার্ভার নতুন নাটক—

'আত্মদর্শন,, 'মিশরকুমারী', 'দেশের ডাক', 'বেহুলা', 'অভিজাত', 'কলির সমুদ্র মন্থন', 'চন্দ্রনাথ', 'বাসুকী', 'পুরোহিত', 'দেবযানী', 'কাঁটা ও কমল' প্রভৃতি।

আর্ট-এর নাটক—

'কর্ণার্জুন', 'চিরকুমার সভা', 'ফুল্লরা', 'মন্ত্রশক্তি', 'পরিত্রাণ', 'ঋষির মেয়ে', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গৃহপ্রবেশ'।

মিত্র থিয়েটার-এর নাটক—

'শ্রীদুর্গা', 'ডারবি টিকিট'।

আর্ট (মনোমোহন মঞ্চের) নাটক—

'শ্রীরামচন্দ্র', 'চাঁদ সদাগর', 'আরবীহুর'।

মনোমোহন থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো—

'পথের শেষে', প্রাণের দাবী', 'সমুদ্রগুপ্ত', 'রক্তকমল', 'গৈরিক পতাকা', 'মহুয়া', 'জাহাঙ্গীর', 'কারাগার'।

নাট্যনিকেতন-এর প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো—

'ধ্রুবতারা', 'সাবিত্রী', 'সতীতীর্থ', 'দিদি', 'জননী', 'মা', 'মহাপ্রস্থান', 'পূর্ণিমা মিলন', 'খনা', 'নরদেবতা', 'কেদার রায়', 'গোরা', 'সতী', 'মীরকাশিম', 'মহামায়ার চর', 'অগ্নিশিখা', 'কালিন্দী'।

রঙমহল-এর প্রযোজনা—

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া', 'সিন্ধুগৌরব', 'রঙের খেলা', 'পতিব্রতা', 'মহানিশা', 'অশোক', 'কাজরী', 'বাংলার মেয়ে', 'চরিত্রহীন', 'নন্দরানীর সংসার', 'প্রলয়', 'স্বামী স্ত্রী', 'ডিটেকটিভ', 'বন্দিনী', 'তটিনীর বিচার', 'সানিভিলা', 'বিংশ শতাব্দী', 'ভোলা মাস্টার', 'সন্তান'।

নাট্যভারতীর নাটক—

'সংগ্রাম ও শান্তি', 'নার্সিং হোম', 'সিঁথির সিঁদুর', 'রিহাসাল', 'প্লাবন', 'পি ডবলিউ ডি', 'পথের ডাক', 'ধাত্রীপান্না'।

রঙ্গমহাল-এর নাটক—

'আত্মাহুতি', 'আবুল হাসান'।

শিশিরকুমারের প্রযোজিত নতুন নাটকগুলি হলো—

'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'সীতা', 'পাষাণী', 'পুণ্ডরীক', 'বিসর্জন', 'নরনারায়ণ', 'ষোড়শী', 'শেষরক্ষা', 'দিগ্বিজয়ী', 'শংখধ্বনি', 'তপতী', 'ফুলের আয়না', 'বিরাজ বৌ', 'বিজয়া', যোগাযোগ', 'রীতিমত নাটক', 'গৃহদাহ', 'জীবনরঙ্গ', 'পরিচয়', 'উড়োচিঠি', 'দেশবন্ধু', 'মাইকেল', 'তাইতো', 'রামের স্মুমতি', ও' 'দুঃখীর ইমান'।

১৯২১ থেকে ১৯৪৪ এর অভিনীত নাটকগুলির এই তালিকা দৃষ্টে নিশ্চয়ই স্বীকার করে নিতে হবে যে, পরিমাণগত দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর নিরিখেই এই নাটকগুলি আধুনিক যুগোপযোগী। সাধারণভাবে তিন ধরণের নাটক লেখা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক। অনুবাদ নাটকের সংখ্যা কমে গেছে, গীতাভিনয় নেই বললেই চলে এবং কমেডি রচিত হলেও প্রহসন রচনায় ভাঁটা পড়েছে। তবে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যাপারটি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়েছে এই অধ্যায়ে এবং প্রতিথযশা লেখকরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নিয়েছেন।

পৌরাণিক নাটক দিয়েই এযুগের বিখ্যাত প্রয়োগাচার্যরা রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধন করেছেন। বলা বাহুল্য, এই সব পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আমরা আধুনিক মন ও মননের চর্চা দেখতে পেয়েছি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকে যেসব নতুন নতুন জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল—তা এই অধ্যায়ে নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষদের সহায়ে প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, বর্তমান কালসীমায় পৌরাণিক নাটক বিদায়বেলায় শেষবারের মতো নিজেকে নবতর জিজ্ঞাসার সামিল করে তুলেছে। অবশ্য অপরেশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আমরা গিরিশচন্দ্রের অদৃশ্য তর্জনী লক্ষ্য করেছি।

এই অধ্যায়ে সবাচইতে বেশি রচিত হয়েছে সামাজিক নাটক। একাধিক নাট্যকার নানাবিধ উপায়ে সমসাময়িক সমাজকে তাঁদের নাটকের উপজীব্য করেছেন। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লড়াই দেখানোর ইচ্ছে এ সময়ের নাট্যকারদের ততটা প্রভাবিত করেনি, যতটা প্রভাবিত করেছে সামাজিক চরিত্রের পালাবদলের দিকটি। এতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিশ শতকের পার্থক্যটি বেশ চোখে পড়ে। মনে রাখার মতো কয়েকটি সামাজিক নাটক হলো—'মন্ত্রশক্তি', 'ভোলা-

মাস্টার', 'ষোড়শী', 'প্লাবন', 'বিজয়া', 'দুই পুরুষ', 'রীতিমত নাটক', 'পরিচয়' প্রভৃতি। 'দুঃখীর ইমান'কে আমরা ঠিক এই তালিকায় আনতে চাইছি না। কারণ 'দুঃখীর ইমানে'র সুর আরেকটি পালাবদলের সুর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বিশ শতকের তিনটি দশক জুড়ে নানা রসের সামাজিক নাটকাভিনয় দেখে দর্শকের তৃপ্তি হয়নি। আজও সাধারণ দর্শক সামাজিক নাটকের অভিনয় দেখতে চান। দর্শকের এই দুর্বলতার কথা জানেন বলেই তথাকথিত পেশাদারী রঙ্গশালাগুলি আজও একই রীতিতে (কিছুটা আধুনিক মঞ্চমায়ার সাহায্যে) সামাজিক নাটক নামধেয় একধরণের গল্পের অভিনয় দেখিয়ে চলেছেন।

ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা আজও আছে। কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিক নাটক লেখার ঝোঁকটি নেই। এর জন্য কতকগুলি বাস্তব কারণ নিশ্চয়ই আছে। প্রথম কথা, আজকের রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাট্যানুষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে সামাজিক নাটক। দ্বিতীয়ত, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে জাতিকে জাগাবার প্রয়োজন অনেকটা কমে এসেছে। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক নাট্যানুষ্ঠান করতে গেলে যে ঐতিহাসিক আয়োজনের (অর্থাৎ সংজীব, দৃশ্য, অঙ্গরচনা, আলোক ও অর্থ) প্রয়োজন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহন করা দুঃসাধ্য। সর্বোপরি নাট্যকারদের পরিশ্রম ও সততার দিকটিও বিবেচ্য।

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের বিজয় বৈজয়ন্তী শেষবারের মতো দেখা গেছে ১৯২১ থেকে ১৯৪৪-এ। পুরোনো ঐতিহাসিক নাটকাভিনয় তো হয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে কালোপযোগী নাটক উপহার দিয়েছেন—যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। স্বল্প শক্তিধর নাট্যকার হিসেবে রমেশচন্দ্র গোস্বামী ('কেদার রায়'), মহেন্দ্র গুপ্ত ('টিপু সুলতান') ও সুধীন্দ্র রাহার ('সমুদ্রগুপ্ত') নাম করা যেতে পারে। শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' এই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা পেতে পারে। মৌলিক নাটক হিসেবে এই দু'টি অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী। অবশ্য এই দুইজন নাট্যকারের ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের অবিসংবাদী প্রভাব বর্তমান। আসলে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের নির্দিষ্ট মানটি দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও কোনো নাট্যকারই এইদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালকে অতিক্রম করতে পারেননি।

নাটকের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয় এই সময়েই। শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখেরা অপেক্ষাকৃত ছোট নাটক রচনায় ব্রতী হন। মন্মথ রায় একাংক নাটক লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দর্শকের চাপে এই সব পরীক্ষা-সমীক্ষা কোনো 'মুক্তির ডাক' দিতে পারেনি। ফলে বাধ্য হয়ে নাট্যকারেরা দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে পঞ্চাংক নাটক লিখেছেন। এইসব পঞ্চাংক নাটকের শক্তি

আজকের বিচারে খুব দৃঢ় নয় বটে, তবে গিরিশযুগের তুলনায় অনেক সংহত সন্দেহ নেই। এবং স্মরণীয়, স্বয়ং অপরেশচন্দ্র পর্যন্ত তিন অংকের কিছু নাটক লিখেছেন। 'যেন তেন প্রকারেণ' নাটক রচিত হয়েছে গিরিশযুগে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও খুব কম সময়ে ডান হাতে নাটক লিখেছেন। এসেছে রাশি রাশি গীতাভিনয়, সস্তা কৌতুকসর্বস্ব প্রহসন এবং প্যান্টোমাইম। কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বা শিশিরকুমারের কালে নাট্যকারদের নিষ্ঠা লক্ষণীয়। আধুনিক সমস্যার উদ্ঘাটনে সুরুচির পরিচয় দিয়ে, নাট্য-সংগীতের ব্যবহার করে, সংলাপের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এঁরা আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাই অতি আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশে বিশ শতকের প্রথমার্ধের নাট্যকারদের দানকে কোনোদিক থেকেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

।। নাট্যকার ।।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক এই অধ্যায়ে সবচাইতে বেশিমাত্রায় অভিনীত হয়েছে। কাজেই দ্বিজেন্দ্রলালকে এ যুগের নাট্যকার আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। তাছাড়া রয়েছেন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, অয়স্কান্ত বক্সী, রমেশচন্দ্র গোস্বামী, মহেন্দ্র গুপ্ত, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, মহাতাপচন্দ্র ঘোষ, মনোজ বসু ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া নাট্যরূপ নির্মাতা হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি আধুনিক যুগের নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর নাটক এসময়ে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান তালিকার বাইরে থাকল তাঁর নাম। পরবর্তীতে আমরা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য রাখব।

উপরোক্ত নাট্যকার তালিকায় যথাসম্ভব (একাধিক বা একটি নাটক যাঁরা লিখেছেন) সকলের নাম উল্লেখ করা গেল। এঁরা সকলেই কালের বিচারে স্বীকৃত নাট্যকার নন। আবার নাট্যকার তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী মঞ্চের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে আসতে চাননি। আর নাট্যনিকেতন বা আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'সিরিয়াস' নাটকগুলির অভিনয়ও করেননি। কাজেই এই পর্যায়ের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি মাত্র উল্লেখ করব।

আমাদের সৌভাগ্য, আলোচ্য অধ্যায়ের একাধিক নাট্যকারের লেখা মঞ্চসফল নাটকগুলি আজও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে (কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহে) পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো বিস্মৃত নাটকের অভিনয়ও আমরা দেখেছি। এইসব নাটক পড়ে ও দেখে আমাদের এই পর্যায়ের নাট্যকার সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে তা অতি সংক্ষেপে বলে নিতে চেষ্টা করছি। প্রথমেই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা বলা যাক।

● অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার অপরেশচন্দ্র একটি হারিয়ে যাওয়া নাম। সঙ্গতকারণেই অপরেশচন্দ্র হারিয়ে গেছেন। তাঁর এমন একখানিও নাটক নেই, যা আজকের মঞ্চে উপস্থিত করা যেতে পারে। 'কর্ণার্জুন'কে মনে রেখেও একথা বলছি।

তথাপি নাট্যকার অপরেশচন্দ্রকে আমরা ভুলে যেতে পারি না। কারণ ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত অপরেশচন্দ্রই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রধান নাট্যকার। গিরিশচন্দ্রের মতো তিনি মুখে মুখে নাটক বলে যেতেন। কখনো জানকীনাথ বসু আবার কখনো হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গণেশে'র কাজ করেছেন। 'প্লে-রাইট' অপরেশচন্দ্র জানতেন কিভাবে নাটক লিখলে দর্শক গ্রহণ করতে পারবে। এদিক থেকেও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। আসলে গিরিশচন্দ্রই অপরেশচন্দ্রের গুরু। নাট্যবস্তু উপস্থাপনে, মহলা পরিচালনায়, ম্যানেজার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী অপরেশচন্দ্র। মৌলিক নাটক এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ মিলিয়ে (এবং দু'টি একটি অনুবাদ বা অনুসরণ নাটক সহ) অপরেশচন্দ্র ত্রিশটির মতো নাটক লিখেছেন। তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলি হলো— 'কর্ণার্জুন', 'অযোধ্যার বেগম', শ্রীরামচন্দ্র', 'সুদামা', 'ফুল্লরা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মা'।

'ভদ্রা' নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন অপরেশচন্দ্র। সকলেই স্বীকার করেছেন এবং আমরাও স্বীকার করেছি যে, 'কর্ণার্জুন'ই অপরেশচন্দ্রর সবচাইতে বিশিষ্ট নাটক। বাংলা পৌরাণিক নাটকের আধুনিক পর্যায়ে অপরেশচন্দ্রর এই নাটকটির দান অবিস্মরণীয়। 'কর্ণার্জুন' নাটকের সাফল্যে প্রাণিত হয়েই প্রবীণ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ 'নরনারায়ণ' নাটকটি লেখেন।

অপরেশচন্দ্রের নাটক সম্পর্কে আমাদের উচ্চ ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর নাটকগুলি একটু তলিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, বিশ শতকের প্রথম তিনটি দশকের সাধারণ বাঙালী জীবনের প্রাত্যহিক সংবাদটুকু রয়েছে। এইদিক থেকে অপরেশচন্দ্রের কাছে আমাদের ঋণ থেকে গেছে। অকিঞ্চিৎকর

নাটক 'সুদামা'র প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যটির কথাই ধরা যাক্। সুমতিকে সুদামা বলছে,—

"………মালা করতে বসব, একটু সময় নেই—ছেলেটা কাঁদল, দুধ গরম করতে ছুটলেম, চাকরটা ঠিক সেব সময়েই বাজারের হিসেব নিয়ে এল; সকালে উঠে পয়সার ধান্দা, খেয়ে একটু না ঘুমুলে মাথা ধরে, তারপর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—অসুখ আছে, বিসুখ আছে—আবার একটু খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ না কল্লে শরীর ভাল থাকে না; এমনি সব ভারি ভারি কাজ। যার যত বিষয় তার সময় কম; তাই আমি ঐটে উলটে নিইছি। যতটা পারি আগে ভগবানকে ডেকে, পরে ভিক্ষেয় যাওয়া খাওয়া, বুঝলে?"

সুদামাকে অপরেশচন্দ্র 'দরিদ্র বৈষ্ণব' বলেছেন। আমরা 'সুদামা'কে অবৈষ্ণব বলার স্পর্ধা করি না। তবে আমাদের কাছে এই মানুষটি একান্তভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের উত্তর কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। যে মানুষটি ছেলের দুধ গরম করে, চাকরের কাছ থেকে বাজারের হিসেব নেয়, পয়সার 'ধান্দা' করে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের খোঁজ নেয়, আমোদ প্রমোদ করে, দিবানিদ্রা যায় ও মালা জপ করে দিন কাটায়—নিঃসন্দেহে এই মানুষটি অপরেশচন্দ্রের অতি পরিচিত বিশ শতকের বিশের দশকের মানুষ। সমসাময়িক বাঙালী সমাজ সম্পর্কে অপরেশচন্দ্রের গভীর জ্ঞানের নজীর মিলছে 'সুদামা'য়, 'মন্ত্রশক্তি'তে ও 'পোষ্যপুত্র' নাটকে।

দর্শকের চাহিদা বুঝে অপরেশচন্দ্র অনুরূপা দেবীর কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'কেও তিনি নাটকে রূপান্তরিত করেন। এ থেকে অনুধাবন করা সহজ যে, আধুনিক যুগোপযোগী মনস্তত্ত্ব প্রধান সামাজিক নাটক রচনার প্রেরণা থেকেই অপরেশচন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। অপরেশচন্দ্র জানতেন, সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর কোনো মৌলিক কৃতিত্ব নেই। 'পোষ্যপুত্র' নাটকের 'নিবেদন' অংশে তিনি লিখেছেন,

"উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। যে উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান বেশী, যাহার গল্পাংশ (plot) পাঠকের আগ্রহকে বাড়াইয়া দেয়, বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া যে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি হৃদয়-দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ ও অবকাশ পায়, সাধারণতঃ সেই সব উপন্যাসই নাটকাকারে রূপান্তরিত হইবার উপযোগী এবং রঙ্গমঞ্চে তাহারাই টিকিয়া থাকে। এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই শক্তিশালিনী লেখিকার দুইখানি উপন্যাসই নাটকাকারে দর্শকসমাজে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ নিমিত্ত নাট্যামোদী দর্শকগণের প্রশংসা ও ধন্যবাদ উপন্যাস লেখিকার প্রাপ্য।"

'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র', 'মা',—প্রভৃতি নাটকের জন্য অনেকটা কৃতিত্ব অনুরূপা দেবীর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা স্বীকার করব—যুগের প্রয়োজনে

অপরেশচন্দ্রই এই মহিলা ঔপন্যাসিককে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে আহ্বান করেন। অতএব কিছুটা কৃতিত্ব অবশ্যই অপরেশচন্দ্রের। আজ পর্যন্ত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের অনুকরণে নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যাপারটি অনুসৃত হচ্ছে।

অপরেশচন্দ্র প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন—ইচ্ছে করলে তিনি বাংলা নাটকের বিবর্ধনে আরো কিছুটা সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, নিজের নাটক সম্পর্কে অতিরিক্ত দুর্বলতা থাকায়—তিনি আর্ট থিয়েটারে নতুন কোনো নাট্যকারকে প্রবেশাধিকার দেননি। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "

"হরিদাসবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন রাখালদা [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] 'দাদা' বলে ডাকতেন। নাটকটি ['দনুজমর্দনদেব'] হরিদাসবাবুর কাছে আনতে, উনি বললেন—ও নিয়ে আমি ত ঘাঁটাঘাঁটি করি না, অপরেশবাবুকে গিয়ে বলো।.........আবার অপরেশবাবু কখনো অপর নাট্যকারদের বই ছুঁতেন না, বিশেষ করে নতুন নাট্যকারদের। ......তিনি রাখালদার নাটক যথারীতি ছুঁলেন না, বললেন—নাটক ঠিক করেন ত ডাইরেক্টররা! ওঁরা ত সব আপনার বন্ধুও! ওঁদের বলুন!"

● দ্বিজেন্দ্রলাল

কালের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল আলোচ্য অধ্যায়ের নাট্যকার নন। কিন্তু মঞ্চের প্রেক্ষিতে (১৯২১-৪৪) দ্বিজেন্দ্রলালই এই অধ্যায়ের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। বিশেষ করে দানীবাবু ও শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালকে অমর করে দিলেন বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে। আর অহীন্দ্র চৌধুরী ও সাজাহান নামটি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কাজেই আপত্তি থাকার কারণ নেই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা—প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটল তাঁর মৃত্যুর পরে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে ('দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার') দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে (এবং অবশ্যই দ্বিজেন্দ্রজীবনী, প্রবন্ধ, ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ থেকে) আমরা জেনেছি বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয়রহিত। নাট্যবস্তু, নাট্যসংঘাত, নাট্যসঙ্গীত, নাট্য সংলাপ ও নাট্য-নির্দেশ প্রদানের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চকে অশেষ উপায়ে সাহায্য করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের নানা ত্রুটি সম্পর্কেও আমরা সচেতন। আমরা জানি, তাঁর নাটকের গঠনগত দুর্বলতা আছে, আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে, তীব্র ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ আছে, অনৈতিহাসিক চরিত্র আছে, সংলাপের দুর্বলতা আছে,

উপকাহিনীর বাহুল্য আছে এবং আছে ব্যক্তিগত আদর্শবাদের জোরালো প্রকাশ।

কিন্তু আমরা এও জানি দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' সম্পর্কে আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ততা আজও আছে। অথচ শিশিরবাবু এই 'পাষাণী' নাটকটির অভিনয় করেছেন। 'পাষাণী' সম্পর্কে বেশি কথা না বলে মূল রামায়ণের [বাল্মীকি-রামায়ণ, আদি কাণ্ড, সর্গ ৪৮] একটি উদ্ধৃতি ও তার বঙ্গানুবাদ তুলে দিচ্ছি —

"মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজ কুতুহলাৎ ॥১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২০
আত্মনং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ ॥"২১

["রঘুনন্দন দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেশধারীকে ইন্দ্র বলিয়া জানিয়াও দেবরাজের সহিত রতি ক্রীড়ায় কৌতুহলবশতঃ ঐ কর্মে সম্মতি দিলেন। অতঃপর প্রহৃষ্ট মনে দেবরাজকে বলিলেন,—'সুরশ্রেষ্ঠ আমি কৃতার্থা হইয়াছি। এখন তুমি অতি শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর। দেবরাজ, তুমি গৌতম হইতে নিজেকে ও আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর।' তখন ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে অহল্যাকে বলিলেন।"]

পৌরাণিক নাটকের স্বরূপ এবং সংজ্ঞার বিচারে 'পাষাণী' খাঁটি পৌরাণিক না হলেও মূল রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে এই নাটকের বিষয়বস্তুর তেমন কোনো পার্থক্য আমাদের চোখে পড়েনি। এইজন্যই বোধহয় শিশিরকুমার এই নাটকটির প্রযোজনা করতে সাহসী হয়েছিলেন।

সমগ্র বাঙালীর হয়ে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারি আরেকটি কারণে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে বাংলা অপেক্ষা হিন্দীতেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অপরিসীম। এমনকি ওড়িয়া সাহিত্যে ও আসামীতে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব লক্ষ্য করি। একজন সমালোচক 'হিন্দী নাট্যকথা' গ্রন্থের 'পশ্চিম ভারত কী নাট্যকলা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "পশ্চিম ভারতে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নাট্যকার এখনও জন্মগ্রহণ করেননি"। কথাটি দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠার দ্যোতক।

● ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদ অক্ষয় আসন পেলেন নাট্যকার জীবনের অন্তিম লগ্নে। শিশির-সান্নিধ্য লাভেই তিনি যথার্থ আধুনিক নাট্যকার হয়ে উঠেছেন এবং স্বয়ং ক্ষীরোদপ্রসাদ সে কথা স্বীকার করেছেন। শিশিরযুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের দু'টি নাটক উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছিল এবং এই দুটি নাটকই শিশিরকুমারের পরামর্শে সংশোধিত। 'নরনারায়ণ' ও 'আলমগীর'—সেই নাটক দুটির নাম।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গতানুগতিক ফরমায়েসী রচনা থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'কর্ণ' নাটক লিখতে শুরু করেন। 'কর্ণ' নামটি শিশিরকুমারের পরামর্শে 'নরনারায়ণে' বিবর্তিত হয়। 'কর্ণ' রচনাকালে ক্ষীরোদপ্রসাদ সাহিত্যানুরাগী জমিদার বন্ধু শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে লেখেন,

> "প্রিয় মহেন্দ্র ভাই * * তোমার কথামত দৃশ্যগুলো লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তৃতীয় অংক সত্বর শেষ করিয়া পাঠাইতেছি। ··· আমি এবারে নিজের মনোমত করিয়া এ পুস্তক লিখিতেছি। অভিনয় হউক বা না হউক কাহারও কোন Suggestion লইতে ইচ্ছা নাই। এই পুস্তকই মনে হইতেছে আমার শেষ।···
>
> ···'কর্ণ' সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম সেইটাই পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী।"

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বন্ধুকে লেখা এই পত্রাংশে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করেননি। 'নরনারায়ণ' পাঠে আমরা প্রকৃতই বুঝতে পারি যে—'এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনী' বিবৃতিই তাঁর অভিপ্রেত এবং সবদিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন।

ব্যাস-বাল্মীকির নির্লিপ্তি থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ অনায়াসে বেরিয়ে এসে আধুনিক নাট্যকারের মতো পৌরাণিক চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কর্ণ একদিকে যেমন পুরাণের নিগৃহীত চরিত্র তেমনি আবার আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষ। কর্ণের মধ্য দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ—

"দৈব কিংবা পুরুষকার
বিশ্বরাজ্য কোন রাজার"—এই আধুনিক সমস্যাটি খুঁজেছেন। আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমার এই আধুনিক চরিত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদকে অমর করেছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের অপর নাটকটি 'আলমগীর'। জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নাটকে নানাবিধ ত্রুটি আছে। এই নাটকের ঘটনা

সংস্থাপনে, মীরাবাই-এর মেবার ত্যাগে, ভীমসিংহ-জয়সিংহের আলমগীরের সম্মুখে উপস্থিতি পরিকল্পনায়, উদিপুরীর শিবিরে রূপকুমারীর প্রবেশে, ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্য, কামবক্সের শরীরে মাতৃশক্তির অলৌকিক আরোপে ঐতিহাসিকতা ও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তথাপি "'আলমগীর' ক্ষীরোদ-প্রসাদের কীর্তির বিজয়বৈজয়ন্তী।"[৮১]

এর কারণ হিসেবে বলা চলে যে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ ও সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজের দিকে তাকিয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলমগীর রচনা করেছেন। আলমগীর একই সঙ্গে জনপ্রিয় নাটক, মঞ্চসচেতন নাটক, আবার সাহিত্য-গুণসমৃদ্ধ নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ জনপ্রিয়তার আওতার মধ্যে থেকেই কাব্য সৃষ্টি করেছেন ; অথচ জনপ্রিয়তার কায়দাকানুন এই নাটকের কাব্যকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সর্বোপরি আছে 'আলমগীর' নাটকের ক্ষুরধার গতি। যখন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র সেন-এর মঞ্চসংস্কার কার্যকরী হয়নি বাংলা নাট্যশালায়, যখন ঝোলানো সীন দিয়ে পট পরিবর্তনের কাজ চলত সেই সময়ের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ গতির সাহায্যে সকল ত্রুটিকে সংশোধন করে নিয়েছেন।

একালের একজন বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত 'জনপ্রিয়তা ও আলমগীর' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'আলমগীর' নাটক সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে অভিনব মন্তব্য করেছেন। শ্রীযুক্ত দত্তের সেই মন্তব্য থেকে ক্ষীরোদ-প্রসাদ সম্পর্কে (বিশেষ করে 'আলমগীর' সম্পর্কে) আধুনিক মনোভাবটি জানতে পারা যায়। উৎপল দত্ত বলেছেন,

> "আলমগীরের কাব্যকে বেঁধেছে কে ? আমার মতে একটা তৃষ্ণা, মরুভূমির জ্বলন্তরূপ। জলের তৃষ্ণায় ছটফট করছে নাটকের প্রত্যেকটা মানুষ। সে জল, সে রস শুধুই জল নয়। সে মরুপ্রান্তর শুধুই ভৌগোলিক মরুভূমি নয়।"……
>
> "এই মরুকল্পনাই নাটকের কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত শৃংখলিত করে শিল্পে উন্নীত করেছে। প্রতি চরিত্র তাই শুধুই একটা কাহিনীতে একটা জাগতিক ছকে আবদ্ধ না থেকে সংকেতে ভরে উঠেছে, বাঙময় হয়েছে, কাব্যকল্পনার প্রতীক হয়েছে।"[৮২]

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংখ্যায় অতি অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছে 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' আর আর্টে অভিনীত হয়েছে 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ'। এছাড়া 'যোগাযোগ', 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাসও অভিনীত

হয়। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ হলে কবি নিজেই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের ওপর বিশেষ প্রীত ছিলেন। শিশিরকুমারের জন্য কয়েকটি নাটক লিখে দেবেন—এও বলেছিলেন।

তবু পেশাদরী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সম্পর্ক ছিল না। তাঁর বিশিষ্ট নাটকগুলি তখনও মঞ্চে অভিনীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথও আগ্রহী হননি এবিষয়ে। 'নাচঘর' পত্রিকায় (৩ জুন, ১৯২৭) প্রকাশিত একটি রবীন্দ্র-মন্তব্য চয়ন করলেই বোঝা যাবে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে মহাকবির ধারণাটি কি ছিল—

"যেভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যার মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারবে না।

সর্বসাধারণের জন্যে নয়—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান—তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না?"

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের 'অতিরিক্ত রঙ্গালয়' চাহিদা থেকেই আশা করি পেশাদারী থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর অনীহার স্বরূপটি বোঝা যাচ্ছে। কাজেই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল—এ কথাটি স্বীকার করতে আমাদের কুণ্ঠা থেকে যায়।

● শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষপর্যন্ত শিশিরকুমারের অনুরোধে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে নাট্যকার শরৎচন্দ্র হতে হয়। সর্বমোট নিজের লেখা তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন শরৎচন্দ্র।

ক. দেনাপাওনা থেকে 'ষোড়শী'
খ. পল্লীসমাজ থেকে 'রমা'
গ. দত্তা থেকে 'বিজয়া'

তিনটি নাটক সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উচ্চ ধারণা ছিল। শিশিরকুমারের অভিনয়ের গুণে তিনটিই অসাধারণ মঞ্চ সাফল্য লাভ করে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে শরৎচন্দ্র 'বিজয়া' নাটকের শেষ দুই পঙ্‌ক্তির পরিবর্তে যা রচনা করেন তা এইরকম—

"রাস—দয়াল মেয়েটি কে?
দয়াল—আমার ভাগ্নি নলিনী।
রাস বড় জ্যাঠা মেয়ে (প্রস্থান)

দয়াল - (সেইদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। ভগবান্ ওঁর ক্ষোভ দূর করুন। গাঙ্গুলী মশাই, চলুন আমরা অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখিগে। আজকের দিনে কোথাও না অপরাধ স্পর্শ করে।

পূর্ণ—প্রজাপতির আশীর্বাদে কোথাও ত্রুটি নেই দয়ালবাবু—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে। (প্রস্থান)

দয়াল—(ইঙ্গিতে বরবধূকে দেখাইয়া) নলিনী, এদেরও যা হোক দুটো খেতে দিতে হবে যে মা। যাও তোমার মামীমাকে বলো গে।

নলিনী—যাই মামাবাবু—

দয়াল—আমিও যাচ্চি চলো— (প্রস্থান)

ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চে বরবধূ ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নরেন—গম্ভীর হয়ে কি ভাবচো বলো তো ?

বিজয়া—(সহাস্যে) ভাবচি তোমার দুর্গতির কথা। সেই যে ঠকিয়ে Microscope বেচেছিলে তার ফল হলো এই। অবশেষে আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

নরেন—(গলার মালা দেখাইয়া) তার এই ফল! এই শাস্তি ?

বিজয়া—হাঁ তাই তো। শাস্তি কি তোমার কম হলো না-কি !

নরেন—তা হোক্ কিন্তু বাইরে এ কথা আর প্রকাশ কোরো না,—তাহলে রাজ্যশুদ্ধ লোক তোমাকে Microscope বেচতে ছুটে আসবে।

(উভয়ের হাস্য)

নলিনী—(প্রবেশ করিয়া) এসো ভাই, আসুন Dr. Mukhrjee, মামীমা আপনাদের খাবার নিয়ে বসে আছেন,—কিন্তু অমন অট্টহাস্য হচ্ছিল কেন ?

বিজয়া—(হাসিয়া) সে আর তোমার শুনে কাজ নেই—

যবনিকা”

‘বিজয়া’ নাটকের এই সর্বশেষ সংলাপগুলি যোজনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নাট্যকার প্রতিভার জৌলুস বিঘোষিত। মিলনান্ত নাটকের শেষদিকে রাসবিহারী, পূর্ণ, দয়াল, নলিনীর প্রস্থানের পর নায়ক-নায়িকাকে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ দিয়ে, নরেন চরিত্রের পরিহাস প্রবণতার দিকটি উন্মোচন করে মূল উপন্যাসের ত্রুটিটুকু ‘বিজয়া’য় ঢেকে নিতে পেরেছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’য় (চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫২) ‘বিরাজ বৌ’ সম্পর্কে লিখেছেন,

“বিরাজ বৌ (নাটক)।? শ্রাবণ ১৩৪১ (১৮ অগাস্ট ১৯৩৪),

পৃ. ১১৪। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১২ শ্রাবণ ১৩৪১ তারিখে 'নবনাট্যমন্দিরে' প্রথম অভিনীত।"

কিন্তু আমরা জানি ব্রজেন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ 'বিরাজ বৌ'-এর প্রথম নাট্যরূপ দেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি ছাপা হয়নি। গিরিমোহন মল্লিকের কালে স্টারে অমুদ্রিত এই নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার নিজে এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'নবনাট্যমন্দির' (স্টার)-এ অভিনয়ের জন্য। শিশিরকুমার কৃত নাট্যরূপ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে মুদ্রিত হয়। নাট্যরূপদাতা হিসেবে সেখানে কারো নামোল্লেখ ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ তাই অনায়াসে এটি শরৎচন্দ্রের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে জেনে রাখা ভালো যে, 'বিরাজ বৌ' (নাটকটি) শিশিরকুমারের মার্জনায় ঋদ্ধ। [পরবর্তীকালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ থেকে কানাই বসুর দেওয়া নাট্যরূপ 'বিরাজ বৌ'-এর একটি সংস্করণ পাওয়া গেছে।]

শরৎচন্দ্রের তিনটি নাটকের বিচারে 'ষোড়শী'কে শ্রেষ্ঠতর বলতে আপত্তি নেই। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে 'ষোড়শী' নাটকাভিনয় আমরা দেখেছি। তাতে মনে হয়েছে সমকালীন যে কোনো নাটকের চাইতে 'ষোড়শী' অনেক বেশি সাহিত্য-গুণসম্পন্ন। নাটকের উপযোগী সংঘাত, সংলাপ, উপকাহিনীর বিস্তার, সমাজচিত্র—সবই 'ষোড়শী'তে আছে। তবে দেনাপাওনার উপন্যাস রস এখানে খণ্ডিত। সেদিক থেকে বিচার করলে 'ষোড়শী'কে ত্রুটিপূর্ণ রচনা বলতে হয়। আমরা 'ষোড়শী'কে নাটক হিসেবে বিচার করে ভালো রচনা বলতে পারি অনায়াসে।

এইখানে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ ষোড়শীকে যুগোত্তীর্ণ নাটক বলতে চাননি। 'ষোড়শী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করে শরৎচন্দ্র মতামত চাইলে পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান, (৪ ফাল্গুন, ১৩৩৪)

"ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সংগতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজে-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়।"

উত্তরে শরৎচন্দ্র বিনয়াবনত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন,

"...এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'লো আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই, বোধহয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার 'ষোড়শী'। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না।"

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের এই পত্র আদান-প্রদানের মধ্যে ষোড়শী সম্পর্কে রচয়িতা ও মহান সমালোচকের মতামত জানা গেল। আমরা এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে না গিয়ে 'ষোড়শী'-কে বিশেষ দশকের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হিসেবে চিহ্নিত করব।

শরৎচন্দ্র তাঁর তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ১৯২৭, ১৯২৮ ও ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারীতে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে আর কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি দেননি। কেন দেননি—সে প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে দেব। আপাতত, আমাদের জানা দরকার যে শরৎচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় এবং প্রয়াণের পর একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ('চরিত্রহীন'), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (চন্দ্রনাথ), অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ('বামুনের মেয়ে'), দেবনারায়ণ গুপ্ত ('স্বামী')। এছাড়া একক নাটক হচ্ছে 'দেবদাস' ও 'পথের দাবী' (শচীন সেনগুপ্ত), 'বিপ্রদাস' (বিধায়ক ভট্টাচার্য), 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'অনুপমার প্রেম', 'কাশীনাথ', 'পরিণীতা', শ্রীকান্ত—১ম ও ২য় পর্ব অবলম্বনে 'রাজলক্ষ্মী' এবং 'শ্রীকান্ত'—৩য় ও চতুর্থ অবলম্বনে (দেবনারায়ন গুপ্ত), 'গৃহদাহ' ও 'পণ্ডিত মশাই' (অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল), 'বিরাজ বৌ' (কানাই বসু)। সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র নির্মাতারাও শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসের চিত্রনাট্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন।

পরিশেষে বলি, শরৎচন্দ্রের মতো নাট্যকার যদি আরও কয়েকটি নাটক রচনা করতেন তাহলে বোধহয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটত। যে কোনো কারণেই হোক আমাদের সে আশা পূরণ হয়নি।

একদা শরৎচন্দ্রের অনুরাগী মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছিল—'আপনি নাটক লেখেন না কেন?' এর উত্তরে শরৎচন্দ্র এক দীর্ঘ পত্র লেখেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে। পত্রটি 'নাচঘর' পত্রিকায় (২৫ আশ্বিন, ১৩৪১) প্রকাশিত

হয়েছিল। শরৎচন্দ্র লিখিত এই পত্রটি বিবিধ কারণে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। শরৎচন্দ্র লিখিত হুবহু পত্রটির উল্লেখ করছি না। প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি মাত্র।

"তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা হইল, আমি নাটক লিখিনা, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি তা হ'লেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাবলিশারের অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন এ যায়গাটায় এ্যাক্শন (Action) কম দর্শক নেবে না, কিম্বা এ বই অচল তাকে সচল করার উপায় নেই।···
নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে।···
···আর একটা কথা উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই। নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে দেওয়া নাটককে দৃশ্যে বা অংকে ভাগ করা,—তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়েনা।"

শরৎচন্দ্রের লিখিত পত্রটি পাঠে আমরা বিশ শতকের নাট্যকারদের এবং বিশেষ করে প্রথিতযশা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের নাটক লেখার অনীহার কারণটি বুঝতে সক্ষম হয়েছি। শরৎচন্দ্রের বক্তব্যগুলি সূত্রাকারে এই রকম—

ক. নাটক লিখলে 'মজুরি পোষাবে না', প্রকাশক মিলবে না।

খ নাটক শুধু নাট্যকারের নয়—মঞ্চের, দর্শকের।

গ. নাটক রচনা উপন্যাসের মতো সহজ নয়।

ঘ. নাটক রচনার প্রেরণা হিসেবে ভালো অভিনেতা, বিশেষ করে শিক্ষিত অভিনেত্রীর অভাব আছে।

বাংলায় ভালো নাটক নেই বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন, আশা করি, তাঁরা শরৎচন্দ্রের এই পত্রটিকে স্মরণে রাখবেন।

● ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'অভিনয় শিক্ষা' গ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের দু'টি পালাবদলের সাক্ষী ও সহযোগী ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অতি পরিচিত নাট্যকার। একাধিক নাটক তিনি রচনা করেছেন (সর্বমোট কুড়িটি)। তার মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে—'কেলোর কীর্তি', 'পেলারামের স্বদেশিকতা', 'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন', 'জোর বরাৎ' (এটি সবাক চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়), 'বাঙ্গালী', 'ডারবি টিকিট', 'শাঁখের করাত', 'শঙ্খধ্বনি', 'দেশের ডাক', 'ধরপাকড়' প্রভৃতি।

ভূপেন্দ্রনাথের 'কেলোর কীর্তি' ও 'বাঙ্গালী' জীবনরস রসিকতার পরিচায়ক। 'পেলারামের স্বদেশিকতা'য় ভূপেন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করেছিল। উপর্যুপরি চতুর্দশ রজনী অভিনয় হবার পর সরকার থেকে এই নাটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাট্যকারের জীবদ্দশায় সরকারী নিষেধাজ্ঞা আর প্রত্যাহৃত হয়নি।

'শঙ্খধ্বনি' ভূপেন্দ্রনাথের পরীক্ষামূলক নাটক। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও আয়তনের সীমাবদ্ধতা এই নাটকটির গুণ। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এই নাটকের কেতনলালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভূপেন্দ্রনাথকে অমর করে গেছেন। অনুরূপভাবে 'দেশের ডাক' নাটকটির গুণধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী ভূপেন্দ্রনাথের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন।

নাট্যকার ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনেপ্রাণে গিরিশচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। 'গৈরিশ ছন্দ' নামক একটি বিশাল প্রবন্ধে তিনি নানা উদাহরণের সাহায্যে গিরিশ প্রবর্তিত ছন্দের প্রশংসা করেছেন। কৌতুহলী পাঠকের জন্য একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি।

"………অনেক বলিয়া থাকেন—'গৈরিশি ছন্দে যে সমস্ত অভিনেতা বা অভিনেত্রী বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহারা কেমন একটা সুর মিশাইয়া দেন—তাহার জন্যই আমাদের ভাল লাগেনা। বক্তৃতা করিতে হইবে—স্বাভাবিক—যেমন ঘরের ভিতর লোকজন কথা কহিয়া থাকে।' এই শ্রেণীর আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি হইয়াছেন তাঁহাদিগকে 'অব্যবসায়ী' বলিলেও চলে। তাঁহারা অভিনয়ের কিছুই জানেন না—এবং বুঝিতেও পারেন না যে, তাঁহাদের উপদেশ মত কার্য করিলে বাস্তবিক সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তাঁহারা যখন ইহা বুঝেন না যে, নাট্যজগৎ বাস্তব জগৎ হইতে ভিন্ন—তাঁহারা যখন Practical Knowledge অপেক্ষা Theoretical knowledge অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া প্রচার করিতে চান, তাঁহারা যখন কাব্য আর গদ্য এক মনে করেন, তখন আর তাঁহাদের কি বুঝাইব—অথবা বুঝাইয়া ফলই বা কি ?

তাঁহারা যদি —

'নাহি জানি ভাইরে লক্ষ্মণ
এই কি রে রাজ্য সুখ!
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে ভাই—
দণ্ডক অরণ্য মাঝে—কুরঙ্গের সনে,
ছিনু তিন জন সুখে—'

রামের এই কাব্যময় উক্তিটি বিধু ময়রার—কাল রাত্রে কাঁকড়া চচ্চড়ী খেয়ে—বড় পেটটা ফাঁপছে -এইরূপ উক্তির স্বাভাবিক সুরে অভিনেতাকে বলিতে বলেন—তাহা হইলে কলাবিদ্যার আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয় কি না!"[৮৩]

● অয়স্কান্ত বক্সী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালেও বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অয়স্কান্ত বক্সীর নামটি খুবই সুবিদিত ছিল। কৃতী নট অহীন্দ্র চৌধুরী অয়স্কান্তর নাটকের সাফল্যের সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন। অয়স্কান্ত বক্সী আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর 'ভোলামাষ্টার' নাটকটির জন্য। 'ভোলামাষ্টার' নাটকের গঠনের দুর্বলতা আছে—মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থাকলেও তা দর্শকের বিশ্বাসবোধকে আঘাত করে। তথাপি 'ভোলামাষ্টার' দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। 'ভোলা মাস্টার'ই নাটকের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। এই ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে বিশ শতকের আধুনিক পর্যায়ের একজন বিত্তহীন শিক্ষক। বিদ্যালয়ের আট হাজার টাকা সে তছরূপ করেছে স্বীয় পুত্রকে 'জজ' হিসেবে গড়ে তুলতে। এতে নিজেকে সে সব প্রলোভনের বাইরে রেখে প্রচার করেছে যে সে আততায়ীর হাতে নিহত। ভোলামাস্টারের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তার পুত্র জজ হয়ে পিতার বিদ্যালয়ে পেয়েছে অভিনন্দন। বাস্তবতার বিরোধী ঘটনা সমাবেশ থাকলেও 'ভোলামাস্টার' একটি নতুন রসের নাটক সন্দেহ নেই। রঙমহল মঞ্চে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী 'ভোলামাস্টার'কে আমাদের প্রতিবেশী করে তুলেছেন।

● বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নামটি মাত্র উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো মূল্যায়ন হয়নি। তথাপি একদা মঞ্চ মালিকেরা বিশেষভাবে এই বরদাপ্রসন্নকে চিনতেন বা জানতেন। বরদাপ্রসন্নের 'পত্র' সম্পর্কে তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথা থেকে আমরা এ তথ্য জানতে পেরেছি। নানারসের নাটক লিখেছেন বরদাপ্রসন্ন—সেগুলির অধিকাংশই আমরা ভুলে গেছি। তবু ভুলতে পারিনি 'মিসরকুমারী'কে।

১৯৬৩ সালেও দেশের জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে এই নাটকটির অভিনয় হয়েছে।

মিসরকুমারী ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু প্রথানুগ ঐতিহাসিক নাটকের ক্লান্তিকর পুচ্ছগ্রাহিতা এতে নেই। বরদাপ্রসন্ন জানতেন—"আমার ধারণা, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের রুচি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে।"[১৪] ফলে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির বাসনায় বরদাপ্রসন্ন চলে গেছেন প্রাচীন মিশরীয় সমাজ ও রীতিনীতির নতুন প্রেক্ষাপটে। বলাবাহুল্য বাঙালী দর্শক সমাজ 'মিসর-কুমারী'র আবির্ভাব লগ্নকে স্বাগত জানিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশচেতনার আদর্শ যে ক্রমশঃই দূরবর্তী হয়ে এক নতুন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তারও একটি নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ এটি।

'মিসরকুমারী' রচনার জন্য বরদাপ্রসন্ন যে বেশ যত্ন ও শ্রম করেছেন তার প্রমাণ আছে 'নিবেদন' অংশ –

"প্রাচীন মিসর এক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতায় জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ইতিহাস আমাদের সুপরিচিত নহে। সেই ইতিহাসের ভিত্তির উপর নাটক রচনা অনেকে হয়তো দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া মনে করিবেন।"

সত্যি বলতে কি, 'মিসরকুমারী' নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সামান্যই। বরদাপ্রসন্ন মিসরীয় ইতিহাসের সাহায্যে সমসাময়িক বাংলা দেশের দর্শককে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এবং সেদিক থেকে 'মিসরকুমারী' একটি সার্থক নাটক। 'মিসরকুমারী'র আশ্রয় মিসরীয়দের বর্ণবিদ্বেষ ও অত্যাচারিত কাফ্রীদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ। নাটকের প্রথম অংক থেকেই নাট্যকারের বক্তব্য স্পষ্ট। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে খারেব বলছে—

"এ মিশরী। মিশরীরা যদি মানুষ হয় তবে দুনিয়ার পশু কে? তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই নিরপরাধ কাফ্রীদের উপর রাক্ষসের মত জুলুম করে আসছে।··· তাদের চোখে আমরা মানুষ নই, তারা আমাদের চোখে মানুষ হবে কেন?"

এই সংলাপগুলির মধ্যে সমসাময়িক বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের উগ্রপন্থীদের কথা বিধৃত। কিন্তু নাট্যকার মনে করেন যে, এ পথে মুক্তি আসে না। খারেব তাই নাহরিণের প্রভাবে পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে ক্রমশঃই হিংসার পথ ছেড়ে অহিংসার পথ ধরেছে। নাটকটির উপসংহারে সে বলেছে,—

"সম্রাট, আমি আপনার কাফ্রী প্রজা। একদিন আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্তে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম, ভেবেছিলেম তাই বুঝি মনুষ্যত্ব। কিন্তু আজ আমি আমার ভ্রম বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি স্বাধীনতা অর্থ স্বেচ্ছাচার নয়।

তাই আজ আমি দেবতার নামে শপথ করছি, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজ-সেবায় অতিবাহিত করব। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি মিসরের প্রজাশক্তি এই মিলিত রাজশক্তির ছত্রছায়াতলে চিরকাল মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হোক।" (৫।৭)

'মিসরকুমারী' নাটকের এই সর্বশেষ সংলাপগুলি শুনে দর্শক আনন্দিত হয়েছেন, মিসরকুমারীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, মঞ্চমালিক প্রচুর পয়সা রোজগার করেছেন, অথচ কিন্তু আমরা খুশি হতে পারিনি। এর কারণ 'মিসরকুমারী'র সমাপ্তিতে খারেব যা বলেছে তাতে নাট্যকারের বক্তব্য আপোষ-এর পথ নিয়েছে। অথচ খারেব অনায়াসে বিদ্রোহ করতে পারত এবং বরদাপ্রসন্ন প্রগতিশীল নাট্যকার-পরিচিতি পেতেন।

আসলে বরদাপ্রসন্নেরা বেরিয়ে আসতে পারেননি মধ্যবিত্ত আপোষনীতি থেকে, ফলে তাঁরা যুগোত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠা পেলেন না। তবে এটুকু নিশ্চিন্তে বলা যায়, বাংলা নাটকের গতানুগতিকতার পথ থেকে বেরিয়ে এসে বরদাপ্রসন্ন ঐতিহাসিক নাটক রচনার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুদূর মিশরের কাহিনীর সঙ্গে স্বদেশ স্ব-কালের এক আশ্চর্যসুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন বিস্মৃত নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

● যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সুপ্রসিদ্ধ নট যোগেশচন্দ্র চৌধুরী নাটক লিখতে শুরু করেন শিশির-কুমারের কালে। একাধিক নাটক তিনি রচনা করেছেন—নাট্যকার হিসেবে এককালে বেশ প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন এবং জীবনদীপ নির্বাণের পরে চিরকালের মতো হারিয়েও গেছেন। যোগেশ চৌধুরী মৌলিক নাটক রচনা ছাড়াও কিছু কিছু সুখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপের নাম হলো—'সীতা', 'দিগ্বিজয়ী', 'পূর্ণিমা মিলন', 'পরিণীতা', 'মহানিশা', 'বাংলার মেয়ে', 'পথের সাথী', 'নন্দরাণীর সংসার' ও 'কংকাল'। যোগেশ চৌধুরীকে বুঝতে পেলে 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' দিয়ে বুঝতে হবে, কারণ 'সীতা' রচিত হবার পর পৌরাণিক নাট্যধারায় যোগেশ চৌধুরী উল্লেখযোগ্য আসন পান এবং 'দিগ্বিজয়ী' অভিনয়ের পর যোগেশ চৌধুরীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা আসে। সমালোচকেরাও[৪৫] মনে করেন, এই দু'টি নাটক যোগেশ চৌধুরীর মূল্যায়নের অন্যতম চাবিকাঠি।

সীতা

'সীতা' নাটক কেন লেখা হয়েছিল—তা আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটক হিসেবে ভালো

কি মন্দ—এ প্রশ্ন ওঠার আগেই অভিনয়ের বিচারে বন্দিত হয়েছিল অতি সহজেই। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নাটক হিসেবে 'সীতা' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য হতে পারেনি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা (১২ ভাদ্র, ১৩৩১) একটি পত্রে কবিগুরু লেখেন,

"......সীতা বইটিকে আমি একটুও পছন্দ করিনে—ওটা নাটকই নয়—এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন করে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখান কঠিন—তৎসত্ত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকে চালিয়ে দিতে পেরেছেন।......"

'সীতা' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য না হলেও আমাদের মনে হয়েছে যোগেশ চৌধুরীর নানা নাটকের মধ্যে এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসে 'সীতা' একটি নতুনতর সংযোজন। অবশ্য যোগেশ চৌধুরী 'নিবেদন' অংশে স্বীকার করেছেন যে 'সীতা' রচনার ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল, শিশিরকুমার ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দান কম নয়। বিশেষ করে যোগেশ চৌধুরী লিখেছেন,

"স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 'সীতা' আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। সে নাটকের অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করেছিল; সেজন্য আমার এই 'সীতা' নাটকের কোনও কোনও জায়গায় স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের নাটকের একটু আধটু ছায়া পড়তে পারে-তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি।"

যোগেশ চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' পাশাপাশি রেখে দেখেছি—দুই নাট্যকারই নাটকের কাহিনী নির্বাচনে ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে'র আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; দুই নাটকেরই মূল ঘটনা সীতা বিসর্জন ও সীতার পাতাল প্রবেশ। দুই নাটকেরই সূচনা হয়েছে লংকাযুদ্ধের পর অযোধ্যায় স্বল্পকালীন সুখের পরিবেশে। দুই নাটকেরই ভাবকেন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের সঙ্গে রাজকর্তব্যের সংঘাত; দুটি নাটকই স্বাভাবিক কারণে বিষাদ পরিণামী। এবং প্রক্রিয়াগত ভাবে এরা একই রকম। লব-কুশের সঙ্গে শত্রুঘ্নের যুদ্ধ, শম্বুকের উপাখ্যান দু'টি নাটকেই আছে। যোগেশচন্দ্র স্বর্ণসীতার প্রতিষ্ঠা ক'রে রামচরিত্রের প্রেমিক সত্তাকে পরিস্ফুট করেছেন নানা উপায়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল পাতাল প্রবেশের পূর্বে দণ্ডকাশ্রমে রামসীতার মিলন ঘটিয়েছেন। সেইখানেই অকস্মাৎ ভূমিকম্পে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটে। অপরদিকে যোগেশচন্দ্র নাটকের পরিণামে আরও একটি পরীক্ষার আয়োজন

করেছেন অসংখ্য রাজন্য, ঋষি ও প্রজাবর্গের সামনে সীতার সতীত্ব মহিমা আর একবার প্রমাণিত হওয়ার পর মুহূর্তেই সীতা সেই জনাকীর্ণ রাজদরবারে বসুন্ধরার কোলে অন্তর্হিতা হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালকেই পদে পদে অনুসরণ করেছেন যোগেশ চৌধুরী এবং অনুসরণের ফলেই 'সীতা'র সৃষ্টি। কিন্তু যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণজাত রচনা নয়। সু-অভিনেতা শিশিরকুমারের সাহচর্য লাভ করার জন্য যোগেশচন্দ্র, রামচরিত্রের নতুন বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছেন, নাটককে চার অংকে বাঁধতে পেরেছেন, রামানুজ ত্রয়ের পারিবারিক জীবনের বিস্তারিত চিত্র বর্ণন করেছেন, সর্বোপরি দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যবহৃত সমিল-অমিত্রাক্ষরকে প্রাধান্য না দিয়ে নাট্যসংলাপকে ক্ষুরধার করার প্রয়াস পেয়েছেন। উভয় নাটকের একই ধরণের সংলাপ পাশাপাশি রাখলে যোগেশচন্দ্রের কৃতিত্বটুকু বুঝতে সুবিধা হবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল	যোগেশ চৌধুরী
রাম। বুঝিয়াছি হবে,	রাম। "নিষ্ঠুর নিয়তি !
আমার দুঃখের এই পূর্ণ মাত্রা তবে।	জীবনের পরিপূর্ণ সুখ
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে,	দেখাইয়া বিজলী ঝলকে—
পূর্ণ সুধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে,	আবার কাড়িয়া নিবি ?
পান করিবার কালে ছিনিয়া সবলে	তোর চেষ্টা বিফল করিব।
সহসা ছাড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে।	রে লক্ষ্মণ,
একি কোন্ কুস্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল হায়।	আন্ আন্ মোর শর-শরাসন
মহর্ষি বলিয়া দাও জানকী কোথায় !"	সপ্ত সিন্ধু মথিত করিয়া,
(৫।৫)	জানকীরে ফিরায়ে আনিব !
	সীতা, সীতা, সীতা, সীতা,—
	(৪।২)

দিগ্বিজয়ী

এবারে 'দিগ্বিজয়ী' প্রসঙ্গ।

যোগেশ চৌধুরী 'দিগ্বিজয়ী' নাটকটি রচনা করেছিলেন বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'নাদির শাহ' থেকে প্রেরণা পেয়ে। 'দিগ্বিজয়ী'র অন্যতম প্রেরণা অবশ্যই শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'নিবেদন' অংশে নাট্যকার আমাদের জানিয়েছেন,

"নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোনো স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই, এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটিকেও অবহেলা করি নাই।"

প্রকৃত প্রস্তাবে, বরদাপ্রসন্নের 'নাদির শাহ্' নাটকের তুলনায় যোগেশ চৌধুরীর ইতিহাসনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। নাট্যকারের যে ইতিহাস—তথ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ ছিল তার প্রমাণ পাই ঐ 'নিবেদন' অংশে, যেখানে আকর গ্রন্থ হিসেবে Sri Mortimer Durand-এর গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

তথাপি, 'দিগ্বিজয়ী' নাটকটিকে খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক বলা যাবে না। নাদির চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকারের লেখনী অতিরিক্ত মাত্রায় অসংযমের পরিচয় দিয়েছে। নাদির শাহকে ব্যাখ্যা না করে নাট্যকার যেন অভিভূত হয়ে বলে চলেছেন রহমৎ খাঁর মুখে),

"আপনার বীরত্বে সমগ্র ইরাণ মুগ্ধ—ঔদার্যে বিস্মিত—নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত। আপনি বিচিত্র অর্থহীন রহস্যময়। ...আপনি রাজা না পয়গম্বর না ঈশ্বর স্বয়ং? হে ভয়ংকর আপনি কে, অথচ আপনার আকর্ষণ অসামান্য।" (৫ম অংক)

উত্তরে নাদির জানালেন,

"আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শক্তিদাতা। সেই ক্ষমাহীন দয়াহীন, বিচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পাপীর দণ্ড বিধান করতে।" (৫ম অংক)

নাদির শাহকে শুধু ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচায়িত ক'রে যোগেশ চৌধুরী তৃপ্ত হতে পারেননি, আগ্রহের মাত্রা ছাড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, "যাঁহারা স্কুল-পাঠ্য ভারত ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁদের চক্ষে নাদিরশাহ শুধু নরহন্তা দস্যু।" [নিবেদন অংশ]

আশ্চর্য! ইতিহাসকে হত্যা করে যোগেশ চৌধুরী 'নাদিরতত্ত্ব' স্থাপন করার জন্য সঙ্গতির মাত্রাও ছাড়িয়ে গেলেন। ফলে 'দিগ্বিজয়ী' আমাদের কল্পিত নতুন ইতিহাস পাঠে প্রেরণা দিয়েছে।

আসলে 'দিগ্বিজয়ী' দাঁড়িয়ে আছে প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের অভিনয়ের গুণে ও কয়েকটি সংলাপের জোরে। দিল্লীতে নাদিরের অত্যাচারের দৃশ্যে জনৈকা উম্মাদিনী রমণীর (৪র্থ অংকে) কয়েকটি সংলাপ মনে রাখার মতো—

"আমি শুধু রাজপুতানার নই, আমি মহারাষ্ট্রের, আমি কান্যকুব্জের, আমি গুর্জরের, মদ্রদেশের, সৌরাষ্ট্রের, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের আমি মিলিত ভারতের ব্যথিত নারী আত্মা"।......

"আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ (ক্রেস্তান!) ভারতের সর্ব্বধর্মের সর্ব্ব-মানবতার অভিশাপময় বাণীমূর্ত্তি"।

বলা বাহুল্য, দিগ্বিজয়ী নাটকের এই সর্বভারতীয়ত্ব বোধ ও "জনগণমন অধিনায়কে"র পংক্তি বিশেষের গদ্যানুবাদ সমকালীন বাংলা দেশে তীব্র

উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল এবং সেই উত্তেজনার স্রোতে নাদিরশাহ অনায়াসে জাতীয় বীরের সম্মান পেয়েছেন।

নাট্যকার হিসেবে যোগেশ চৌধুরীর প্রতিভা দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁর 'সীতা' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালকে অতিক্রম করার সাহস থাকা সত্ত্বেও আমরা 'সীতা'কে উঁচুদরের নাটক বলতে পারিনা। আবার দিগ্বিজয়ী'র কতকগুলি উৎকৃষ্ট সংলাপ আমাদের উত্তেজিত করলেও সমগ্র নাটকটির পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব অণু পরিমাণ। 'পূর্ণিমা মিলনে' মলেয়ারের প্রভাব থাকলেও নাটক হিসেবে কোনো দাগ কাটতে পারে না এটি। 'পরিণীতা' নাটকের মর্মকথা তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা'। যোগেশ চৌধুরী 'নিবেদন' অংশে অন্তত তাই-ই মনে করেন। কিন্তু সমগ্র নাটকটি খুঁটিয়ে পড়েও আধুনিক তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের চোখে পড়েনি।

'নন্দরাণীর সংসার' নাটকের 'নিবেদন' অংশে নাট্যকার কিছু গালভরা কথা লিখেছেন,

"প্রাচীনকে সমর্থন এবং বর্তমান ও আধুনিককে গালাগালি দেওয়া নাটকের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে অনেক সৎ গুণ আছে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মহত্ব আছে। তবু জানিনা, কাহার দোষে ঘরে বাইরে কোথাও বাঙ্গালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই, প্রাচীনে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢ়ের সঙ্গে তরুণের মিল নাই, বুদ্ধিমানের কাজ নাই, স্বামী স্ত্রীর মর্মকথা বুঝিতে পারেন না, স্ত্রীও স্বামীর বৃহৎ অনুষ্ঠানে সহায় হন না—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়; শিক্ষিত সহৃদয় যুবক মনে করেন আঘাত দিয়াই জাতিকে বাঁচাইব।'

নাট্যকার কথিত এই সব ভালো ভালো কথা নাটকে অনুসৃত হয়নি। এক ধরণের আখ্যান রস বিস্তারই যোগেশ চৌধুরীর লক্ষ্য। এবং সেদিক থেকে যদি কোন কৃতিত্ব থাকে তবে তা অবশ্য তাঁরই প্রাপ্য।

● জলধর চট্টোপাধ্যায়

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক মঞ্চসফল নাটক আজও সুলভ। তবে সম্প্রতিকালে তাঁর কোনো নাটকেরই আর অভিনয় হয় না। এই নাট্যকার সম্পর্কে আধুনিক মঞ্চের ধারণা—'তিনি একান্তই মধ্যযুগীয়'। বর্তমান কালে দাঁড়িয়ে জলধর চট্টোপাধ্যায়কে গাল দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু একটা সময় গেছে যখন একাধিক রঙ্গমঞ্চের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। স্বয়ং শিশির-কুমার 'রীতিমত নাটকের' 'নিবেদন' অংশে বলেছেন,

"আমার মনে হয়েছে, আমি যদি নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতাম, তা হ'লে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।" কেন? এর উত্তরে বলতে

হয়, শক্তিমান নাট্যকার না হলেও জলধর চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ ক'রে রঙ্গমঞ্চে বেঁচে থাকবেন মৌলিক বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও বাঙালীর সামাজিক বা পারিবারিক জীবনচিত্র রূপায়ণের নিমিত্তে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—'প্রাণের দাবী', 'রাঙা রাখী', 'আঁধারে আলো', 'রীতিমত নাটক', 'পি-ডবলিউ-ডি' প্রভৃতি নাটকগুলিকে। মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যাই জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের উপজীব্য। এবং এই সমস্যাগুলিকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করে সরল ও অবিকম্পিত রেখায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি। জলধর চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মতো 'নিবেদন' অংশে লম্বাচওড়া তত্ত্ব কথা বলেন নি, ধোঁয়াটে ভাব তাঁর নাটকে নেই। ফলে তাঁর সংলাপ যোজনায়, চরিত্র কল্পনায় ও বিষয় বর্ণনায় কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। জলধর চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

"সংস্কারগত ভাবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়নে উৎসাহবোধ করি নাই বা কোন উপন্যাসের নাট্যরূপদানে আত্মনিয়োগ করি নাই। দেশীয় ভাবধারার অনুকূল কাল্পনিক নাট্য সৃষ্টিতেই আনন্দ পাইতেছি। দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হাওলাতী গল্পাংশ লইয়া নাট্যরচনাকে নাট্যসাহিত্যিকের পক্ষে অকর্তব্য মনে করি।"

উত্তর-চল্লিশে জলধর চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। পঞ্চাশের দশকের একেবারে শেষ বিন্দুতেও ('ডাঃ শুভংকর'—১৯৫৮) তিনি নাটক রচনা করেন। কিন্তু মঞ্চের বিচারে, নাট্য বর্ণিত বিষয়ের বিচারে জলধর চট্টোপাধ্যায় অতি-আধুনিক যুগের নাট্যকার নন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি নাটক লিখেছেন বটে, তাঁর প্রায় সবগুলি নাটকই অভিনীত হয়েছে, মঞ্চসাফল্য পেয়েছে—এও স্বীকার্য, কিন্তু আধুনিক যুগের আধুনিক বিষয়বস্তুকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন। আসলে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের যুবা বয়স অতিবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে। ফলে এ যুগের রোমান্টিকতাকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে একালেও তাঁর নাটক অনায়াসে অভিনীত হতো। তবে জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিদের জন্যই বাংলা নাটকের অতি আধুনিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। এঁরাই সর্বপ্রথম পুরাণ ও ইতিহাসের জগত থেকে বাংলা নাটককে বন্ধনমুক্তির পথসন্ধান দিয়েছিলেন। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আধুনিক বাংলা সামাজিক নাটকের ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল।

● শচীন সেনগুপ্ত

১৯২১-৪৪ এর রঙ্গমঞ্চের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে অনেকবারই শচীন

সেনগুপ্তের নামোল্লেখ করতে হয়েছে। বাধ্য হয়েই আমরা এই নামোল্লেখ করেছি। কারণ, আমরা জানি, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। দর্শকের হাততালি পাবার মোহ শচীন সেনগুপ্তের ছিল না। সস্তা ও মনোরঞ্জক বিষয়বস্তুকে নাটকাকারে ব্যক্ত করে জনপ্রিয় হবার অঙ্গীকার করেন নি তিনি, বরং নাটকের অভিনব বক্তব্য ও আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকেছেন। শচীন সেনগুপ্তের সৌভাগ্য, মঞ্চ-মালিকেরা (অনাদি বসু বা প্রবোধ গুহ) তাঁকে নাটক নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ দিয়েছেন—অজস্র অর্থক্ষতি স্বীকার করেও।

আঙ্গিক ও আদর্শের সূত্র সন্ধান করলেও শচীন সেনগুপ্ত নাট্যকার হিসেবে অতি-আধুনিক আখ্যা লাভ করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'কেই তিনি আধুনিক করে তুলেছেন, প্রয়োজন বোধে দ্বিজেন্দ্র-লালের নাট্যভাণ্ডার থেকে ঋণ নিয়েছেন, বিদেশী পুস্তকের বাণী নির্ঝরও তিনি আত্মস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। এতে যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন আমরা তাকে 'মৌলিক' বলতে পারি না। অবশ্য আধুনিক সমাজচিন্তা যে তাঁর নাটকে আসেনি তা নয়। 'স্বামী-স্ত্রী', 'নার্সিং হোম', 'সুপ্রিয়ার কীর্তি', 'তটিনীর বিচার', 'কালের দাবী', 'নরদেবতা', 'সংগ্রাম ও শান্তি'--বিষয়ের দিক থেকে যেমন মৌলিক, বক্তব্যের দিক থেকেও কিছুটা আধুনিক। কিন্তু শচীন সেনগুপ্তের ত্রুটি এই যে, ···"সমস্যাগুলি বাস্তব জীবন হইতে অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত নহে—মানব-চরিত্র সম্পর্কিত পুঁথিলব্ধ জ্ঞান হইতে পরিকল্পিত। সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ সমস্যারই বাস্তব আবেদন খুব সার্থক হইতে পারে নাই।"

শচীন সেনগুপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম 'গৈরিক পতাকা।' বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় এর অসাধারণ মূল্য আছে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত সম্পর্কে সবিশেষ পরিচয় নিতে গেলে এই নাটকটিকেই আশ্রয় করতে হবে। দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসুর কারারুদ্ধ হওয়ার কালে এই 'গৈরিক পতাকা'ই মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। শচীন সেনগুপ্ত নাটকটি উৎসর্গ করেন—'বাংলার যৌবন আন্দোলনের ঋত্বিক, কারারুদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে।' কিন্তু এহ বাহ্য। ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'য় নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বেরিয়ে এসেছেন বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের আপোষনীতি থেকে। ইতিহাসের কক্ষপথ থেকে নাটকের বিষয় ভিন্নপথে গেলেও 'গৈরিক পতাকা'র সমাপ্তিতে শিবাজীর মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই—

"জীবনটা কাটিয়ে দিলাম কেবল অশ্বপৃষ্ঠে অসি হাতে ছুটোছুটি করে, তাই জীবন সায়াহ্নে না পারি বিশ্রামের কথা ভাবতে, না পারি সৃষ্টির স্বপ্ন

দেখতে। দেশের জন্যে মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে রেখে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাটা, তোরাই সেই শ্মশানে নন্দন-কানন রচনা করবি।" [৫।৫]

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে আধুনিককালের নাট্যকার ও মঞ্চকর্মীরা তাঁদের একজন বলে জানেন। এর কারণ-শচীন সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত ভাবে নবনাট্য-আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন সবার আগে। এবং মঞ্চের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অনেক। সাদামাটা গল্পসংকলনকে তিনি নাটক বলতে চাননি। তাঁর চোখে নাটক মানেই সংগ্রামী অথচ শিল্পগুণান্বিত সাহিত্যকর্ম'। 'বাংলার নাটক ও নাট্যশালা' নামে শচীন সেনগুপ্তের একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের আধুনিক মনন ও ঐতিহ্য সচেতনতা অনুধাবন করা যায়। উক্ত গ্রন্থের 'আজকার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন,

"……আমরা নাটক লেখার প্রেরণা পেয়েছি জাতির ওই গুরুতর প্রয়োজনের অনুভূতি থেকেই। আমাদের পূর্বাচার্যেরাও তাই পেয়েছিলেন। আমাদের পরবর্তীরা যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন নবান্ন দিয়ে, তাঁরাও ওই প্রেরণা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন।"

'নবান্নে'র মতো নাটক শচীন সেনগুপ্তের কলম দিয়ে বেরোয়নি। কারণ শচীন সেনগুপ্তেরা 'নবান্ন'র কালের মানুষ নন। কিন্তু সেইখানেই শচীন সেনগুপ্ত আধুনিকদের পুরোধা, যেখানে তিনি অকপটে নতুন কালকে স্বীকার করে নেন। বলাবাহুল্য, শচীন সেনগুপ্তের মতো সাহস ভরে পরবর্তীদের প্রশংসা করতে পারেননি অনেকেই।

● মন্মথ রায়

যিনি অহীন্দ্র-শিশির যুগ থেকে এই সেদিন পর্যন্ত নাটক লিখে গেছেন, যিনি প্রথম একাংক নাটক লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় আপন প্রতিভার অবিসংবাদী প্রমাণ রেখেছেন, যিনি বর্তমান নাট্য আন্দোলনের ও নাট্য অধিকারের অন্যতম নেতা, যিনি বালুরঘাটের বাসিন্দা হয়েও প্রথমাবির্ভাবেই দীপ্যমান, যিনি এই সেদিনও আমাদের মধ্যে থেকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন— তাঁর নাম মন্মথ রায়।

মনোমোহন থিয়েটার (প্রবোধ গুহের আমলে মন্মথ রায়ের নামটি আমরা প্রথম দেখতে পাই 'চাঁদ সদাগর' নাটকের নাট্যকার হিসেবে। শুধুমাত্র অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় কুশলতার জন্য নয়, নাটক হিসেবে 'চাঁদ সদাগর' একটি মহৎ সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে তিন অংকের

একটি সুঠাম নাটক উপহার দিলেন মন্মথ রায়। গান রচনায় সহায়তা করেন নরেন দেব।

'চাঁদ সদাগরে'র সাফল্যের পর মন্মথ রায় লিখলেন 'মহুয়া' ও 'কারাগার'। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩০-এ 'কারাগার' মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের কালে 'কারাগার' যে কি পরিমাণ উৎসাহ দিয়েছিল তা আজ ব্যাখ্যার অতীত। 'কারাগার' নাটকের মর্মমূল্য বুঝতে পেরে ব্রিটিশ সরকার নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। ১৮৭৬ এর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়ে যায়। এই সঙ্গে নাট্যকার একটি পত্র পান সরকারের কাছ থেকে। যার সর্বশেষ ক'টি লাইনে লেখা ছিল—(৩ মার্চ ১৯৩১)

"The Home Member added that ostensibly the play did not relate to present-day politics, but actually its bearing on present-day politics was beyond doubt,"

মন্মথ রায়ের 'খনা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'সতী', 'অশোক', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি নাটক সে যুগে বিস্তর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মন্মথ রায়ের সে জনপ্রিয়তা আজও বর্তমান।

পঞ্চাশের দশক থেকে মন্মথ রায় সামাজিক নাটক লিখতে শুরু করেন। 'মমতাময়ী হাসপাতাল' মন্মথ রায়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। মন্মথ রায় অনেকগুলি সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ও সৌখীন নাট্যমঞ্চে সেগুলির জনপ্রিয়তা ছিল বা আছে বলে মনে হয় না। মন্মথ রায়ের এই ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করেছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। তিনি লিখেছেন,

"প্রবল হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে যেখানে নাট্যঘটনা প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন সেখানেই মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।......... সেজন্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জগতের পাত্র-পাত্রীদের বর্ণাঢ্য জীবন এবং হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ডতা যেখানে তিনি দেখিয়েছেন সেখানে অতিনাটকীয়তা সত্ত্বেও ঘটনার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু সামাজিক নাটকে ঘটনার অতিশয়িত প্রবলতা এবং দুর্দম হৃদয়াবেগের অপরিমিত ক্রিয়া দেখানো চলে না। সেখানে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির অদৃশ্য স্তরগুলিতে অন্তর্মুখীন ক্রিয়ার দ্বারা কম্পন জাগিয়ে তুলতে হবে, চিন্তা ও মননের ঝংকার তুলে তাদের মধ্যে নাট্য আবেগ সৃষ্টি করতে হবে। মন্মথ রায় সামাজিক নাটকের ওই সূক্ষ্ম ও গভীর নাট্যক্রিয়ার জগতে পরিণত বয়সে হৃদয়বৃত্তির বর্ণোজ্জ্বল উষ্ণ লীলা থেকে সরে এসেছেন......"[৪৭]

মূলত, মননধর্মী পৌরাণিক নাটকের নতুন ভগীরথ হয়েই মন্মথ রায় আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তার দান

যদিও অনস্বীকার্য। মন্মথ রায় আধুনিক নাট্যকারদেরও আদর্শ হয়ে থাকবেন চরিত্র, নাট্যসংঘাত, সংলাপ ও গঠন নির্মিতির দক্ষতায়।

শচীন সেনগুপ্তের মতো মন্মথ রায়ও অনুজদের প্রশংসা করেছেন এবং পথনির্দেশিকা দিয়েছেন। ১৯৬৪ সালে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনের (কলকাতায় অনুষ্ঠিত) মূল সভাপতি হিসেবে তিনি বলেছেন,

"......আজকের নাটক আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহিত করা আবশ্যক, সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের খাত।......প্রত্যেক নাটক-নাটিকারই থাকে একটি বক্তব্য, প্রকাশ্যই হ'ক আর প্রচ্ছন্নই হ'ক; কিন্তু সে বক্তব্য আজ যেন সজাজতান্ত্রিক সুরে লয়ে বাঁধা হয় আর তাতেই তা হবে জীবনধর্মী।"

● প্রমথনাথ বিশী

প্রমথনাথকে আমরা প্রখ্যাত সমালোচক আখ্যা দিলেও উচ্চাঙ্গের নাট্যকার বলতে পারছি না। 'সানিভিলা' বা 'ঘৃতং পিবেৎ'কে সামনে রেখে একথা বলছি। যদিও 'সানিভিলা'র সর্বেশ্বর সিংহ বা নগেন্দ্রনাথ, প্রমীরা-নীরজা ও মালবিকা আমাদের নতুন জীবন পটভূমির পথসন্ধান দেয়, যদিও এদের মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনের অসঙ্গতিকে বড় করে তোলেন, মধ্যবিত্ত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি বড়ো হয়ে ওঠে এদের মাধ্যমে—তবু নাটকীয়তা সৃষ্টিতে এরা খুবই অকিঞ্চিৎকর। গল্প হিসেবে 'সানিভিলা' মনোহর। কিন্তু নাটক হিসেবে এর মূল্য খুবই কম। শ্রীযুক্ত বিশীর কিছু কিছু লঘু নাটক আজও বেতারে শুনতে পাই। এছাড়া অন্য নাটকগুলির মধ্যেও (যেমন, 'কে রচিল মেঘনাদ') নাটকীয়তার যথেষ্ট অভাব দেখি। আমাদের মনে হয়, একটু যত্ন সহকারে নাটক লিখলে, শ্রীবিশীর সাহায্যে বাংলা নাটক নতুন কিছু পেতে পারত! কিন্তু যা পাইনি, তার জন্য দুঃখ করা নিরর্থক।

● বিধায়ক ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগেও যিনি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই নট ও নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন চল্লিশের দশকে। সামাজিক নাটকই বিধায়কবাবু লেখেন এবং সামাজিক উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন তিনি। বিধায়কবাবুর নট পরিচয় খুব অনুজ্জ্বল নয় (কতকটা নরেশ মিত্রের মতো তাঁর বাচনকলা), তথাপি নাট্যকার হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত।

বিধায়ক ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত আছেন—এর ফলস্বরূপ কতকগুলি গুণাগুণের অধিকারী হয়েছেন তিনি। তাঁর নাটক

দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে—বক্তব্য বিষয়কে অভ্রান্তভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, নাটকের গঠনে কোথাও শৈথিল্য নেই এবং মনোরম সংলাপ ব্যবহারে তিনি সিদ্ধকাম। সর্বোপরি বিধায়ক ভট্টাচার্যের সমগ্র শিল্পকর্মকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক হাস্যরস-রসিক মননশীলতা। বিধায়ক ভট্টাচার্যের চরিত্রগুলি অধিকাংশই আমাদের পরিচিত জগতের মানুষ। এদের সুখদুঃখকে তিনি ঔপন্যাসিকের মতো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন কয়েকটি শাণিত সংলাপের সাহায্যে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নাটক লেখেন শ্রীভট্টাচার্য -অথচ কি নিটোল বৃত্তই না তিনি সৃষ্টি করেন।

শিশিরকুমারের প্রযোজনায় 'তাইতো' নাটকটি শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয়। 'তাইতো' হাস্যরসবহুল মিলনান্ত নাটক। এই নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রীরা হলো—জীবনময়, মল্লিকা, বল্লিকা ও সমর। জীবনময় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মানুষ। তাঁর দুই শিক্ষিতা ও সাহসিকা কন্যা মল্লিকা ও বল্লিকা। মামার সম্পত্তি পেয়ে হঠাৎ বড়লোক সমরের ('বিধবা বিবাহ না করিলে মামার সম্পত্তি পাইব না') চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সাহসিকা মল্লিকা বিধবার বেশে সমরের সঙ্গে দেখা করেছে। এর আগে সমরের সঙ্গে মল্লিকার দেখা হয়েছিল এক উদ্ভট পরিস্থিতিতে। সমর মল্লিকাকে চিনতে পারে। এতে সে ভীত হয়। শেষ পর্যন্ত মালবিকা মালাকারের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচবার জন্য সে মল্লিকার শরণাপন্ন হয়। মল্লিকা-সমরের মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বল্লিকা ও সুভাষের (সমরের বন্ধু) মিলন হলো।

বিধায়কবাবুর 'তাইতো' দীর্ঘদিন অপেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীদের কাছে আদরণীয় হয়েছিল। আজও এই নাটকটির চাহিদা আছে। কিন্তু এই চাহিদা থেকে প্রমাণ করা যাবে না যে 'তাইতো' একটি উৎকৃষ্ট নাটক।

আসলে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য অতি-আধুনিক নাট্যকারদের মতো জীবনের গহনে তলিয়ে যেতে পারেননি। পাপকে তিনি পাপ বলে স্বীকার করেন, মানুষের 'ক্ষুধা' নিয়ে তিনি কথা বলেন, তাঁর দৃষ্টি আমাদের 'মাটির ঘরে'র কাছে নেমে আসে—সবই সত্যি, কিন্তু নাট্যকার ভট্টাচার্য গভীরচারী হতে পারেন না। দর্শকের আসন থেকে ঘন ঘন হাততালিতে কুশীলবেরা অভিনন্দিত হতে পারলেই বিধায়কবাবু খুশি হন—এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশাও যেন তাঁর নেই।

● তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই শতাব্দীর শক্তিধর ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি নাট্যরচনায় ব্রতী হন। বাংলা নাট্য সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের চাইতে তারাশংকরের দান খুবই অকিঞ্চিৎকর। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অন্তর্লীন নাটকীয়তা

নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তারাশংকরের উপন্যাসগুলি তুলনায় অনেক বেশি বর্ণনাধর্মী ও বক্তব্য-প্রধান হওয়ায় নাট্যকার তারাশংকরকে সাহায্য করতে পারেনি।

তথাপি, তারাশংকরের 'দুইপুরুষ' বা 'কালিন্দী' নাটকের একাধিক অপেশাদারী অভিনয় আমরা দেখেছি। আজও কদাচিৎ আফিস রিক্রিয়েসন ক্লাবগুলি এই নাটকগুলির অভিনয় করেন। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। তারাশংকরের আঞ্চলিক ভাষা, নাটকের গল্পরস নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এখনও নতুন। সাধারণ দর্শক প্রেক্ষাগৃহে বসে গল্পের পর গল্প দেখতে ও শুনতে চান—তারাশংকর অনায়াসে এই দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারেন—নাটকের আঙ্গিককে উপেক্ষা করেই। ফলে নাট্যকার তারাশংকরকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের গৌণ নাট্যকারের তালিকায় রাখতেই হবে।

● মনোজ বসু

তারাশংকরের মতো মনোজ বসু প্রধানত ঔপন্যাসিক হয়েও নাট্যকার। তবে তারাশংকরের চাইতে মনোজ বসুর নাট্যকার পরিচিতি অধিক। নাট্যবর্ণিত বিষয়ের গৌরব তো আছেই, আছে অপরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশ, এবং গভীর জীবনদৃষ্টি ও নাট্যশিল্পের সক্ষম অবতারণা। মনোজ বসু তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্যে সরাসরি মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে অংক ও দৃশ্যসংখ্যা কমিয়ে একটি সেটে পাত্রপাত্রীকে সুকৌশলে এনে নাটকীয় গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। আধুনিক নাট্যকারদের মতো তিনি নাটকের মধ্যে বিস্তৃত ও অনুপুংখ মঞ্চনির্দেশ দিয়েছেন।

'প্লাবন' নাটকটি একদা বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চকে প্রভুত সাহায্য করেছিল। এবং নাটকটির অভিনয়ের সঙ্গে বাংলা নাটকের শক্তি ও সীমা বলয়িত হয়েছিল। 'প্লাবনে'র বিষয়বস্তু যেমন আধুনিক, পরিবেশ বা সংলাপও তেমনি সহজ। বাংলা নাটক যে ক্রমে ক্রমে আধুনিক সমস্যার অনুবর্তী হতে চাইছিল তা মনোজ বসু প্রমুখের কয়েকটি নাটক পাঠেই অনুভূত হয়।

'প্লাবন' নাটকের কাহিনীতে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে দ্বিমুখী প্লাবনের কথা বলা হয়েছে। সর্বনাশা 'প্লাবন' যেমন মানুষের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহকে ভেঙে চুরমার করে দেয় তেমনি তা পারে আমাদের পরিচয়কে টুকরো টুকরো করে দিতে। এই নাটকের নিশারাণী এক সর্বনাশা প্লাবনে স্বামীকে হারিয়ে শেখরকে পেয়েছে। শেখরের আশ্রয়ে সে দীর্ঘ পনেরো বছর অতিবাহিত করার পর হঠাৎ তার স্বামীকে ফিরে পায়। এতে 'নিশারাণী'র জীবনে এবং সামগ্রিকভাবে

নাটকের সকল পাত্র-পাত্রীর ওপরে যে মহাপ্লাবন প্রবাহিত হলো—'প্লাবন' নাটকের তাই-ই প্রতিপাদ্য।

'প্লাবনে'র কিছু কিছু ত্রুটি আছে। নিশারাণীর সঙ্গে সবিতার স্নেহ সম্পর্কের কোনো দৃষ্টান্ত নেই; কমলেশ ও নীলাম্বরের সঙ্গে তার বিরোধের ছবিটি খুব স্পষ্ট ও জোরালো নয়। শেখরের কাছে নিশারাণীর কৃতজ্ঞতা বোধ যেটুকু থাকা উচিত ছিল তা নেই। কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও 'প্লাবন' একটি চমকপ্রদ ও গতিশীল নাটক।

কিন্তু 'প্লাবনের' বক্তব্যকে মনোজ বসুর মৌলিক সৃষ্টি বলে উল্লেখ করতে আমাদের আপত্তি আছে। এর কারণ, বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'মধুমতী' রচনাটির সঙ্গে (১৮৭৪) 'প্লাবন' এর কাহিনীর কতকটা মিল আছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি 'প্লাবন' নাটকের মতো 'মধুমতী'তেও বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে প্লাবনের ছবি আছে। 'মধুমতী'কে ছোটগল্পের গবেষক ড. ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প' আখ্যা দিয়েছেন।

● মহেন্দ্র গুপ্ত

সু-অভিনেতা ও জনপ্রিয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত গতযুগ ও এযুগের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে সবিস্তার অভিজ্ঞান রেখেছেন। সেকালে ও একালে তাঁর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পেশাদারী নির্দেশক খুব কম চোখে পড়ে।

মহেন্দ্র গুপ্ত নাটক লিখতে শুরু করেন চল্লিশের দশকে। তাঁর 'মাইকেল' নাটকটি রঙমহলের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে 'মাইকেল' জনবন্দিত হয়। এ পর্যন্ত মহেন্দ্র গুপ্তের মৌলিক নাটক বা উপন্যাসের নাট্যরূপগুলি অসফল হয়েছে বলে শুনিনি। তাঁর 'টিপু-সুলতান', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'রাণী ভবানী', 'রাণী দুর্গাবতী' এককালে বিস্তর জনবন্দনা পেয়েছিল। সম্প্রতিকালে মিনার্ভা মঞ্চে সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাসের নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত আমাদের বিস্মিত করেছেন। দৃশ্য পরিকল্পনায়, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় এবং অবশ্যই গ্রন্থনায় মহেন্দ্র গুপ্ত মহান সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নাট্যরূপদাতাকে নিশ্চয়ই আমরা মৌলিক নাট্যকারের সম্মান দিতে পারি না। কাজেই জনপ্রিয় নাট্যকার হয়েও মহেন্দ্র গুপ্ত বড়ো নাট্যকার নন।

● দেবনারায়ণ গুপ্ত

মূলত, জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যের নাট্যরূপ দিয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি গৌণ আসন দখল করে নিয়েছেন। শিশির-অহীন্দ্র যুগের শেষলগ্নে তিনি নাট্যচর্চা শুরু করেন। পরে সেই নাট্যচর্চা স্টার থিয়েটারে,

সলিল মিত্রের আমলে বিবর্ধিত হয়। দেবনারায়ণ গুপ্ত শুধু নাট্যকার নন, নাট্যনির্দেশক পরিচয়ও তাঁর আছে। বর্তমানে এই গুণী মানুষটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

দেবনারায়ণ গুপ্তের অন্যতম গুণ হলো—পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সম্পর্কে, কুশীলব ও দর্শক সম্পর্কে গভীর দূরদর্শিতা। উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়া অঞ্চলে তিনি বাস করতেন বলে শহর কলকাতার রুচি পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁর অধিগত। এছাড়া শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত জানেন,

"উপন্যাস ও নাটকের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন।"

[শ্যামলী নাটকের ভূমিকা
২২ পৌষ, ১৩৬০]

দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপকৃত জনপ্রিয় নাটকগুলি হলো—'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'অনুপমার প্রেম', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত', 'শ্যামলী', 'একক দশক শতক', 'ডাকবাংলো', 'শ্রেয়সী'। তাঁর মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে 'শর্মিলা', 'দাবি' একালেও বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে আমাদের একটি প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। তা হলো: নাট্যকার শরৎচন্দ্র বা নিরুপমা দেবীর ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি তিনি—আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালার সর্বাধিনায়ক হয়েও, দেবনারায়ণ গুপ্ত সাধারণ দর্শকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

● তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'শ্রীরঙ্গম' অধ্যায়ে যে দুজন স্বল্পখ্যাত নাট্যকার শুধু শিশিরবাবুকে সাহায্যের জন্য কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্যে তারাকুমার ও জিতেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। তারাকুমারের 'জীবনরঙ্গে'-এর মধ্যে আধুনিক মঞ্চ থেকে আধুনিক প্রযোগাচার্যের দাবি ঘোষিত হয়েছিল, আর জিতেন্দ্রনাথ চেয়েছেন নাট্যকাহিনীকে আধুনিক উপায়ে উপস্থিত করতে। জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম 'পরিচয়'। 'পরিচয়' সম্পর্কে শিশিরকুমারের বেশ দুর্বলতা ছিল। 'পরিচয়' নাটকটিকে পরিচালিত করার জন্য শিশিরকুমার লিখেছেন,

"সমাজের বিবেকবুদ্ধি, সামাজিক চিন্তার ধারা, সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ যে নাটকের প্রাণ (motif) তাকেই প্রকৃত সামাজিক নাটক বলা চলে। বর্তমান নাটকে সেই লক্ষণগুলি সরলভাবে পরিস্ফুট। তাই নাটকখানি

অপরিচিত লেখকের হলেও আমার রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন ধরে অভিনয় করেছিলাম। ইতি—

প্রয়োগকর্তা
শিশিরকুমার ভাদুড়ী

'পরিচয়' সম্পর্কে শিশিরকুমার প্রদত্ত এই সার্টিফিকেট পাঠে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নিশ্চয়ই কোনো 'আহা মরি' বিষয় নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু 'পরিচয়'-এর সবিশেষ পরিচয় নিলে ভগ্ন মনোরথ হতে হয়। শিশির-কুমার-সমসাময়িক বাংলাদেশের মানুষ 'পরিচয়' নাটকের পাত্রপাত্রীরা—এ তথ্য সত্য। কিন্তু যাদের পরিচয় নিয়ে জিতেন্দ্রনাথ মাথা ঘামিয়েছেন তারা কি একান্তই কোনো সমস্যার কারণ? রায়বাহাদুর শশাংক চাটুজ্যে বা রায়বাহাদুর অনন্তলালেরা কোন্ সামাজিক বিবেক বা কোন্ সামাজিক চিন্তার ধারা নিয়ে এসেছেন 'পরিচয়' নাটকে? আপন সন্তানকে পিতৃপরিচয় দিলে বা গুলি ছুঁড়লে অথবা—

"জন্মেছি হিন্দুর ঘরে, মানুষ হয়েছি মুসলমানের ঘরে কিন্তু সৃষ্টি করব আরও একটা বৃহত্তর ঘর, মহামানবের ঘর। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চারিদিকে চারটি জানালাই খোলা থাকবে।" (৩।৩) - প্রভৃতি সংলাপ ব্যবহার করলে বর্তমানকালের নাটক হয় না। যা হয় তা হলো মনোহর নাটক। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অতি সাধারণ দর্শক যাকে প্রত্যক্ষ করে অভ্যাসবশত বলে ওঠেন 'এনকোর'।

'পরিচয়' নাটকটিকে পরিচায়িত করার পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ্য আছে। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই. প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার মহৎ প্রতিভার অধিকারী হলেও নটজীবনের উপান্তে এসে আধুনিক কালের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের 'আলমগীর' শেষ জীবনে 'পরিচয়' নাটকের শশাংক চাটুজ্যে হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে ভেবেছেন বুঝি তিনি সত্যিকারের সাধারণ মানুষ হয়েছেন। এটি শিশির-জীবনের মারাত্মক ভুল। তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না যে 'পরিচয়' নাটকের শশাংক চাটুজ্যে একজন 'রায়বাহাদুর'। ভেবে দেখলেন না যে, শশাংক চাটুজ্যে আরও বৃহত্তর পর্যায়ে গেলে অনায়াসে 'আলমগীর' হয়ে উঠতে পারেন। প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার আরো ভেবে দেখেননি যে, 'পরিচয়' নাটকে অভিনয় করে, ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহী দর্শক থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। 'পরিচয়' বাংলা নাটকের দারিদ্র্য কিছুটা ঢাকতে পেরেছে ঠিকই, তবে শিশিরকুমারের যোগ্য নাটক হ'তে পারেনি। দোষ জিতেন্দ্রনাথের নয়, সব ত্রুটি শিশির-কুমারেরই। তিনি স্বল্প প্রতিভাধর নাট্যকারকে মাথায় তুলেছেন।

এইখানে একটি কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, নাট্যকার জিতেন্দ্রনাথ পথভ্রষ্ট না হয়ে সমগ্র নাট্যবস্তুকে তিন অংকে বাঁধতে পেরেছেন। আধুনিক নাট্যকার-সুলভ মঞ্চনির্দেশও তাঁর নাটকে আছে। যথা,

"চারটে বেতের চেয়ার ও মাঝখানে গোল বেতের টেবিল। চা খাওয়া চলছে। ডাঃ আলি ও নরেশ। নিভা ও শুভা। শুভা বিশ বছরের অবিবাহিত মেয়ে। সুশ্রী। নয়নে নির্ভীক দৃষ্টি। নিভা চা ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। শুভা সামনের দোলনায় দোল খেতে খেতে গান গাচ্ছে। একপাশে খানসামা দাঁড়িয়ে আছে।" (২১)

এছাড়া আমাদের মনে হবার বিশেষ কারণ আছে যে কোনো কোনো সংলাপ যেন শিশিরকুমারেরই মুখনিঃসৃত। ফলে 'পরিচয়' নাটকের সংলাপের মধ্যে একটা মননশীলতা বর্তমান। এই গুণগুলি স্বীকার করেও হাল আমলের নাটকের সঙ্গে 'পরিচয়'এর তুলনা করতে পারছি না।

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের (১৯২১-৪৩) কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের কথা আলোচনা করা গেল। এইসব নাট্যকারের কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চমানের নাটক যে পাইনি তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে মান হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত হবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী মঞ্চের সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হননি কোনদিনই।

উচ্চমানের পাঠ্য নাটক না পেলেও গত যুগের নাট্যকারেরা বিষয়বৈচিত্র্যে, সমাজচেতনায়, চরিত্রসৃজনে, গঠনচাতুর্যে ও মঞ্চসচেতনতায় গিরিশযুগকে অতিক্রম করেছেন। আশার কথা, এঁরা বারবার বলেছেন এবং চেষ্টা করেছেন যে 'আধুনিক কালের জন্য আধুনিক নাটক লিখতে হবে।' এঁরা অনেকেই সচেতনভাবে দেখেছেন, কালে কালে নতুন দর্শক সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন দর্শকদের জন্যই বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায় প্রভৃতিরা তৎপর হয়ে নতুন নাটক লিখতে প্রাণিত হয়েছেন। ফলে বাংলা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক নাটকে নতুন কালকে স্বাগত জানাতে দেখেছি।

আলোচ্য অধ্যায়ের নাট্যকারদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েও আমাদের কিছু অভিযোগ পেশ করতে চাই। অনেকগুলি অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ হলো এই যে, আলোচ্য কালপর্বের নাট্যকাররা গতানুগতিক নাট্যধারাকে বর্জন করতে শিখলেও আবেগপ্রবণতা, ভাবালুতা ও রোমাণ্টিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। যদি পারতেন, তাহলে বাংলা নাটক সম্পর্কে প্রভৃত দোষারোপ থেকে আমরা বিরত থাকতাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংলাপ

বাংলা নাটকের সংলাপ বিষয়নিষ্ঠ আলোচনার দাবী রাখে। এর বিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা চিরাচরিত প্রথায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ বা সাহিত্য গুণান্বিত সংলাপকে আদর্শ বিবেচনা করে থাকি। অতি সম্প্রতিকালে 'বাংলা নাটকের সংলাপ : এক শতাব্দী'[৪৮] আলোচনায় ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সংলাপ বিচারের এই সনাতন পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা সবিনয়ে জানাতে চাই, নাট্যসংলাপ বিষয়ভেদে বহুমুখী হতে পারে। নাটকের বিষয় যেখানে দুর্ভিক্ষ জর্জরিত গ্রামীণ মানুষ, সেখানে কাব্যগুণান্বিত নাট্যসংলাপ চলবে কি ? নাটকের ভাষায় স্থানে স্থানে কাব্যের ছোঁয়া থাকবে ঠিকই, কিন্তু 'রক্তকরবী'র সোনাঝরা সংলাপগুলি সেখানে অচল। বলাবাহুল্য, মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকলে রবীন্দ্রনাথের সংলাপকেই আদর্শ বিবেচনা করা স্বাভাবিক। এবং এইটাই আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস।

প্রচলিত ধারণাকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাঠিয়ে যদি আমরা অপরেশচন্দ্র থেকে জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'পরিচয়' পর্যন্ত বাংলা নাটকের সংলাপ বিচার করি, তাহলে দেখব বিষয়ানুযায়ী নাট্যসংলাপের দিক থেকে একটি পালাবদল ঘটেছে। গিরিশচন্দ্রের যুগে নাট্যসংলাপ নিয়ে পরীক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে স্বল্প শক্তিধর নাট্যকারেরাও সংলাপ নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছেন। এর কারণ হিসেবে—সামাজিক পালাবদল ও নাট্যকারদের মঞ্চ ঘনিষ্ঠতাকে চিহ্নিত করা যায়।

নাটকের সংলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম উল্লেখ করতে হবে। বিগত যুগের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এ যুগে নাটক লিখতে বসে নাট্যসংলাপের প্রতি তেমন মনোযোগী হতে পারেননি। তাঁর পৌরাণিক নাটকের সংলাপ (যেমন, 'নরনারায়ণ' এর) বিশেষত্ব বর্জিত। কাহিনী কথনের দিকে অধিক সচেতন হওয়ার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটকের মাধুর্যকে নষ্ট করেছেন।

তবে, ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ নির্মিতিতে পরিণত ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যভাষা অধিকাংশ স্থলে প্রসাদগুণ লাভ করেছে। 'আলমগীর' নাটকের এক যায়গায় উদিপুরীর প্রশ্নের উত্তরে আওরঙ্গজেব বলছেন,

"বাদশার অন্দরে যে রূপ নেই, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য তুচ্ছ মূল্যে খরতার উপভোগ্য হবে, এটা কল্পনাতেও সহ্য করতে পারলুম না। সেই

জন্যই ভূস্বর্গের উদ্যানের এক আবর্জনাময়, অংশ থেকেও এই অনাঘ্রাত কুসুমটিকেও তুলে এনেছিলুম।” (২।৩)

এ ভাষা একদিক থেকে যেমন নাটকীয় অন্যদিক থেকে তেমন সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ও বেগশালী। বলা বাহুল্য আলমগীরের সংলাপে কালিদাসের উপমাটি যত্ন করে বসিয়ে দিয়েছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং তা সসম্মানে উপযুক্ত আসন দখল করেছে।

তবে, ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ একেবারে নির্দোষ নয়। দীর্ঘ সংলাপ তিনি ব্যবহার করেন—নাট্যকারের সংযমকে উপেক্ষা করেই এবং শেষদিকের ঐতিহাসিক নাটক 'আলমগীর'-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে অধমর্ণ। 'আলমগীর' নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যে আওরঙ্গজেবের মুখে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিম্নলিখিত সংলাপগুলি বসিয়েছেন,

“......তবু এ মিলনের অভিলাষ—হে কবি, বছর যাক্ যুগ যাক্ বহু শতাব্দী চলে যাক্ শতাব্দীর পারে, একদিন তোমার তুলিকা মুখে আলমগীরের এ মিলন অভিলাষ—হিন্দু মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমান—একবার আলিঙ্গন করি।” (৫।১২)

আলোচ্য সংলাপের ভাব ও ভাষাকে দ্বিজেন্দ্রলালের বলে দাবি করলে খুব অন্যায় হয় কি?

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপের প্রভাব যে কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ আছে শতাধিক নাটকে। এই নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম একটির নাম হলো 'মিসরকুমারী'। নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত অক্ষরে অক্ষরে দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুসরণ করেছেন সংলাপে—

“তোমরা (অর্থাৎ মিসরীরা) এই যে কাফ্রী জাতিটার উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত অত্যাচার কচ্ছ, তার হিসেব রাখ: তোমাদের অপরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর নড়ে ওঠে, মরা মানুষ শতবর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্তে শিউরে জেগে ওঠে। তোমাদের এই সব জুলুমের বিরুদ্ধে যদি আমরা একটি মুখের কথা কই, কি একটি আঙ্গুল তুলি, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ হয়।” (১।৫)

বরদাপ্রসন্নের দ্বিজেন্দ্র-অনুসৃতিকে আমরা নিন্দা করতে পারি না। কারণ বিশ শতকের প্রথম পাঁচটি দশকের মধ্যে তিনটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নবমূল্যায়ন ঘটেছিল। একালের সুবিখ্যাত নাট্যাচার্যরা ও স্বল্প শক্তিধর নাট্যকারেরা একরকম দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আনত হয়ে পড়েছিলেন। (অকালে লোকান্তরিত

হওয়ায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আধুনিক-স্বীকৃতিটুকু দেখে যেতে পারলেন না।) দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বীকৃতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে নানাদিক থেকে আধুনিকতার পত্তন হলো। তার মধ্যে 'সংলাপে' আধুনিকত্ব অন্যতম।

নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র দীর্ঘকাল বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে সংলাপ রচনার কৌশলটি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ নির্মিতিতে অপরেশচন্দ্রের কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে তাঁর সৃষ্ট নাট্যভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হতে পেরেছে। নাট্যসংলাপ রচনায় অপরেশচন্দ্রের কৃতিত্ব স্বগত সংলাপ বর্জনে ও গতিশীলতা অর্জনে। অপরেশচন্দ্রের নাট্যভাষা আবেগমন্দ্র ও গতিশীল। আর্ট থিয়েটারের অদ্বিতীয় ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র নাট্যভাষাকে নানাদিক থেকে উজ্জ্বল করার জন্য কখনও গিরিশচন্দ্র কখনও দ্বিজেন্দ্রলাল আবার কখনও রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাষার অনুগামী হয়েছেন। তবে, অপরেশচন্দ্রের নাট্যভাষার ওপর গিরিশচন্দ্রের প্রভাব নিঃসীম। প্রসঙ্গত, আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারে 'মন্ত্রশক্তি'র 'মৃগাংক' অভিনয়কালে অপরেশচন্দ্রকে সংলাপ নির্মিতির জন্য সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। নিম্নে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুনে' ব্যবহৃত দুটি সংলাপের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রথমটিতে গিরিশ-শিষ্য অপরেশচন্দ্রকে পাওয়া যাবে, দ্বিতীয়টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত অপরেশচন্দ্রের দেখা মিলবে।

ক. ঐ চ'লে গেল—
তরুণ-ভাস্কর সম কান্তি মনোহর,
অক্ষয় কবচধারী
মণিময় কুণ্ডল শোভিত গণ্ড,
সেই সদ্যঃ প্রসূত সন্তান আমার,
চাঁদমুখে সেই মৃদু হাসি
লোকলজ্জা—ভয়ে যারে,
তাম্র টাটে সলিলে ভাসায়ে দিছি—
জ্ঞানহীনা পাষাণী জননী! (১১৬)

খ. "তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি—ঐ আগুনের শিখা লক্ লক্ ক'রে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে। ঐ আর্তনাদ—ঐ হাহাকার! হাঃ হাঃ শকুনি! আনন্দ কর—গান্ধারী কাঁদছে, তোমার মুখের হাসি যেন কখনো না ফুরোয়!" (২১২)

গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব থাকলেও অপরেশচন্দ্রের কৃতিত্বে উপরোক্ত নাট্যসংলাপগুলি একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের রচনা বলে প্রতিভাত হচ্ছে। সংলাপ রচনার দিক থেকেও যে একটা পালাবদল ঘটেছিল এটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কিন্তু এহ বাহ্য।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাট্য সংলাপগুলির নাটকীয়তা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। তাঁর নাট্যসংলাপকে সাধারণ গদ্য সংলাপ বললে অত্যুক্তি হয় না। এর কারণ শচীন সেনগুপ্ত যতটা তাত্ত্বিক, ততটা নাট্যকার নন। তুলনায় যোগেশ চৌধুরীর নাট্য রচনায় একটা আবেগগত মূল্য, গতিশীলতা ও কাব্যগুণ বিরাজমান। 'সীতা' নাটকের রাম চরিত্রের মুখে শুনতে পাই,

> "সেই নীল নলিন-নয়ন দুটি
> আঁখি তারকায় সেই স্নিগ্ধ
> অমৃত পরশ! বালক, বালক,
> হেন রূপ কে তোমারে দিল,—
> কোন্ মাতৃ-বক্ষ হ'তে
> উচ্ছ্বসিত স্নেহ-রস ধারা
> করি পান—ভুবনমোহন
> দিব্য রূপ পাইয়াছ?" (৩।২)

সু-অভিনেতার কণ্ঠে এই কাব্যগুণান্বিত সংলাপগুলি আজও আমাদের শুনতে ভাল লাগে। বিশেষ করে উপরোক্ত সংলাপগুলির সঙ্গে শিশিরকুমারের নাম অভিন্ন হয়ে আছে। যোগেশচন্দ্রের নাট্যে অশেষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর নাট্য-সংলাপগুলির প্রাণপ্রাচুর্যের কথা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সামাজিক নাটকের ভাষাতেও যোগেশচন্দ্র কৃতিত্বের অধিকারী। উত্তর কলকাতায় বাস করতেন বলে নাট্যসংলাপেও তার প্রভাব পড়েছে। ফলে ভাষা হয়েছে অনিবার্যভাবে মিষ্ট ও গতিশীল। সামাজিক নাটকের সংলাপে যোগেশচন্দ্র বা অপরেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্রকেও অতিক্রম করেছেন। গিরিশচন্দ্রের সংলাপে যে ঈশ্বর গুপ্ত সুলভ শব্দসম্ভার ছিল, যে সামান্য লঘু শব্দের প্রয়োগ ছিল—তা গিরিশোত্তর কালে—শিষ্যবর্গের সাহায্যে শিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপরেশচন্দ্র বা যোগেশ চৌধুরীরা এর প্রমাণ।

নাট্যকার মন্মথ রায় দীর্ঘকাল নাট্যচর্চা করেছেন। তাঁর নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে যথার্থরূপে পালাবদলের স্বরূপটি বুঝতে পারা যাবে। মন্মথ রায়ের নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্য হলো—চরিত্রানুযায়ী ও পরিবেশানুযায়ী সংলাপ। এবং অধিকাংশ স্থলে সংলাপগুলি ছোট ও কাটা কাটা। মঞ্চের সুবিধা-

অসুবিধার দিকটি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত, আবার সুযোগ বুঝে সংলাপকে কাব্যমুক্তি দিতে তিনি প্রস্তুত। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,

"তাঁর সংলাপ যেন উত্তপ্ত নদীর ধাবমান তরঙ্গপ্রবাহ, এক একটি শব্দ যেন এক একটি অগ্নিতরঙ্গ। বাক্যগুলি যেন ঝটিকার প্রমত্ত আবেগে ছুটে চলেছে। বিরুদ্ধ উক্তি, অসমাপ্ত শব্দ ও বাক্যাংশ, বিশেষ বিশেষ কথার পুনরুক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর সংলাপ নাট্যবেগসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। শুধু...নাটকীয়তা নয়, তাঁর সংলাপ উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনা ও রমণীয় সৌন্দর্যের মায়াপুরী নির্মাণ করে।"[৪৯]

মন্মথ রায়ের নাট্যসংলাপ রচনার কৃতিত্বটুকু বুঝে নেবার জন্য তিনটি নাটকের ('চাঁদ সদাগর', 'কারাগার', 'ধর্মঘট') তিনটি অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

ক. "চাঁদ। নিয়তি নিয়ে এসেছে। নিয়তি নিয়ে এসেছে। আমি আসিনি—নিয়তি নিয়ে এসেছে। মধুকরে নয়, রাজপথ দিয়ে নয়, সিংহদ্বার দিয়ে নয়—খিড়কির পথে—এই ছিন্ন-ভিন্ন বেশে। দিনে নয়, চক্ষুলজ্জা জয় করতে পারলুম না—তাই এলুম রাত্রে—চোর হয়ে—চোরের মত।

সনকা। ওগো এত কষ্টও ছিল। সপ্তডিঙ্গা মধুকর নেই?
চাঁদ। না, নেই। তাদের রেখে এসেছি সাত সমুদ্রের অতল তলে।
সনকা। তোমার যে বড় সাধের মধুকর।
চাঁদ। হারিয়েছি। হারিয়েছি। আমি সব হারিয়ে এসেছি।
সনকা। কিন্তু আমি হারাইনি। আমি পেয়েছি।..." (২/৩)

[১৯২৭ সালে রচিত]

খ. "কংস। ওরা যে আমার পায়ের পাদুকা, একথা কু-লোকে বলে। ওরাই আমার মণি। আমার জন্যে ওরা ধর্ম্ম ছেড়েছে—
নরক। না সম্রাট, ঐখানে এখনো একটু 'কিন্তু' আছে। ধর্ম্ম ছেড়েছে বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়েনি হাত একটু কেঁপেছিল—
কংস। (সপদদাপে) কাঁপেনি। কাঁপলেও সে মুহূর্তের দুর্বলতা মাত্র। বিশ্বাস করছ না?...দেখবে?" (২/১)

[১৯৩০ সালে রচিত]

গ. "জনার্দন। ইব্রাহিম! ভাই আমার। আমাকে ক্ষমা কর। চল আমরা গিয়ে বলি, দুনিয়ায় দুটো জাত—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়—দুনিয়ায় দুটো জাত—ধনিক আর শ্রমিক।—

ইব্রাহিম। তুমি আমাদের সর্দার,—যা বলতে হয়, গিয়ে তুমি বল। আমি চললাম—মায়াকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তারও আগে আর একটা কাজ আছে। (হারাণের উদ্দেশে) তুই দালাল – তুই কুত্তা – তোর গায়ে হাত দোব না—তোকে ছোঁব না। তোর মুখে থুথু দোব।"

চতুর্থ দৃশ্য, [১৩৬৩ বঙ্গাব্দে রচিত]

বিশ শতকের বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে বাংলা নাটকের সংলাপ যে কতখানি বদলে গেছে তা মন্মথ রায়ের নাটকগুলি সাল তারিখ মিলিয়ে পাঠ করলেই বুঝতে পারা যাবে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'পরিচয়' (১৯৫১) নাটকের সংলাপগুলি পাঠ করলে বা শুনলে অতি আধুনিক সামাজিক নাটকের সংলাপ-গঙ্গোত্রী খুঁজে পাওয়া যাবে। নাট্যাধিনায়ক শিশিরকুমারের সহযোগিতায় জিতেন্দ্রনাথ হাল আমলের মঞ্চোপযোগী সংলাপ রচনা করতে সমর্থ হন। এই ধরণের সংলাপে কতটা সাহিত্যগুণ আছে তা আমরা জানিনা, তবে বেশ বুঝতে পারি যে এতে আধুনিক নাটক বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না।

"আলি – গুলি ছুঁড়ল কে ?

শশাংক — আভা।

আলি—আভা ?

নরেশ—কেন— ?

শশাংক—(আস্তে আস্তে একটি একটি করে) কারণ-গুলি দিয়ে-সে-নিজেকেই-শেষ-করে দিয়েছে।

আলি—না-না-না হতে পারে না—হতে পারে না। এইত সে হাসছিল। এইত সে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, হতে পারে না। সে আত্মহত্যা করতে পারে না।

শশাংক—মহম্মদ আলি। মহম্মদ আলি। একটু কাছে এস।

আলি—আপনি নিজে তাকে গুলি করেছেন। নিশ্চয়ই করেছেন। আপনি সব পারেন।

শশাংক—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি সব পারি। সব পারি। তবু-তবু-সেই নিজেকে নিজে গুলি করেছে। নিজ হাতেই আত্মহত্যা করেছে। কেন তা বলছি শোন। তোমাকেও তা বলবার দরকার হয়েছে। আমি কি কাঁদছি না—আমি-কি কাঁদছি না—এই দেখ—আমি কাঁদছি না।" (৩।৩)

নাটকের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান হয়নি এইখানেই। এর পরেও নাট্যসংলাপের দিক থেকে আরও এক পালাবদলের কথা আমাদের বলতেই হবে। অবশ্য সে প্রসঙ্গে পৌঁছতে আরও কিছুটা বিলম্ব আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যানুষঙ্গ

আলোচ্য কালসীমায় নাটকে যেমন যতির মধ্যেও বিবর্তনের অনিবার্য গতি ক্রমশ সঞ্চরমান হয়ে প্রবাহের দিশা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, ক্ষীণ হলেও সেই ধারারই অভিঘাত জনিত কম্পন বিভিন্ন অনুষঙ্গে প্রবাহিত হলো। মঞ্চ উপস্থাপনায় নাটকগুলিতে ব্যবহৃত মঞ্চ সঙ্গীত / গান, মঞ্চ-দৃশ্য-আলোক, মেক্‌আপ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও উপযোগিতার নিরিখে প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনার আভাস পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই পর্বের আলোচনার সমাপ্তি লগ্নে, প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের স্বল্প পরিসরে হলেও, ক্রমানুসারী আস্বাদনে এবার প্রবৃত্ত হতে পারি

॥ গান ॥

উনিশ শতকীয় পদ্ধতিতেই নাটকে গান ব্যবহার করেছেন অপরেশচন্দ্র বা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। এঁদের অনেকগুলি নাটকই মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছে। কাজেই ধরে নিতে অসুবিধে নেই যে, বিশ শতকেও নাটকের মধ্যে গান (নাট্যসঙ্গীত নয়) ব্যবহারের ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। এবং দর্শকের কাছে আলাদা করে গানের (নাট্যবহির্ভূত) মূল্য ছিল। আমাদের এই অনুমানটি আংশিক সত্য।

অপরেশচন্দ্র, যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশিকান্ত বসুরায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এমন কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা গতানুগতিক পথ ধরে গান রচনা করলেও বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বাংলা নাটকে গানের পরিমাণ কমে এসেছিল। তবে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ একশ্রেণীর দর্শকের (এঁরা মনেপ্রাণে উনিশ শতকীয়) কাছে গানের জন্য গানের প্রয়োজন তো ছিলই।

বাংলা নাটকে (১৯২১ ১৯৪৪) গানের পরিমাণ হ্রাসের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। এই কারণগুলি হলো—

ক. একাধিক জনপ্রিয় নাট্যকারের গান রচনার অক্ষমতা। বিগত যুগের নাট্যকারেরা ছিলেন প্রায় একই সঙ্গে কবি ও নাট্যকার। কিন্তু আলোচ্য অধ্যায়ের নাট্যকারেরা প্রধানত, নাট্যকার। এই কারণেই গান রচনার জন্য নাট্যকারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। যেমন শচীন সেনগুপ্তের অনুরোধে নজরুল গান বেঁধেছেন আবার মন্মথ রায়কে সাহায্য করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, নজরুল ও নরেন্দ্র দেব।

খ. গতযুগের অধিকাংশ নট বা নটী গান গাইতে পারতেন। এযুগে গান জানা অভিনেতা খুঁজতে হয়েছে। এছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাচ্ছে যে গান জানা নট বা নটী দিয়ে মঞ্চ চালাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। (স্মরণীয়, রঙমহলে কৃষ্ণচন্দ্র দে থাকা সত্ত্বেও নাটক বেশিদিন চলেনি)।

গ. আসলে নাটকের বিষয়গত পরিবর্তন আসার ফলে, নাট্যসঙ্গীতের প্রকৃত মর্মোদ্ধার হওয়ায় এবং তথাকথিত সাধারণ যাত্রার রীতিপদ্ধতি থেকে সরে আসার জন্য গানের উপযোগিতা বিজ্ঞানের নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হলো।

আমরা পেশাদারী মঞ্চের অযৌক্তিক নাট্যসঙ্গীত (?) নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণ সমর্থন করেছি ও করছি। কারণ নাটকের নামে কয়েকটি শ্রবণ-সুভগ সঙ্গীত পরিবেশনকে আমরা তীব্র নিন্দা করি। তা বলে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব না—যে নাটকে গানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গানের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাট্যানুষ্ঠানে শিশিরকুমার প্রমাণ করে দিয়েছেন নাট্যসঙ্গীত নাটককে কতটা সাহায্য করতে পারে। আমাদের মন্দ-ভাগ্য পেশাদারী থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও একাধিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যসঙ্গীত রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারেননি।

॥ মঞ্চ-দৃশ্য-আলোক ॥

অপরেশচন্দ্রের আর্ট থিয়েটারে, মিনার্ভায় বা প্রবোধ গুহের মনোমোহনে মঞ্চ, দৃশ্য বা আলোক সম্পর্কে যতটুকু ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে তাতে আমরা মোটেই খুশি হতে পারিনি। দর্শককে ভুলিয়ে রাখার জন্য কাঠের রথ, মাটির ঘোড়া, কাগজের হাতি, লখীন্দর এর পুনর্জীবন লাভ, স্বর্গে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা এঁরা করেছেন। মঞ্চের প্রয়োজনে যাদুকরকেও আনা হয়েছে, সামান্য লাল নীল আলো ব্যবহৃত হয়েছে, এবং পাদপ্রদীপকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন এঁরা। আবার দৃশ্য পরিবর্তনের সময় ইন্দুবালাকে দিয়ে গান শোনাবার ব্যবস্থাও ছিল। এসব তথ্য আজকে আমাদেয় কাছে খুবই হাস্যকর মনে হতে পারে। আসলে আর্ট, মিনার্ভা বা মনোমোহনে মঞ্চমালিকের যথেচ্ছাচারে মঞ্চকারুর দিকটি উন্নত হতে পারেনি। অমর দত্তের প্রদর্শিত পথে মঞ্চ, দৃশ্য, আলোকের ব্যবহারেই এঁরা তৃপ্ত থেকেছেন।

শিশিরকুমারের 'সীতা' প্রযোজনায় আমরা রুচিসম্মত দৃশ্য যোজনার সংবাদ পেলাম। চারু রায়ের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম এর শীলিত প্রয়োগ দেখা গেল। পাদপ্রদীপের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো, এল 'মুড লাইট'। ম্যাডান কোম্পানীর যথেচ্ছাচারকে শিশিরকুমার পরোক্ষে শাসন করলেন। কিন্তু মঞ্চ-দৃশ্য-আলোক সম্পর্কে শিশিরকুমার খুব যে একটা ভেবেছেন তা নয়। তাঁর

শেষদিকের প্রযোজনাগুলি দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে নাট্যাচার্য তাঁর সমগ্র প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন অভিনয়ের ওপর। অশোক সেনকে লিখিত একটি পত্রে শিশিরকুমার (১৷৯৷ ৫৬) লিখেছিলেন,

> " তুমি এক বছরের মধ্যে শিখে নেবার যে বিপুল আয়োজন করেছ তা যদি খানিক অংশেও সফল করে তুলতে পারো তা হলে দেশে ফিরে এলে নাট্যশালার উপকার কোরতে পার। Form গুলির দিকে বেশী নজর দিও না। ওগুলো চিন্তাবিলাসী রসিকজনের জন্য। নাটকগুলো শিক্ষকদের সাহায্যে পোড়ো।"[৫০]

শিশিরকুমারের এই পত্রাংশ থেকে তাঁর Form সম্পর্কিত অনীহার কথা বুঝতে পারা যায়। অভিনয়ের অন্যান্য দিককে শিশিরকুমার সমীহ করেননি। শ্রীরঙ্গম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, অভিনয় ছাড়া অন্যান্য দিকের প্রতি ক্বচিত নজর দিতেন নাট্যাচার্য। তাঁর পার্শ্বচরেরা মঞ্চকারুর দিকটি তদারক করতেন বেশির ভাগ সময়ে।

বিগত যুগে মঞ্চ, দৃশ্য ও আলোক সম্পর্কে সবচাইতে বেশি ভেবেছেন শ্রীসতেন্দ্র সেন। সংক্ষেপে সতু সেন। সম্প্রতি 'আত্মজীবনী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে আমরা সবিস্তারে তাঁর মঞ্চ ভাবনা ও আলোকচেতনার পরিচয়টি জানতে পেরেছি।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়ে সত্যেন্দ্র সেন ১৯২৫ সালে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হবার আশায় আমেরিকার পথে পাড়ি দেন। আমেরিকার পথে পা বাড়িয়েও সতু সেন ভাগ্যদেবীর অমোঘ ও অলক্ষ্য নির্দেশে প্যারিসে নেমে পড়েন। এই প্যারিসেই তার ভাগ্য চূড়ান্ত পরিণামে উপনীত হয়। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার সতু সেন মঞ্চ প্রয়োগবিদ্ সতু সেনে বিবর্তিত হবার শপথ নেন।

হাসান সারওয়াদি'র চিঠি নিয়ে নিউ ইয়র্কে'র ল্যাবরেটরি থিয়েটারে উপনীত হন সতেন্দ্র সেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক স্তানিশ্লাভস্কি-র সুযোগ্যতম শিষ্য বলিশ্লাভস্কি তখন পরিচালক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত। বলিশ্লাভস্কি ও থিয়েটারের কর্ত্রী মিরিয়ম স্টকটন-এর অনুগ্রহে সতু সেন 'দি থিয়েটার আর্টস ইনস্টিট্যুট'-এর ছাত্র হয়ে যান। সারা দিনরাত অসম্ভব পরিশ্রম করে টাকার সংস্থান করতে হতো তাঁকে। তার ওপর নাট্য-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রণালীর প্রচণ্ড চাপ তো ছিলই। সতু সেনকে পড়তে হয়েছিল ক্লাসিক ও আধুনিক নাটক, আলোর প্রয়োগ ও মঞ্চ সম্পর্কীয় যাবতীয় পুস্তক, অভিনয় শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি ও বিভিন্ন দেশের সাহিত্য। সংগ্রহ করতে হয়েছিল ৩৯টি দেশের থিয়েটার প্রোগ্রাম, ৮টি নোট বই, রং সংক্রান্ত ৬টি নমুনা গ্রন্থ। এছাড়া

আরও পড়তে হয়েছিল—বিশ্বনাট্য ইতিহাস, আধুনিক নাট্যসাহিত্য, বর্ণালি প্রক্ষেপণ-পদ্ধতি, শেকস্পীয়রীয় আমলের মঞ্চসজ্জা, স্পেনের স্টোইক ভাস্কর্য, ফোটোগ্রাফি ও চিত্রকলা বিষয়ক রচনা। কতকগুলি সাময়িক পত্র অবশ্য পাঠ্য তালিকায় ছিল। সেগুলির নাম—'ক্রিয়েটিভ আর্ট', 'দি থিয়েটার', 'দি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও', 'দি আর্টস, দি থিয়েটার আর্টস ও 'দি মস্কো'। এছাড়া পাঠ্যতালিকায় আরো বিষয় ছিল। সেগুলি সতু সেনের স্মৃতিকথায় বিস্তৃতাকারে বলা আছে।

সত্যেন্দ্র সেন মুখ্যত মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতকে তাঁর বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। প্রায় আটমাসের মধ্যে তিনি আপন প্রতিভার সাহায্যে বলিশ্লাভস্কির চোখে পড়ে যান। অতঃপর ইনস্টিট্যুট-এর একজন সহকারী পরিচালক হয়ে উঠলেন সতু সেন। .৯২৮এর প্রথম ভাগে 'টেকনিক্যাল ডিরেকটার' পদে উন্নীত হলেন তিনি। এই সময়ে 'উডস্টক প্লে হাউস' নির্মিত সতু সেনের কৃতিত্বের দ্যোতক।

মঞ্চবিশেষজ্ঞ রূপে স্বীকৃতি পাবার পর সতু সেন পাশ্চাত্যের একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশল ও নাট্য-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। মস্কোয় তিনি গিয়েছিলেন তিনবার (১৯২৮, '২৯ ও '৩১-এ)। ১৯২৯-এ সতু সেন স্তানিশ্লাভস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বেশ কয়েকবছর বিদেশে বাস করলেও সতু সেন তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশকে ভুলতে পারেননি। ১৯৩০ সালে তাঁরই একান্ত উদ্যোগে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকায় যান। শিশিরকুমারের কাছে সতু সেনের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। সেদিনের আমেরিকাও শিশিরকুমারকে স্বাগত (ব্যক্তিগতভাবে জানালেও দলগতভাবে) জানাতে পারেনি।

আমেরিকায় শিশিরকুমার কতটা কি করতে পেরেছিলেন—তা আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা জানতে পেরেছি, শিশিরকুমারকে আমেরিকায় আমন্ত্রণের ফলে সতু সেনের বিস্তর ঋণ হয়ে যায়। ঋণ শোধ করার পর সতু সেন দেশে ফিরে আসেন।

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সতু সেনের যোগাযোগ ঘটল ('প্রিয় মঞ্চ' রঙমহলের সঙ্গে) ১৯৩১-এ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বিরচিত ও শিশিরকুমার অভিনীত 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে সতু সেন সর্বপ্রথম (মঞ্চ ও আলোকের) শিল্পনির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। এর পর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন মঞ্চে শিল্প-নির্দেশনা প্রদান করেন। সতু সেন যে নাটকগুলিতে কাজ করেছেন তাদের নাম হলো—

'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'ঝড়ের রাতে', 'আলেয়া', 'দিদি', 'সিন্ধু গৌরব', 'রঙের খেলা', 'শাদী কি শূল', 'মহানিশা,' 'অশোক', 'পতিব্রতা', 'বাঙলার

মেয়ে', 'পথের সাথী', 'চরিত্রহীন', 'কাজরী', 'নন্দরাণীর সংসার', 'রাবণ', 'সিরাজদ্দৌলা', 'সমাজ', 'মীরকাশিম', 'পথের দাবী', 'মহামায়ার চর', 'পরিণীতা', 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক', 'দেবদাস', 'ধাত্রীপান্না', 'রামের সুমতি', 'অধিকার', 'এই স্বাধীনতা', 'কামাল আতাতুর্ক', 'স্বামী', 'কুন্তি-কর্ণ-কৃষ্ণা', 'অসবর্ণা', 'সংঘাত', 'নষ্টনীড়' ও 'শ্যামলী'।

সতু সেনের মঞ্চভাবনার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমরা সর্বপ্রথম বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দেখা পাই। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিশেষভাবে আমরা এই নতুন মঞ্চব্যবস্থা থেকে সুবিধা আদায় করেছি। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবস্থার ফলে দৃশ্যান্তর ব্যাপারটি আর সময় সাপেক্ষ ও বিরক্তির ব্যাপার হয়ে উঠল না। নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় বেঁচে গেল। 'মহানিশা' (রঙমহল, ১৫ এপ্রিল ১৯৩৩) নাটকের সঙ্গে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের জন্মকথা জড়িয়ে আছে।

সতু সেনের আমলে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে বক্স সেটের প্রবর্তনা হয়। এই রকম সেট নির্মাণের ব্যাপারটি আজও চালু আছে। যাঁরা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁরা অবশ্যই এই নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সতু সেনকে স্বীকৃতি দেবেন।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সজ্ঞানে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের একনিষ্ঠ বন্ধু সতু সেন মঞ্চকারু-সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে একটি সুষ্ঠু নাট্যানুষ্ঠান হতে গেলে চাই—একজন ভালো স্টেজ ম্যানেজার। যাঁর কর্তব্য হবে সমগ্র নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। এছাড়া চাই একজন, বিদ্যুৎবিদ্, পোষাক সংরক্ষণকারী, মঞ্চশিল্পী ও নকশাবিদ। যে রঙ্গমঞ্চে এই সব নানা ধরণের বিশেষজ্ঞের দেখা পাওয়া যাবে সতু সেনের মতে, সেই মঞ্চেই সার্থক নাট্যশিল্পের বিকাশ হবে। অন্তত, তাঁর আত্মজীবনী পাঠে আমাদের এ কথাগুলি মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের এই গরীব দেশে কোন্ ধরণের দৃশ্যসজ্জা করলে সব কুল রক্ষা পায়—জীবন সায়াহ্নে সে কথা বলে গিয়েছেন সতু সেন। তিনি বলেছেন,

> "আমাদের দেশীয় মঞ্চগুলিতে আর্থিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে দৃশ্যসজ্জা অপ্রতুল বলে বোধ হয়। এক্ষেত্রে একজন সৎ পরিচালকের মনে হতে পারে স্থায়ী দৃশ্যপটের ব্যবস্থা করা হয় না কেন, হলে কেমন হয় ইত্যাদি। দিশি যাত্রা বা অন্যান্য নাট্যানুষ্ঠানে প্রচলিত ঐতিহ্যানুগ দৃশ্যপটের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে স্থায়ী দৃশ্য পরিকল্পনা করা উচিত একথা আমার প্রায়ই মনে হয়। কিন্তু স্থায়ী দৃশ্য পরিকল্পনার প্রকৃত আদর্শ কি হওয়া উচিত ?

এক্ষেত্রে কেবল গ্রীক মঞ্চের আদর্শকেই আরও উন্নত ও আধুনিক করে গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রীক মঞ্চে অভিনেতাদের জন্য একটিমাত্র স্তর নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অভিপ্রেত মঞ্চে বিভিন্ন স্তরের সন্নিবেশ চাই যাতে নানা অংশে বিভক্ত মঞ্চটি অভিনেতৃকুলের স্বাভাবিক গতিবিধির পক্ষে একান্ত সহায়ক হবে এবং এর থেকে নানাবিধ সুবিধা নিংড়ে নেয়া যাবে। নাটকের আন্তরিক গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়ার দরুণ আদ্যোপান্ত ঘটনাটাই আবেদনশীল হয়ে দাঁড়াবে। এজাতীয় মঞ্চনির্মাণ বাস্তবিকই সম্ভবপর এবং আমাদের মত হৃতসর্বস্ব দেশে এটাই আপাততঃ একমাত্র সদুপায়।"[১১]

স্থায়ী দৃশ্য নির্মাণের সদুপদেশ দেওয়া ছাড়াও সতু সেন 'সুসম যবনিকা' প্রয়োগের কথাও বলেছেন। এই 'সুসম যবনিকা' ব্যবহারের ফলে খরচ কমে, দৃশ্য অদলবদলের দায়িত্ব থাকে না এবং কুদৃশ্যকে বাতিল করা যায়।

আমরা অতি-আধুনিক পেশাদারী নাট্যদলের প্রয়োগ প্রধানদের সতু সেন নির্দেশিত দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার করতে দেখছি। অতি আধুনিক বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীগুলি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ থেকে সুবিধা আদায় করার চাইতে স্থায়ী সেটের ওপর বেশি নির্ভর করেন। এবং দৃশ্যান্তর বোঝাতে গিয়ে 'সুসম যবনিকা' ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়াও সুনিয়ন্ত্রিত আলোকসম্পাতের সাহায্যে এঁরা মঞ্চকে নানা অংশে ভাগ করে নেন। বলা বাহুল্য, সতু সেন মহাশয় এইসব আধুনিক মঞ্চব্যবস্থার জনক।

শুধু মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা নয়, সতেন্দ্র সেন বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আলোক ব্যবহারের পথটি সুগম করেন। সতু সেন-পূর্ববর্তী বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে আলোক ব্যবহার ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সে ব্যবহারের মধ্যে কোন সুবুদ্ধির পরিচয় ছিল না। অর্থাৎ অভিনয়ের মেজাজের সঙ্গে সমতা রেখে আলোক ব্যবহার করা হতো না। সতু সেন সর্বপ্রথম কোন রঙ থেকে কি অর্থ বেরিয়ে আসতে পারে—তা আমাদের জানিয়েছেন। এছাড়া আমাদের আলোকসম্পাতের দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যক্তিগত বুদ্ধি খরচ করে তিনি নানারকম দেশীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন। বর্তমান রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট বিদ্যুতবিদ্ ও আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে অভিনব বৈশিষ্ট্যের জনক শ্রীতাপস সেন আমাদের জানিয়েছেন,

"তিনি [সতু সেন] যে সময়ে এদেশে আলোকসম্পাত ও মঞ্চস্থাপত্যের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময় প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রঙমহল থিয়েটারে যুক্ত থাকার সময়ে আমি একটি কক্ষে কালের ধুলোয় জীর্ণ নানা ধরণের যন্ত্রপাতি দেখতে পাই। আমার ঔৎসুক্য বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরিণত হয় যখন

জানতে পারি সে সব কিছুই সতু সেন আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলকে প্রকাশ করার জন্য নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করেছিলেন।"[৫]

সতু সেনের মঞ্চভাবনা ও দৃশ্যপরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন এখনও আছে। রঙমহল ও বিশ্বরূপার পুরোনো মঞ্চকর্মীদের কাছ থেকে সতু সেনের সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি অবিলম্বে সংগ্রহ করা আবশ্যক। কারণ আগামীদিনের মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণায় সর্বপ্রথম সতু সেনের নামটি ব্যবহার করতেই হবে।

॥ মেক্-আপ ॥

অঙ্গরচনা বা 'মেক-আপ' বিষয়ে আমাদের অদূরদর্শিতার নিদর্শন আজ-ও আছে, সেদিনও ছিল। অপরেশচন্দ্র প্রমুখেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচলিত ও গতানুগতিক 'মেক্-আপ' ও সংজীব ব্যবহার করেছেন। শিশিরকুমার ছাত্রাবস্থায় 'জুলিয়াস সীজার' অভিনয়কালে 'মেক্-আপ' বা সংজীব সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে তাঁকে এ নিয়ে বিশেষ ভাবতে দেখি না। যতোদূর জানি, শিশিরকুমার 'মেক্-আপ' ও সংজীবের ব্যাপারে নির্ভর করতেন ভাড়া করা অঙ্গরচনা-কারীদের ওপর। (যাঁরা আজও নানা কোম্পানীর ছায়াছত্রতলে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে আছেন বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে।) বিভিন্ন চরিত্রাভিনয় করার জন্য শিশিরকুমার কোন্ কোন্ ধরণের 'মেক্-আপ' নিতেন তা বুঝে নেবার জন্য বিস্তর ছবি আজও সুলভ, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী আজও বর্তমান। এ থেকে আমাদের অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অঙ্গরচনার ব্যাপারে এবং অবশ্যই সংজীব ব্যবহারে নতুন সাড়া জাগানো তাৎপর্য খুঁজে বার করতে পারেননি শিশিরকুমার।

আসলে এ যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর মতোই ব্যক্তিগত ভাবে কোনো কোনো অভিনেতা 'মেক্-আপ', সংজীব প্রভৃতির ওপর যথোচিত দৃষ্টি দিতে পেরেছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে অঙ্গরচনা ও সংজীব বিন্যাসের ক্ষেত্রে যিনি প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন তাঁর নাম অহীন্দ্র চৌধুরী। সুচতুর নট অহীন্দ্র চৌধুরী সবদিক থেকে নিজেকে যথার্থ অভিনেতা করে গড়ে তোলবার জন্য (বাচিক, আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) সবদিক থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের সাধারণ ইতিহাস পাঠে আমরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, যে সব সমালোচনা আহরণ করতে পেরেছি—তাতে দেখি অহীন্দ্র চৌধুরী বারবার প্রশংসিত হয়েছেন অর্থবহ অঙ্গরচনা ও সংজীব ব্যবহারের জন্য। একালের বিশিষ্ট দুই নাট্যানুরাগী ব্যক্তি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে

'সাজাহান' নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত অহীন্দ্র চৌধুরীর মেক্-আপ ও সংজীবের অনুপুংখ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে সে বর্ণনা তুলে ধরছি—

"অহীন্দ্র চৌধুরী সাজাহান-এ দু'রকম পোষাক পরতেন। প্রথম দৃশ্যে গয়নাগাঁটি যথেষ্ট থাকত। অরগ্যাণ্ডির মোগলাই কাবা, তার নীচে একটা বেনারসী ব্রোকেডের জ্যাকেটের মতো, এটা ছিল—লাল। পায়জামা যেটা পরতেন সেটাও ছিল লাল। ওপরের কাবাটা ছিল সাদা। বন্দী হবার দৃশ্যে—জ্যাকেটটা খুলে রেখে—তার বদলে পরতেন আর একটা জ্যাকেট—শাটিনের তৈরী। সেটা ছিল ক্রীম কালারের। আর শেষের দিকে পরতেন—অন্য পোশাক। ভেলভেটের কাবা—ফার বসানো। রঙটা ছিল যাকে বলে—রাসেট কালার—চকলেট নয় গোল্ডেন ব্রাউন বলা যেতে পারে। কালো ফার দেওয়া থাকতো আর বাঁধবার জায়গায় ছিল সোনালী ঘুণ্টি দেওয়া টাসেল। . .পায়জামা তখন পরতেন সাদা। কাবাটা বেশ লম্বা ছিল বলে, পায়জামার নীচেকার একটু অংশ মাত্র দেখা যেতো। পোশাকটিতে আর কোন জাঁকজমক ছিল না।

ধপধপে সাদা ক্রেপের চুল থাকত ঘাড় পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে গোটানো। ব্যাকব্রাশ করা। দাড়িটা ঐ ধপধপে সাদা ক্রেপ দিয়ে তৈরী। চুলের সঙ্গে মিলিয়ে। আর দাড়ির সঙ্গে গোঁফ ও ভ্রূর থাকত পুরোপুরি মিল। ওই ধপধপে সাদা।"[১৯]

এতো বলা গেল অহীন্দ্র চৌধুরীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথা। কিন্তু একজন অভিনেতাকে দিয়ে তো আর গোটা যুগের বিশ্লেষণ চলে না। কাজেই স্বীকার করা ভাল, অঙ্গরচনা বা 'মেক্-আপ' ও সংজীব ব্যবহারের দক্ষতায় আমাদের প্রয়োগাচার্যদের অদূরদর্শিতার নজির থেকে গেছে।

॥ অভিনয় ॥

রঙ্গমঞ্চের কাছে সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশা সুঅভিনয় দেখতে চাওয়া। এর সঙ্গে ভালো ঘটনাবহুল আখ্যান থাকলে তো কথাই নেই। একাধিক বর্ষীয়ান দর্শক আমাদের কাছে বলে থাকেন যে তাঁরা গত যুগে একাধিক সু-অভিনয় দেখেছেন। স্মৃতিচারণার সময়ে তাঁরা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করেই সে কথা বলেন। শুধু সাধারণ দর্শকেরা নয়, এযুগের বিখ্যাত নাট্যপরিচালকেরাও বিগত যুগের নট-নটীদের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। এ থেকে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, গতযুগের রঙ্গমঞ্চে কিছু সুঅভিনয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপিত আছে—নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেও। আসল কথা, গিরিশোত্তর কালেও বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের একমাত্র সম্পদ অভিনেতৃ-সম্প্রদায়। 'নামভূমিকায়' অথবা 'শ্রেষ্ঠাংশে'

ভালো অভিনেতা থাকলেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ হয়েছে—এমন দৃষ্টান্তের অভাব সে যুগে নেই।

১৯২১ থেকে ১৯৪৪এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তালিকাটি এই রকম—

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, হরলাল ভট্টাচার্য, কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমার।

কৃষ্ণভাবিনী, নগেন্দ্রবালা, প্রকাশমণি, সুবাসিনী, আশালতা, শশীমুখী, আঙুরবালা, রেণুবালা, সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা, সরযূবালা, ইন্দুবালা, চারুবালা, নিভাননী, আশ্চর্যময়ী, শেফালিকা, চারুশীলা, উমাশশী, শান্তি গুপ্তা, রাণীবালা, কংকাবতী সাহু ও প্রভাদেবী।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এই তালিকা থেকে কয়েকজনের কথা বিশেষ করে বলা দরকার; এঁদের অভিনয়শিল্পের ব্যাখ্যা দিলেই আমরা অভিনয়ের মান সম্পর্কে অবহিত হতে পারব। আমাদের এই আলোচনায় নতুন করে শিশিরবাবু বা অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন থেকে বিরত থাকছি।

—অভিনেতা—

☐ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অভিনেতা হিসেবেই অপরেশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গিরিশযুগেই তাঁর প্রতিভার উদ্ভাস হয়, পরবর্তীকালে আর্ট থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের বিকাশ। অপরেশচন্দ্র কি রকম অভিনয় করতেন তা জানবার জন্য আমরা হিজ মাস্টারস ভয়েসের কয়েকটি রেকর্ড বাজিয়ে শুনেছি। আমাদের শ্রুতির অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সমালোচনা থেকে বুঝতে পারি, অভিনেতা অপরেশচন্দ্র কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য ও আবৃত্তির যাদুকরী প্রতিভার গুণে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত। উদারা, মুদারা, তারা পর্যন্ত বিতানিত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং অভিনয় রীতি ছিল দমক দেওয়া। বীর ও হাস্যরসাত্মক চরিত্রে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে শেষ দিকে তিনি খল চরিত্রেও সঠিক রূপদান করেছেন। অপরেশচন্দ্র অভিনয়ের জন্য মাঝে মাঝে স্থূলতার আশ্রয়ও নিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের মহলা দেখার সৌভাগ্য হলেও, অভিনয়-শিক্ষক অপরেশচন্দ্র অগ্রজদের পদাংক অনুসরণ করতে পারেননি। বিশেষ করে আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার সময়ে তিনি অনুজ অভিনেতাদের নটের গতিবিধি কি হওয়া উচিত তা দেখিয়ে দিতেন না। তবে গলা তৈরীর ব্যাপারে তার বিশেষ নজর ছিল; গদাই মল্লিকের বাগান বাড়িতে তিনি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে স্বর প্রক্ষেপ শেখাতেন এ তথ্য আমরা পেয়েছি। শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী (স্বপন-বুড়ো) অপরেশচন্দ্রের অভিনয় ও অভিনয় শিক্ষণ ব্যাখা করতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "পরবর্তীকালে অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর মুখে শুনেছি, - নাট্য শিক্ষাদানে অপরেশচন্দ্রের একটি নিজস্ব মুন্সীয়ানা ছিল—যা কারো সঙ্গে মিশে যেত না। অপরেশচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক খেতে খুব ভালোবাসতেন। বহু অভিনয়ে তিনি তাঁর এই বিশেষ তামাক খাওয়াটা কাজে লাগাতেন।"[১]

রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

রঙ্গমঞ্চে প্রথমাবির্ভাবেই যাঁরা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে নট ও পরিচালক রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম অন্যতম। ১৯২২ সালে মিনার্ভা মঞ্চে রাধিকানন্দ 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যানুষ্ঠানে আণ্টিগোনস্ চরিত্রে অবতীর্ণ হন। গৌণ চরিত্রে রূপদান করেও তিনি দৈহিক ভঙ্গিমায়, মৌখিক ভাবের ব্যঞ্জনায় এবং সংলাপ উচ্চারণের মৌলিক কৃতিত্বে দর্শক সমাজকে একটি নতুন আণ্টিগোনস্ উপহার দেন। স্টার (আর্ট-এর ছত্রতলে) ও মনোমোহন থিয়েটারে থাকাকালীন একাধিক চরিত্রে রূপদান করেন রাধিকানন্দ। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে থাকেন যে, মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাধিকানন্দ নাটকের চরিত্র হয়ে উঠতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভগ্ন, কিন্তু উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ। অভিনয়ে আবেগের বদলে মনন প্রয়োগ করতে ভালোবাসতেন তিনি। ইঙ্গ-বঙ্গ চরিত্রে বা 'সিরিও-কমিক' ভূমিকায় রাধিকানন্দ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অপরিণত বয়সে দুরারোগ্য 'ক্যানসার' রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

নরেশ মিত্র

আদালতের তথাকথিত সম্মানজনক পেশা ত্যাগ করে যিনি সানন্দে নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম নরেশ মিত্র। পেশাদারী মঞ্চে (মিনার্ভায়) নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দেন। নরেশ মিত্রের প্রথম সৃষ্টি 'চাণক্য'। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নরেশ মিত্রকে 'কাত্যায়নে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল 'চাণক্য' শিশিরকুমারের পাশে। আর্ট থিয়েটারে যোগদান করার পর অভিনেতা নরেশ মিত্র তাঁর প্রতিভা

বিকাশের সুযোগ পান। 'কর্ণার্জুন' নাটকের 'শকুনি' নরেশ মিত্রের স্মরণীয় সৃষ্টি। এই আর্টে থাকাকালীন নরেশ মিত্র 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'কাত্যায়ন' ও 'সরলা' নাটকের 'নীলকমল'কে অক্ষয় করে রাখেন। নীলকমল চরিত্রটির নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। অভিনেতা নরেশ মিত্র যখন নীলকমল সাজতেন তখন দর্শককে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিতেন না যে নীলকমল একটি প্রগল্‌ভ ও স্থূল চরিত্র। সূক্ষ্মদর্শী নরেশ মিত্র নীলকমলের বেদনার দিকটিই তুলে ধরতেন। 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে যায়' বলে যখনই নীলকমল বেহালায় হাত দিত এবং যখনই ভাঙা বেহালাটি বিদ্রূপ করে উঠত তখন নরেশ মিত্র যে অভিব্যক্তি দিতেন (চোখে ও মুখে) তা দর্শকসমাজ বহুকাল মনে রেখেছেন এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরাও জানতে পেরেছি।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত নরেশ মিত্রের অভিনেতা জীবনের গৌরবময় কালটি অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে-কটি চরিত্রে রূপদান করেন তার মধ্যে স্মরণীয় পাঁচটি হলো—বিহারী (মহানিশা), কালীনাথ (পতিব্রতা), জিতেন ব্যানার্জী (বাংলার মেয়ে), অমর মাস্টার (পথের সাথী), পানুবাবু (গোরা)।

খর্বতনু নরেশ মিত্রের কণ্ঠস্বর ছিল নাকি সুরের, চোখের দৃষ্টি ছিল প্রখর। নাকি সুরে কথা বললেও প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারিতে বসে তাঁর কণ্ঠ শোনা যেত। (অন্তত, তাঁর পরিণত বয়সের অভিনয় দেখে আমাদের সে কথা মনে হয়েছে।) সুরবর্জিত সংলাপ উচ্চারণ করতেন তিনি এবং সে অভিনয় দেখে আমাদের মনে হয়েছে অভিনয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন নরেশ মিত্র। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে কতকটা যেন যোগেশ চৌধুরীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

□ তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

অধুনা অনালোচিত ও স্মৃতিলুপ্ত অভিনেতা (বিগত কয়েক দশকের খ্যাতকীর্তি নট) তিনকড়ি চক্রবর্তীর নামটি সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করছি।

আর্ট থিয়েটারে দীর্ঘকাল এই নট একাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেছিলেন—দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী ও নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পাশাপাশি। তিনকড়ি চক্রবর্তীই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের প্রথম 'কর্ণ'। অতঃপর তাঁকে আমরা দুলাল ('বলিদান'), মীরজুমলা ('গোলকুণ্ডা'), বিদূষক ('জনা'), অক্ষয় ('চিরকুমার সভা'), শশিভূষণ ('সরলা'), ডাক্তার ('গৃহপ্রবেশ'), চণ্ডীদাস ('চণ্ডীদাস'), ধনঞ্জয় ('পরিত্রাণ'), মথুরো ('মন্ত্রশক্তি') প্রভৃতি চরিত্রে রূপ দিতে দেখি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নানাধরণের চরিত্রে তিনি রূপ দিতে পারতেন। এবং যে সমস্ত চরিত্রে তিনি

রূপ দিয়েছেন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সেই চরিত্রগুলি খুবই বিতর্কিত। তিনকড়িবাবুর 'বিদূষক' (জনা) অভিনয় দৃষ্টে ১৯২৫ সালের ২১শে জুন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছিল,

"........The role of Bidushak as represented by Mr Tincowrie Chakravorty was very impressive no doubt, but here and there he lacked in the gravity which was characteristic of Bidushak as pointed by the author......a simple Brahmin as he was......but an embodiment of great believer that salvation is a matter of consequence if man once utters the name of "Hari" However, Mr Chakravotty acquitted creditably before the audience"

□ যোগেশ চৌধুরী

নাট্যাধিনায়ক শিশিরকুমারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়েও নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী মহাশয় সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিনয় করতেন। বলা বাহুল্য, সে অভিনয়ের সঙ্গে গিরিশযুগের কোনো সম্পর্ক ছিল না। একালে গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কতকটা যোগেশ চৌধুরীকে অনুমান করে নিতে পারবেন। যোগেশ চৌধুরীর চেহারা এবং অভিনয় ক্ষমতাকৌশল নায়ক চরিত্রে আরোপিত হতে পারেনি। কিন্তু কখনও খল চরিত্রে ('রমা'র গোবিন্দ গাঙ্গুলী), কখনও নির্বোধ (ঘটিরাম ডেপুটি) চরিত্রে, আবার কখনও ভাঁড় (আলমগীর এর রাম সিং) চরিত্রে নিজেকে বেশ সাজিয়ে নিয়েছেন। নানা ধরণের চরিত্রে রূপদান করার বিরল প্রতিভা ছিল তাঁর। নিজেরই নাট্যরূপ দেওয়া 'মহানিশা' নাটকের এক গ্রাম্য সুদখোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন তিনি। বদমেজাজী এই সুদখোর চরিত্রটি যোগেশচন্দ্রের ব্যাখ্যায় আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। যোগেশ চৌধুরী তাঁর অভিনয়ের ব্যাখ্যা মারফত দর্শককে বুঝিয়েছেন যে 'দেখো এই সুদখোর মানুষটির মধ্যেও একটা গোপন ক্ষত আছে। তোমরা তাকে বোঝবার চেষ্টা করো।' জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, 'বাংলার মেয়ে' নাটকে নিজ কন্যার শোচনীয় মৃত্যু-দর্শনে 'ভবানী, ভবানী ; চলে গেলি মা ?'—এই সংক্ষিপ্ত সংলাপ উচ্চারণের কি তুলনা আছে ? খুব বড় অভিনেতাও এরূপ স্থলে গলা কাঁপাইয়া, উহাতে ক্রন্দনের আভাস আনিবার চেষ্টায় একটি বিশ্রী কাণ্ড করিয়া বসিতেন। কিন্তু যোগেশচন্দ্র ? কত সহজভাবে কত নিদারুণ বুক ফাটা কথাই না বলিয়া যাইতেন। মনে হইত অশ্রুর উৎস শুকাইয়া গেছে, আছে শুধু মর্মদাহকারী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, সংলাপ ছলে তাহারই যেন একটা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির

হইয়া আসিল।"[১১] একালের প্রয়োগাচার্য শ্রীশম্ভু মিত্র 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়' শীর্ষক প্রবন্ধে যোগেশ চৌধুরীর অভিনয়ের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। আমরা শ্রীশম্ভুমিত্রের অভিমতকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল মন্তব্য বলে বিবেচনা করি। এবং সেই কারণে অভিনেতা যোগেশ চৌধুরী সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ মন্তব্য—'তিনি আমাদের ঐতিহ্য'।

☐ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (মহর্ষি)

যিনি বিগত যুগের পেশাদারী অভিনেতা হয়েও বর্তমানকালের অপেশাদার অভিনয়ধারা ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর নাম। পেশাদারী মঞ্চের নানা উচ্ছৃংখলতার মধ্যে থেকেও যিনি চারিত্রিক ভদ্রতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন তিনিই আধুনিকদের প্রিয় নেতা 'মহর্ষি'।

১৯২৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় সর্বপ্রথম কলকাতা শহরে তাঁর মঞ্চাবতরণ। এবং এই অভিনয় রাত্রি থেকে নাট্যরসিক মহলে তিনি 'মহর্ষি' নামে অভিহিত হন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, লিখেছেন "শিশিরকুমারের সঙ্গে থাকিয়াই অতি অল্প যে কয়জন অভিনেতা, শিশিরকুমারের সমকালেই খ্যাতিমান হইয়াছিলেন, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁহাদের অন্যতম। অথচ সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, এই যে শ্রীমনোরঞ্জনের অভিনয়ে শিশিরকুমারের অভিনয়-ধারার প্রভাব এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয়।"

সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী অভিনেতা ছিলেন মহর্ষি। দৃষ্টি থাকত সর্বদা অভিনীত চরিত্রের ওপর। দর্শক মনোরঞ্জনের সস্তা পথ তিনি বেছে নেননি। রসিকচিত্ত তাঁর অভিনয়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেত। হাস্যরসের ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট সংযত থাকতেন, আবার করুণরসের ভূমিকায় নিখুঁত সংযমের শাসনে অভিনয়কে বাঁধতেন। 'মহর্ষি'র স্মরণীয় অভিনয়ের স্মারক হয়ে আছে 'মদন ঘোষ, রসিক, ভাঁড়ু দত্ত, রাম মাণিক্য, বাল্মীকি, রঘুনাথ, সত্যপ্রসন্ন' প্রভৃতি চরিত্রগুলি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্মরণীয় অভিনয়ের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র লিখেছেন,

'মাটির ঘর' নাটকে মহর্ষি······অভিনয় করতেন সত্যপ্রসন্নের। তিনিই ঐ মাটির ঘরের কর্তা। তাঁর এক মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করে। তখনো সত্যপ্রসন্ন অন্যকে বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বাস হারাতে নেই, রাত্রি যতো অন্ধকারই হোক্ একদিন তারপরে সকাল হবেই। কিন্তু তাঁর জীবনে সে-সকালটা আর এলো না। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাঁর আর এক মেয়ে পাগল হ'য়ে গেলো এবং পুত্রপ্রতিম যে জামাই সে মারা গেলো।

তখন সেই বুড়ো সত্যপ্রসন্ন ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে,—তবু আমি কাঁদবো না। তুমি আমায় কাঁদাও দেখি,—স্টুপিড,—তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না।

সেই সময়ে মহর্ষির সেই বিশাল চোখদুটো যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাতো। চোখের শিরাগুলো লাল হয়ে ফুটে উঠতো। তাঁর ঠোঁট বেঁকে যেতো। আর অতো বড়ো শরীরটা যেন থরথর করে কাঁপতো। একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলতেন—তুমি স্টুপিড,—তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না…।

এই অভিনয় দেখে লোকে মুগ্ধ হ'তো। কেন? সংযত অভিনয়ের জন্যে মহর্ষির খ্যাতি ছিলো। তিনি কখনো বাড়াবাড়ি ক'রে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারতেন না। সেটা তাঁর চরিত্রেই ছিলো না। তাহ'লে কী প্রকাশ হ'তো নাটকের এই অন্তিম লাইনগুলোয় যে আমাদের বুকের মধ্যেটা ভয়ে শুকিয়ে যেতো? আমরা কাঁদতুম না। কিন্তু আমাদের গলার কাছটায় লাগতো, ঢোক গিলতে কষ্ট হ'তো।"

শম্ভু মিত্রের এই স্মৃতিচারণায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু শুধু কি একটি ছবিই আমরা পেয়েছি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, ষোল আনার ওপর আরো দু' আনা পেয়েছি একেবারে আঠারো আনা। কারণ, শম্ভু মিত্রের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়—ক. মহর্ষির অভিনয়ে ছিল সংযম খ. চরিত্র ব্যাখ্যা দেওয়ার স্বকীয় পন্থা ও গ. আধুনিকতা। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিনেতারাই সর্বপ্রথম 'theatrical theatre' বা 'Flamboyant' অভিনয় প্রথা থেকে বেরিয়ে আসেন। নবনাট্য-আন্দোলনের পুরোধারা সেই কারণে এঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

☐ নির্মলেন্দু লাহিড়ী

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে Theatrical Theatre—এর চরম বিকাশ যাঁরা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর নামটি প্রথমেই আলোচ্য। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভাগিনেয় নির্মলেন্দু লাহিড়ী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসেন ১৯২২-এ। এর পর নানা সময়ে তিনি তখনকার প্রসিদ্ধ থিয়েটারগুলিতে কাজ করেন। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার যেমন আলমগীর, অহীন্দ্র চৌধুরী - সাজাহান, নির্মলেন্দু লাহিড়ী তেমনি ঔরঙ্গজেব বা সিরাজদ্দৌলা। রোমাণ্টিক নায়কের ভূমিকায় রোমাণ্টিক ধরণের অভিনয় করতেই অভ্যস্ত ছিলেন নির্মলেন্দু বাবু। তাঁর আবৃত্তির খুব খ্যাতি ছিল। সঙ্গে ছিল বাক্‌বিভূতির গুণ। এই বাক্‌বিভূতির জোরে তিনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। অভিনয়ের মধ্যে যে একটা কাব্য থাকে, একটা

আবেগমূল্য থাকে—নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ে তা ধরা যেত।* নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ের সাফল্য এবং ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন,

"নির্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয়ের সিরাজের ভূমিকা। সিরাজ তার অমাত্যদের কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আবেদন করছে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্যে। ··· নির্মলবাবু বললেন দোলা দিয়ে আবৃত্তি করার মতো ক'রে। এ বাংলা হিন্দুর না,—গলাটা আর এক পর্দা তুলে বললেন, এ বাংলা মুসলমানের না,—তারপর আরও তুলে বললেন, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি—চীৎকার ক'রে বললেন—গুলবাগ এই বাঙলা। আমি অনুভব করলাম যে দর্শকদের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেলো। আমার নিজের বুদ্ধি এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, কিন্তু আমার মাংসপেশী আমার স্নায়ুতন্ত্রী যেন মোহগ্রস্ত হ'লো।"

একজন বুদ্ধিমান নাট্যাচার্যকে মোহগ্রস্ত করতে পেরেছেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী আপন আবৃত্তি কৌশলে, আপন 'ইমোশান' সৃষ্টির মোচড়ে, পেশাদারী নটের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের আর কী থাকতে পারে ?

অনেকে বলে থাকেন নির্মলেন্দুবাবু শিশিরকুমারকে সহ্য করতে পারতেন না। কেউ কেউ আবেগতাড়িত হয়ে বলে থাকেন নির্মলেন্দুবাবু শিশির-কুমারের চাইতেও বড়ো অভিনেতা। কথাটির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য মহেন্দ্র গুপ্তের একটি অভিজ্ঞতা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

"আমার 'উত্তরা' নাটক নিয়েই নির্মলেন্দুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এই বইখানি ছিল ও'র অত্যন্ত প্রিয়, অর্জুনের ভূমিকায় উনি অভিনয় করবেন বলে বইখানি তুলে রেখেছিলেন। নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করবার পথে নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হতে নির্মলেন্দু আমায় একদিন দুঃখ করে বলেন :

—আমার দ্বারা উত্তরা অভিনয় সম্ভব হ'ল না। অথচ প্রাণ ধরে এ বই

* নির্মলেন্দু বাবু দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং 'সুরধামে'র বাসিন্দা হয়েও মনে প্রাণে ছিলেন গিরিশ শিষ্য। একবার একটি পত্রে মাতুল দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি লেখেন,

"I love Girish Babu, I adore Girish Babu, but I am sorry I can't say the same about your flawless friends who run him down—who are not fit to lace his shoes........."

[দিলীপ রায়, স্মৃতিচারণ, (১৩৬৭) পৃ ২২২]

আমি আর কারো হাতে তুলে দিতে পাচ্ছি না। মনে আনন্দ পেতাম এবং তোমার লেখাও সার্থক হত যদি একমাত্র শিশিরকুমার এ নাটক অভিনয় করতেন।"[৫৯] নির্মলেন্দুবাবুর এই স্বীকৃতি থেকে তাঁর মনের প্রসারতার উদাহরণ মিলতে পারে।

☐ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতা ও পরিচালক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি নাট্যরসিক দর্শক ও যশস্বী অভিনেতাদের কাছে সুবিদিত। মঞ্চে একবার যাঁরা দুর্গাদাসকে দেখেছেন তাঁরা কোনোদিনই তাঁদের প্রিয় অভিনেতাকে ভুলতে পারেননি। এর কারণ বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় অভিনেতা নায়কোচিত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। অভিনেতা জীবনের শেষ দিনটিতেও তিনি ছিলেন 'হিরো'। অভিজাত বংশের সন্তান দুর্গাদাস উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষোচিত সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গভীর কালো চোখ, তাঁর চলাফেরা, কুঞ্চিত কেশদাম ও এই সঙ্গে অনবদ্য গদ্য আবৃত্তি--সব মিলে দুর্গাদাস দ্বিতীয় রহিত।

১৯২৩ সালে স্টার থিয়েটারে (আর্ট-এ) 'কর্ণার্জুন' নাট্যানুষ্ঠানে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিকর্ণের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। পরে আর্টের ছায়াছত্রতলে 'চিরকুমার সভা', 'আলমগীর' প্রভৃতি নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিমান হন। একাধিক মঞ্চে দুর্গাদাস অভিনয় করেছেন। স্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, রঙমহাল, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর নামটি নানা সময়ে যুক্ত হয়। শচীন সেনগুপ্তের 'কাঁটা ও কমল' নাটকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শেষ অভিনয় করেন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও অনেকের কাছে একজন অভিনেতা মাত্র নন, একটি প্রবাদও বটে। দুর্গাদাস চরিত্রে একধরণের 'ডনজুয়ানী' ছিল। এই 'ডনজুয়ানী' তাঁকে প্রবাদে পরিণত করেছে এবং গদ্য রচনায় সবিশেষ প্রাণিত করেছে।

ডনজুয়ান দুর্গাদাস একবার বর্ধমান স্টেশনে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেবকে প্রথমশ্রেণীর নির্দিষ্ট (ট্রেনের) কামরায় উঠতে না দিয়ে (মুখ্যমন্ত্রীর একজন পার্শ্বচরকে) বলেছিলেন,

"—কী ভাবছেন? পুলিশ ডেকে বিশেষ সুবিধা হবে না—কারণ আপনাদের পক্ষে রয়েছে পুলিশ আর দুর্গাদাসের পক্ষে রয়েছে প্ল্যাটফর্মের এই জনসমুদ্র…"

দুর্গাদাসের এই আচরণকে কোনো সুস্থ মানুষই সমর্থন করবেন না ; তবে এই উক্তি থেকে শিল্পীর আত্মপ্রত্যয় ও ডনজুয়ানী মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি।

নিজের অভিনয় কর্মের ওপর গভীর আস্থা ছিল বলে, দর্শকদের ওপর অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন বলে—দুর্গাদাস মঞ্চকে মঞ্চ বলে মনে করেননি। অভিনেতা ও পরিচালক (নাট্যকারও বটে) মহেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,

"কোনো একটি নাটকে প্রেমের দৃশ্য অভিনয় কচ্ছিলেন দুর্গাদাস। পেছন দিক থেকে একজন দর্শক বলে উঠলেন : 'লাউডার প্লিজ'। দুর্গাদাস একবার সেই দিকটায় তাকিয়ে নিয়ে নায়িকার সঙ্গে চীৎকার করে প্রেমালাপ সুরু করলেন। তারপর হঠাৎ থেমে দর্শকদের পানে তাকিয়ে বলেন :

—এভাবে প্রেম করতে আমারও অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, নায়িকাও প্রেম কচ্ছি না ধমকাচ্ছি বুঝতে না পেরে নার্ভাস হয়ে ঘেমে উঠেছেন। আর আপনারাও নিশ্চয় এ অভিনয়ে খুসী হচ্ছেন না। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে আপনারাও যখন প্রেম করেন, চেঁচিয়ে পাড়ার লোককে জানিয়ে করেন না, ঘরের পর্দা ফেলে বা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করেই কথা বলেন। সুতরাং যেটা এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক—তাই কচ্চি এবার।"

অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনালুপ্ত একটি পত্রিকায় তাঁর জীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। উক্ত অসমাপ্ত রচনা থেকে রোমাণ্টিক নায়ক দুর্গাদাসকে চিনে নেওয়া শক্ত নয়। তাছাড়া গদ্য লেখার হাতটিও তাঁর নেহাত মন্দ ছিল না। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত দুর্গাদাসের গদ্য রচনার একটু নমুনা রাখা গেল…

"যারা জীবনে অভিনেতা হবার চেষ্টা করেন, তাঁদের কাজে, কর্মে, চিন্তায়, অভিনয় করেছি এমনি একটি ভাব দেখা যায়। বিশেষ করে এই সিনেমার যুগে একদল কল্পনা-বিলাসী ছেলে আছে, যারা সর্বদাই মনে করে তারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছে। এটা তাদের কথাবার্তা-হাবভাব থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। তখন আমার অভিনেতা হবার প্রবল ইচ্ছা। কাজে কর্মে জাগ্রত নিদ্রিত সবসময়ই স্বপ্ন দেখছি আমি অভিনেতা, আমি আর্টিস্ট! অন্ধকার রাত, সামনে বিস্তৃত জলরাশি, তার ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে পাড়ে। এমন রোমাণ্টিক পরিস্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আমি যদি বিল্বমঙ্গল হয়ে না যাই ত' আমার অভিনেতা হবার ইচ্ছেই বৃথা।'

☐ ভূমেন রায়

কোন দিক থেকেই বড়ো মাপের অভিনেতা ছিলেন না ভূমেন রায়। তবে মঞ্চমালিকের কাছে নয়, দর্শকের কাছে ভূমেন রায়ের একটা আলাদা পরিচয়

ছিল। এর কারণ কতকগুলি বিশেষ ধরণের চরিত্রাভিনয়ে ভূমেন রায় ছিলেন দ্বিতীয় রহিত। তাঁর ছটফটে ভাব, তাঁর উচ্চারণ, হাসি, আবেগ— এই সবকিছু বিশেষ কয়েকটি চরিত্রায়ণের সহায়ক ছিল। ভূমেন রায়ের অভিনয় প্রতিভার বিশিষ্টতা নিহিত আছে কার্ভালো (কেদার রায়) ও রডা (প্রতাপাদিত্য) চরিত্র সৃষ্টিতে। পুরনো অভিনয়ের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র লিখেছেন,

"কেদার রায়' নাটক সাহিত্য হিসাবে কোনদিনই আদৃত হয়নি। তার মধ্যে আবার কার্ভালোর চরিত্রটি অত্যন্ত অবাস্তব ভাবে লেখা। কার্ভালো ভাঙা বাঙলা বলে, হিন্দী বলে, আর ইংরেজি বলে।......শুনেছি ভাদুড়ী মশায় যখন রডা অভিনয় করেছিলেন তখন তিনি ভাঙা ভাঙা চট্টগ্রামের ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভূমেনবাবু করতেন না। রডাতেও না, কার্ভালোতেও না। কিন্তু মানুষটা জীবন্ত হ'তো। এমন একটা দুর্দান্ত বেপরোয়া শিশুসুলভ সারল্য প্রকাশ পেতো যে প্রথম দৃশ্যেই লোক তাকে ভালোবেসে ফেলতো।"[৬১]

—অভিনেত্রী—

তুলনামূলক বিচারে বিগত যুগের (১৯২১-১৯৫৪) অভিনেত্রীরা, অভিনেতাদের মতো প্রতিষ্ঠা পেতে পারেননি। শরৎচন্দ্র পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেখেছেন যে, 'নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না।' কথাটি অক্ষরে অক্ষরে না হলেও অংশত সত্য। তথাকথিত পেশাদারী মঞ্চে নায়িকার অভাব বা অভিনেত্রীর অভাব আজও আছে। উচ্চশিক্ষিত বা শিক্ষিত অভিনেত্রীরা আজও সংখ্যায় অল্প। বিগত যুগের অভিনেত্রীরা আজকের তুলনায় আরও নিম্নমানের ছিলেন। এক ধরণের অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে এ'রা কোনো রকমে কাজ চালিয়ে গেছেন। নাচ-গান জানা অভিনেত্রীর চাহিদা বেশি ছিল সেদিন। ফলে অভিনেত্রীরা নেচে গেয়ে করতালি পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—সকল অভিনেত্রীই অশিক্ষিত ছিলেন না। যেমন কংকাবতী সাহু ছিলেন প্রথম স্নাতক-অভিনেত্রী। আবার অল্পশিক্ষিত হলেও অশীলিত ছিলেন না কেউ কেউ, যেমন—প্রভা দেবী, নীহারবালা, সরযূবালা, শেফালিকা দেবী প্রভৃতি। এবং অবশ্যই বলতে হবে—এই সব অভিনেত্রীরা গিরিশযুগের অভিনেত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি 'আধুনিক' ছিলেন। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি।

☐ আশ্চর্যময়ী

আশ্চর্যময়ী সুদর্শনা ছিলেন না। তাঁর চেহারাটি গোলগাল ছিল,

তনুলতাটি ছিল খর্ব। কিন্তু শুধু গীতপ্রধান চরিত্রাভিনয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। মনোমোহন থিয়েটারে 'দেবলাদেবী' নাট্যানুষ্ঠানে 'মোতিয়া'র গানে এবং আর্ট থিয়েটারে 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটকে 'শবরী'র ভূমিকায় আশ্চর্যময়ী বিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আশ্চর্যময়ীর আশ্চর্যজনক কণ্ঠকে ব্যবহার করার জন্য মঞ্চমালিক (মনোমোহনে) তাঁকে 'বিষবৃক্ষ' নাটকের 'দেবেন্দ্র' সাজিয়েছেন। দেবেন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আশ্চর্যময়ী গেয়েছিলেন,

"এসেছিল বকনা গরু পর গোয়ালে জাবনা খেতে।"

চাঁদ সদাগর নাট্যানুষ্ঠানে আশ্চর্যময়ী 'নেতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন। 'নেতা'র গান ও অভিনয় প্রচুর 'এনকোর' পেয়েছিল।

□ নীহারবালা

'কারাগার' নাটকের ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে নাট্যকার মন্মথ রায় লিখেছিলেন,

"মুগ্ধচিত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি, তিনি বাঙলা নাট্যজগতের কলালক্ষ্মী-কল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা। মাতার মমতায়, ভগিনীর স্নেহে আমার এই নাটক রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত ও সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। নাটকের নৃত্য পরিকল্পনা তাঁহার এবং সে পরিকল্পনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই আমার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, আমি বিশ্বাস করি।"

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে এক সময়ে অভিনেত্রী নীহারবালা একেশ্বরী হয়ে বহু নাট্যাভিনয়ের সাক্ষী হয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। এবং তিনিই ছিলেন বিগত যুগের নাট্যজগতের প্রতিনিধিস্থানীয়া কলালক্ষ্মী। সকল গুণে গুণান্বিতা ছিলেন নীহারবালা। নৃত্য, সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর গভীরতা ছিল। এর ওপর অভিনয় করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তো ছিলই।

'চিরকুমার সভা' নাটকে নীহারবালা সর্বপ্রথম নীরবালা রূপে পেশাদারী মঞ্চের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। এই সময় তাঁকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে নিতে সাহায্য করেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'এমন মধুকণ্ঠ সচরাচর দেখা যায় না।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, নীহারবালা নানা ধরণের ও রসের নাটকে অবলীলাক্রমে অভিনয় করতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ও সততা ছিল। 'কর্ণার্জুন' নাটকে 'নিয়তি'র ভূমিকায় গান গেয়ে নীহারবালা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'কারাগার' নাটকে তিনি দু'টি ভূমিকায় দেখা দিতেন। 'চন্দনা' ও 'ধরিত্রী'। চন্দনার অভিনয়ে ও ধরিত্রীর গানে দর্শক-

বৃন্দ একেবারে মুগ্ধ হয়ে থাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—নীহারবালার সঙ্গে নজরুলেরও যোগাযোগ হয়েছিল এই সময়ে।

নীহারবালাকে আমরা শেষদিকে নাট্যনিকেতনে অভিনয় করতে দেখি। আরও পরে শিশিরকুমারের মঞ্চেও তাঁকে দেখা গেছে। অত্যন্ত স্নেহশীলা ও সহিষ্ণু এই অভিনেত্রীটি থিয়েটারকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কখনো কখনো প্রতারিতও হয়েছেন। শেষজীবনে নীহারবালা পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে মেয়েদের নৃত্য শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেন।

□ প্রভা দেবী

বিশ শতকের প্রথমার্ধের দর্শকের চোখে এবং শিশিরকুমারের ভাষায় অভিনেত্রী প্রভা দেবী 'মঞ্চরাজ্ঞী'। ১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানীর 'বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠানের 'আলমগীর' নাটকে রূপকুমারীর ভূমিকাতে প্রভাদেবী সংলাপ সংবলিত চরিত্রাভিনয় করেন। প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের কাছে তাঁর প্রথম হাতে খড়ি। ১৯২৩ সালে প্রভাদেবীকে 'সীতা' রূপে দেখতে পাওয়া যায় ইডেন গার্ডেন-এর 'সীতা' নাট্যাভিনয়ে। 'সীতা' প্রভাদেবীর সোনাঝরা সৃষ্টি। এরপর প্রভাদেবী নানাসময়ে মুরা, রমা, ষোড়শী, উদিপুরী, জ্ঞানদা, অন্নপূর্ণা, দিগম্বরী, ভ্রমর, সুনন্দা, কুন্তী প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেন।

অভিনেত্রী প্রভাদেবীর সম্পদ ছিল তাঁর বিশিষ্ট বাচনকলা। বাচনভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগের পরিমিত মিশ্রণে তিনি ছিলেন অনন্যা। শুধু বাচনকলা নয়, প্রভাদেবীর অনুকুল দেহচালনা ও বিশিষ্ট মুখভঙ্গি অভিনয়ের চারুত্ব ফুটিয়ে তুলতো। প্রভাদেবীকে ভালো করে বুঝতে গেলে পরিণত নট ও প্রয়োগাচার্য শম্ভু মিত্রের সাহায্য নিতে হবে। শম্ভু মিত্র—প্রভাদেবী সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনার মাঝে লিখেছেন,—

> …"আমি একবার 'কর্ণার্জুন' নাটকে তাঁকে কুন্তী করতে দেখেছিলুম। সেটা ছিলো কোনো-এ কঅভিনেতার সম্মানরজনী। অনেক খ্যাতনামা অভিনেতাই ছিলেন।…সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রভাদেবী এলেন কুন্তী হিসেবে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা কইতে। মুহূর্তে আমার মন থেকে মেলায় আসার চাপল্য অন্তর্হিত হয়ে গেলো।…
>
> কী মর্যাদা তাঁর বাচনে, কী ব্যাকুল ভালবাসা তাঁর কণ্ঠে। হঠাৎ মনে হ'লো এই সমস্ত অভিনেতাদের মধ্যে তাঁকে মানায় না। তাঁর স্থান যেন অন্যত্র। অন্য পরিবেশের মধ্যে।
>
> 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে স্বামীর অপমানে স্তম্ভিত হ'য়ে যখন বড় বৌয়ের

চরিত্রে প্রভাদেবী বলতেন, তুই কাকে কী বল্লি লা ছোটো বউ!—সেটা আমার কাছে বিখ্যাত অভিনয়ের মধ্যে গণনীয়।”

প্রভাদেবীর অননুকরণীয় কণ্ঠস্বর যেমন ছিল, তেমনি ছিল মুখাবয়বের আকস্মিক পরিবর্তন ক্ষমতা। বিশেষ করে ওষ্ঠাধর যে কিরকম নীরব কথা কইতে পারে তা প্রভাদেবীর অভিনয়ে সুপ্রমাণিত। ‘সীতা’, ‘রমা’, ‘ভ্রমর’ বা ‘ইন্দুমতী’ চরিত্রাভিনয়ে ওষ্ঠাধরের সাহায্যে প্রভাদেবী অভিমান ও চাপা রহস্য প্রকাশ করতেন।

করুণ রসাত্মক নাটকের করুণ ভূমিকাগুলিতে রূপ দিয়ে প্রভাদেবী অভিনেত্রী জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট সীতা, রমা, মুরা, প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী, কুন্তী-যথাযথ রূপ পেয়েছে। সমালোচকেরা মনে করেন, করুণরসের প্রাধান্য যেখানে কম-সেখানে প্রভা দেবীর কৃতিত্ব সাধারণ স্তরের। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা—উদিপুরী, ষোড়শী, সিরাজী, শীতলসেনী—প্রভৃতি চরিত্রাভিনয়ের উল্লেখ করেন। অবশ্য আমাদের এ রকম সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো মন্তব্য করা অসম্ভব। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধের অভিনেত্রীদের বুঝতে গেলে অবশ্যই নীহারবালা এবং প্রভাদেবীকে আশ্রয় করেই বুঝতে হবে।

॥ দর্শক ॥

বিশ শতকের প্রথমার্ধের দর্শকেরা অবশ্যই গিরিশযুগের যুগের দর্শক ছিলেন না। রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলার পালাবদলের ক্ষেত্রে এঁরা প্রভূত সাহায্য করেছেন। এঁদেরই উৎসাহে এবং অনুপ্রেরণায় পেশাদারী মঞ্চের উনিশ শতকীয় গতানুগতিকতা ভিন্ন পথ নেয়। দর্শকরুচি যে ক্রমে ক্রমে নতুনের পিয়াসী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আছে বরদাপ্রসন্নের মন্তব্যে—

‘আমার ধারণা, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের রুচি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে’।

[মিসরকুমারীর ‘নিবেদন’ অংশ থেকে উদ্ধৃত]

যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতির নানা মন্তব্যেও বুঝতে পারা গেছে—দর্শক রুচি একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের নিয়মে যেন নতুন নতুন নাটককে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে।

শুধু নাটক নয়, নাট্যানুষ্ঠানের সহায়ক প্রতিটি স্তরের শিল্পকর্মের নতুনত্বকে দর্শকেরাই টিকিট কেটে, দর্শনী দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। যেমন ঘূর্ণায়মান মঞ্চে ‘মহানিশা’ শুরু হলে রঙমহলে দীর্ঘদিন আসন সংরক্ষণের জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আবার স্থূল পেশাদারী নাট্যকর্মকে দর্শকেরাই

শাসন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে। এ বিষয়ে মিত্র থিয়েটারের অকাল মৃত্যুর কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। শ্রীরঙ্গমে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হলে দর্শক মহলে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এরই জন্য 'দুঃখীর-ইমান'এর প্রযোজনা।

(১৯২১ ১৯৪৪) এই পর্বের দর্শকদের সম্পর্কে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি অরুচিকর মন্তব্য করতে হবে। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস আলোচনার সময়ে আমরা বারবার বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছি যে সাধারণ দর্শকেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর গতানুগতিকতাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। মঞ্চে সাধারণ মায়া সৃষ্টি করে কিছু যুতসই গান ও নাচ দেখিয়ে অথবা দৃশ্যগুলিকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে, পেশাদারী মালিকেরা দর্শকের বাহবা কুড়িয়েছেন থিয়েটারে প্রবেশপত্র পেয়ে এই দর্শকেরা ছড়া কেটে, মন্তব্য করে নিজেদের সরব উপস্থিতি ঘোষণা করেছেন। এ'দের কাছে 'কর্ণার্জুন', 'চাঁদ সদাগর' ও 'গৈরিক পতাকা'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'টকী'র যুগে এ'রা আবার সিনেমা হাউস পূর্ণ করেছেন। "সিরিয়াস" নাটকের বিজ্ঞাপন এ'দের আকৃষ্ট করতে পারেনি। মঞ্চমালিক এবং অনেক নামকরা অভিনেতারা অর্থ ও যশলাভের সহজ রাস্তা খুঁজে পাবার জন্য এই সাধারণ দর্শকের সাধারণ চাহিদার কাছে নত হয়ে পড়েছেন। কোনো অভিনেতা 'এনকোর' বা 'বাঁধা ক্ল্যাপ' না পেলে মালিকের ভ্রূকুটি দেখতেন। ফলে হাততালির লোভে এল সস্তা প্যাঁচ। জনৈক সমালোচক লিখেছেন, "কর্ণার্জুন—সীতার আমল থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ে 'সীরিয়স' দর্শকদের ভীড় বাড়তে থাকে। থিয়েটার যে শুধু হালকা হাসির আমোদের জায়গা নয়, এ ধারণা ক্রমেই প্রসার লাভ করতে থাকে এবং কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে বিশেষ অবহিত হন।"[২] কথাটির সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমরা জানি বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের দর্শকেরা সকলেই 'সীরিয়স' ছিলেন না। 'কর্ণার্জুন' বা 'সীতা' চলার সময়ে তো নয়ই। সিরিয়াস দর্শকের আগমন হয়েছে তিরিশের দশকে। তবে সংখ্যায় এ'রা খুবই কম।

আসলে এই সময়ের দর্শকদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি। যদিও এই বিভাজন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক নয়। তবু আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে লক্ষ্য করেছি যে, তিন ধরণের দর্শক প্রেক্ষাগৃহে জমায়েত হয়েছেন। এ'রা যথাক্রমে,—

(ক) সাধারণ দর্শক ; অর্ধশিক্ষিত, আমোদপ্রিয় দর্শক।

(খ) শীলিত দর্শক।

(গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দর্শক।

ক. সাধারণ দর্শক

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে সাধারণ দর্শকের পরিমাণ অদ্যাপি সর্বাধিক। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চকে এঁরাই বরাবর বাঁচিয়ে এসেছেন। ফলে এই দর্শকগোষ্ঠীর মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেয় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চকে গতিপথ ঠিক করতে হয়েছে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার দুঃখ করে অহীন্দ্র চৌধুরী কে বলেছিলেন,

> "আমাদের প্রকৃত মনিব হচ্ছে কারা জানেন? ঐ যারা এক টাকা-দু টাকার টিকিট কিনে পিছনের সারিতে বসে। এরা টাকা দিলে তবে আমাদের অন্ন হয়। কাজেই এদের রুচিবহির্ভূত কোনো জিনিস আমরা করতে পারিনা। বিদেশীরা করতে পারে, তাঁদের নাট্য অনুশীলন করবার সুযোগ আছে, তাঁদের এক্স্পেরিমেন্টাল থিয়েটার আছে—চাঁদায় চলে—তাঁরা নতুন জিনিস দিতে পারবেন না কেন?"[১১]

শুধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেন, এযুগের সকলেই অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে সমভাবে বিক্ষুব্ধ। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের সামাজিক চরিত্রটি মঞ্চে উপস্থিত থাকায়—পেশাদারী থিয়েটারগুলি অগ্রগতির নতুন রাস্তা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেয়েছে। এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রের ঘটনা যে, কলকাতার কিছু সাধারণস্তরের মধ্যবিত্ত মানুষ ছিলেন থিয়েটারের নিয়ামক। এই সাধারণ মানুষের দল যখন দর্শক হিসেবে উপস্থিত হলেন, তখন খুব স্বাভাবিকভাবে প্রমোদ উপকরণ হলো এঁদের প্রথম চাহিদা। দেশের বৃহত্তর আন্দোলন ও পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন অদূরদর্শী মানুষের দৃষ্টি যে ঘোলাটে হবে এতে আর সন্দেহ কী। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত দর্শকের প্রত্যাশা সম্পর্কে সম্পূর্ণত সচেতন হয়ে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন,

> "দর্শকদের রুচি উন্নত করা যায়, অবনতও করা যায়। কিন্তু ঐতিহ্যের বিপরীত কিছু দিয়ে খুসি করা যায় না; শিক্ষিতদেরকে যদি বা যায়, অশিক্ষিতদেরকে আদৌ যায় না।...তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ নাটক রসোত্তীর্ণ হওয়ায় ওপর নির্ভর করে, নাটকের আঙ্গিকের ও প্রযোজনার ওপর নয়। নাটক রসঘন হওয়া চাই, এবং সেই রস প্রবহমান থাকা চাই। তাও আবার যে কোন রস হলেই চলবে না, সিন্ধরস – যার পরিচয় তারা বার-বার পেয়েছে রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে; পেয়েছে গীতিকাব্যের মাধ্যমে; পেয়েছে ভাটিয়ালীতে; পেয়েছে খেয়ালে; ধ্রুপদে।"

'মন্ত্রশক্তি' অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ। অভিনীত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। বক্তব্য হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মনের গরমিল দূর হতে বাধ্য, মন্ত্রোচ্চারণ করে, অগ্নি স্পর্শ করে, শালগ্রাম সাক্ষী রেখে, বিবাহ হয়েছিল

বলে। তখন কিন্তু দেশে নারীর অধিকার নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলছে, সাহিত্যে নারীর স্বাতন্ত্র্যের কথাও বড় হয়ে উঠেছে, সিভিল ম্যারেজও চালু হয়েছে।…সেই দিনেও ওই মন্ত্রশক্তি নাটক অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই অপর মঞ্চে আমারই ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'-ও অভূতপূর্ব সমর্থন পায় যাতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী সংসার ছাড়ে, সমাজ ছাড়ে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।"[৬৪]

সত্যিকারের সৎ নাট্যকর্মকে বেছে নেবার ক্ষমতা অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দর্শকের কোনো কালেই নেই। এঁরা ভালো নাটককে ভালো বলেন কখনো-সখনো। আবার মন্দকে চট করে মন্দ বলতে পারেন না। এই ধরণের দর্শককে খুশি করার সহজ রাস্তা হলো--কিছু চকচকে পোষাক, সামান্য কিছু মঞ্চ মায়া, সুদর্শন ও সুদর্শনা নায়ক-নায়িকা, কড়া সংলাপ, জমাট মিলনান্ত কাহিনী। বলাবাহুল্য, আজও এই রকমের দর্শক আছেন এবং সেদিন তো ছিলেনই।[৬৫] এইখানে অপরেশচন্দ্রের বক্তব্যের একটু প্রতিবাদ করছি। আমাদের জানা আছে—অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত দর্শক মাত্রেই এক টাকা দু' টাকার খদ্দের ছিলেন না। সামনের সারিতেও এঁদের দেখা যেত।

খ. শীলিত দর্শক

বর্তমান পর্বে শীলিত দর্শকবৃন্দ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ের শীলিত দর্শকেরা আর লুকিয়ে লুকিয়ে দীর্ঘ ভনিতা করে থিয়েটারে আসেন নি। যাঁরা এসেছেন তাঁরা সরবে এবং সদলবলে এসেছেন। একবার আসেননি, একাধিকবার এসেছেন। বিশিষ্ট মানুষের সাহচর্য এবং সমালোচনার দ্বারা রঙ্গমঞ্চ নানাবিধ ভাবে উপকৃত হয়। অভিনয়, সঙ্গীত ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেটুকু পালাবদল ঘটেছে তার মূলে শিষ্ট মানুষের দানের কথা আমরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হব না। পরিশীলিত দর্শকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চমালিক ও প্রয়োগাচার্যরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলে মধ্যযুগীয় পুচ্ছগ্রাহিতা থেকে রঙ্গমঞ্চ বারবার বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল; এবং নবনাট্য আন্দোলনের মূলে এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সবচেয়ে জরুরী। সাধারণ দর্শকেরা পেশাদারী মঞ্চকে অর্থ দিয়েছেন; শীলিত দর্শকেরা দিয়েছেন এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সাহস। তবে সাম্প্রতিক কালের তুলনায় বিগত যুগের শীলিত মানুষেরা সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন মঞ্চের দর্শক হিসেবে। থিয়েটার সম্পর্কে তাঁদের অরুচিও খুব কম ছিল না। 'মশাই স্টার থিয়েটারটি কোথায়? জানি, কিন্তু বলব না"—এই স্মরণীয় প্রবাদটির জন্ম হয়েছিল এই সময়েই।

গ. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দর্শক

১৯৩০ সাল থেকে পেশাদারী মঞ্চে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দর্শকেরা আসতে শুরু করলেন। এঁরা একেবারে বিশ শতকের নব্য দর্শক। থিয়েটার থেকে কিছুটা আমোদ এবং একই সঙ্গে শিক্ষা ছিল এঁদের কাম্য। শুধুমাত্র আমোদের জন্য এঁদের কেউ কেউ আসেননি তা নয়। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকার জন্য এঁরা থিয়েটারকে ছোট করে দেখতে চাননি। বিশ শতকের তিরিশের শিক্ষিত বাঙালী ছাত্রদের কাছে আদর্শ ছিলেন চারজন মানুষ। রাজনীতি গগনে এঁদের ধ্রুবতারা সুভাষচন্দ্র বসু, সঙ্গীতজগতে দিলীপ রায়, কাব্য-কবিতায় নজরুল ও নাট্যজগতে শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিরিশের যে সব শিক্ষিত ছাত্র সেদিন মঞ্চে যেতেন তাঁদের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ লোকান্তরিত। এঁদের মধ্যে কেউ হয়েছেন সাহিত্যিক, কেউ বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, আইনজীবী আবার কেউ বা রাজনীতিবিদ্। সেদিনের এই সব বিখ্যাত ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, থিয়েটার এঁদের কাছে অনেকেরই কাছে যথার্থ নাট্যমন্দির বলে বিবেচিত হতো। এঁরা অভিভাবকের ভয়-ভীতি অগ্রাহ্য করেও নটনাথের আলয়ে আসতেন। মফস্বলের ছাত্রদের কাছেও থিয়েটার দেখার ব্যাপারটি ক্রমে ক্রমে প্রিয় হতে পেরেছিল। সেদিনের মফস্বলের ছাত্ররা আজও স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে একথা আমাদের বলেছেন। বর্তমানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দর্শকের সংখ্যা সঙ্গত কারণেই বিবর্ধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট ১

স্বপ্নের থিয়েটার : বাস্তবের লেবেডেফ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) অব্যবহিত পরে (১৭৯৫) এক রুশ-দেশীয় মনীষী ব্যক্তিগত উদ্যোগে তদানীন্তন ডোমতলায় (বর্তমান, এজরা স্ট্রীট) প্রতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। এই ২৫ নং ডোমতলার ভবনটি ছিল জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের। লেবেডেফ মাসিক ৬০'০০ টাকা ভাড়ায় গৃহটি অধিগ্রহণ করে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নাট্যশালাটি স্থাপন করেন।

লেবেডেফের সম্পূর্ণ নাম হলো গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ। মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৪৯ সালে রাশিয়ার ইয়ারস্লাভ্ল শহরে। লেবেডেফ খুব অল্প বয়সেই লেনিনগ্রাদে (পিটার্সবুর্গ) বাবার কাছে চলে এসেছিলেন। এখানেই শুরু হয় তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা। এরপর লেবেডেফ চলে যান ইটালীতে। তারপর তাঁকে দেখা যায় ভিয়েনায়, প্যারিসে, অস্ট্রিয়ায়, ইংল্যাণ্ডে। ১৭৮৫-তে লেবেডেফ মাদ্রাজে এসে পেঁছিলেন। এখানে তিনি নানা সংগীত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর কলকাতায় আসেন ১৭৮৭ সালে। কলকাতাতেও নানা সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন লেবেডেফ। গবেষক বলেছেন—কলকাতায় অন্তত পাঁচটি অনুষ্ঠানে লেবেডেফ যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে লেবেডেফ যখন কলকাতায় পা দিলেন তখন 'আমাদের' কোনো থিয়েটার ছিল না। সেই সময় থিয়েটারগুলি সবই ছিল বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত, বিদেশী থিয়েটারের ধাঁচে গঠিত। যেমন—'The new play house', 'The Calcutta' ইত্যাদি। সেদিন দর্শক হিসেবে যাঁরা থিয়েটারে আসতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রায় বিদেশী। আর বাকি যাঁরা আসতেন তাঁরা হলেন এদেশীয় রাজা মহারাজা। বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের মতো কেউ কেউ সাহেবদের সাথে যোগ দিলেও ইতিহাস বলছে, এইসব মঞ্চে সেদিন সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার স্বাভাবিক ছিল না।

অক্লান্ত পড়ুয়া জাতশিল্পী লেবেডেফ ভায়োলিন-চেলো বাজিয়ে শহর কলকাতায় যখন সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেইসময় অসাধারণের প্রতি তীব্র অনুরাগ তাঁকে নিয়ে এল থিয়েটারের জগতে। কলকাতায় ইংরেজদের 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর দৃশ্যপট ও অভিনয় এবং ইংরেজ অভিনেত্রী মিসেস

রিস্টোর নাচ-গান এ-ব্যাপারে তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। থিয়েটারের প্রতি আন্তর অনুরাগ এবং শিক্ষক গোলকনাথ দাসের উৎসাহে ১৭৯৫ সালের ১ জানুয়ারী একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাকল্পে লেবেডেফ জগন্নাথ গাঙ্গুলীর বাড়ী ভাড়া করেন। এখানে থেকেই শুরু হলো 'বেঙ্গলী থিয়েটার' ও নাট্যামোদী লেবেডেফের জয়যাত্রা। লেবেডেফ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—

> "সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার নাটক মঞ্চস্থ করতেই হবে ; পিছোলে চলবে না ; স্তরাং দিন ঠিক হোলো ১৭৯৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর।"

লেবেডেফ 'The Disguise' ও 'Love is the best Doctor' নামে দু'খানি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। 'The Disguise' এক অকিঞ্চিৎকর ইংরেজ নাট্যকার এম· জোডরেলের রচনা। 'Love is the best Doctor' কার রচনা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে এটা বলা যায় যে নাটকটি মেডিসিন মাল· গ্রে লুই-এর ইংরাজী নাটকের ভাবানুবাদ। জানা যায়, নাটক দু'টি অনুবাদ করার পর লেবেডেফ মঞ্চের নক্‌শা তৈরী করেন। শিক্ষক গোলকনাথ দাসকে অভিনেতা অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে বলেন এবং স্বীকৃত শিল্পীদের নিয়ে দৃশ্য প্রভৃতি আঁকিয়ে নেন। এরপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৯৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর The Disguise-এর বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল'এর অভিনয়ানুষ্ঠান উদ্বোধিত হয়।

নাতিসম্প্রতি (২৮ আগস্ট, শুক্রবার, ১৯৯৫) পি. টি. নায়ার 'গণশক্তি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে Love is the best Doctor নাটকের অভিনয় হয় ২১ মার্চ, ১৭৯৬। আমাদের ধারণা, এ-তথ্যটি সত্য নয়। আসলে ঐ তারিখে 'কাল্পনিক সংবদল'এর দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল। এর বিজ্ঞাপন বেরেয়েছিল ১০ মার্চ, ১৭৯৬। দর্শকেরা যাতে ভালো করে দেখতে পান তার জন্যে আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল দুইশত। প্রথম অভিনয়ে গ্যালারীর টিকিট মূল্য চার টাকা এবং বক্স ও পিটের মূল্য আট টাকা ধার্য করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিনয়ে টিকিটের হার ছিল One Gold Mohur। লেবেডেফের বক্তব্য অনুযায়ী দু'টি অভিনয়েই নাট্যশালা লোকলক্ষ্মীর সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন Overflowing house। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লেবেডেফকে ইংরাজী এবং বাংলা অভিনয়ের অনুমতি বা ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। মনে হয়, প্রথম দিনে শেতাঙ্গদের কথা ভেবেই লেবেডেফ একটি দৃশ্য মূল ইংরাজীতেই অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু যার জন্য তিনি এত করলেন তাই শেষপর্যন্ত তার কাল হয়ে উঠল। এক গভীর চক্রান্তের শিকার হলেন লেবেডেফ। তাঁর নাট্যশালা ভস্মীভূত হলো।

নানা মামলা মোকন্দমায় জড়িয়ে পড়লেন অতিষ্ঠ লেবেডেফ। এই জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই তিনি ২৩ নভেম্বর ১৭৯৭ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

লেবেডেফ যে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পেরেছিলেন সেটা আদৌ নাটক হয়েছিল কিনা এ-বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। কারণ একটি নয়, একাধিক।

প্রথমত, 'কাল্পনিক সংবদল'এর syntax নানা ত্রুটিপূর্ণ

দ্বিতীয়ত, Disguise-এর বাংলা করা হয়েছে 'সংবদল', act-এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'ক্রিয়া', scene-এর বঙ্গানুবাদ 'ব্যক্ততা'।

তৃতীয়ত, নাটকটি পুরোপুরি অনুবাদ নাটক নয়। দেশীয় লোকের মনোরঞ্জনের জন্য লেবেডেফ যোগ করেছেন নতুন নতুন চরিত্র গাউয়া, বাজিয়া, নাচিয়া, খুনিয়া প্রভৃতি। যুক্তি হিসাবে লেবেডেফ বলেছেন— Indian preferred mimicry and Drollery ...... ।

চতুর্থত, ইতিহাস বলেছে, নাটকটিকে Indian style-এ পরিবেশন করার জন্যে লেবেডেফ ব্যবহার করেছিলেন Indian serenade।

এ-সত্ত্বেও জ্ঞান-তাপস লেবেডেফের কাছে আমরা নানা দিক থেকে অধমর্ণ :

- ☐ বেঙ্গলী থিয়েটারের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন লেবেডেফ।
- ☐ তিনি প্রমাণ করেছিলেন বাংলা ভাষাতেও নাটক লেখা সম্ভব।
- ☐ তিনি আমাদের মন থেকে হীনতাবোধকে মুক্তি দিয়েছিলেন।
- ☐ নতুন নাট্য বিষয়ের সন্ধান করেছিলেন লেবেডেফ।
- ☐ লেবেডেফ বাংলার মাটিতে বিদেশী মঞ্চের বীজ বপন করেছিলেন।
- ☐ তিনি নাটকে Bengalee style-কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
- ☐ লেবেডেফ ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন যে, বাঙালীরা Mimicry ও Drollery পছন্দ করে।
- ☐ ড. অরুণ সান্যাল মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন যে লেবেডেফ ভারতচন্দ্রের 'প্রাণ কেমন রে করে না, দেখে তাহারে', ও 'গুণ সাগরের নাগর রায়/নগর দেখিয়া যায়' গান দু'টি ব্যবহার করেছিলেন।

লেবেডেফের প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী থিয়েটার' একটি অস্থায়ী থিয়েটার একথা সত্য। সত্য যে, এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য অসম্ভব রকমের বেশী ছিল। আর লেবেডেফ যে সময় থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সময় থিয়েটার-পাগল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও উদ্ভব হয়নি।

তথাপি লেবেডেফ থিয়েটার ও নাটকের যে স্বরলিপি রচনা করেছিলেন ইতিহাসের নিরিখে তাকে অস্বীকার করার কোনো হেতু নেই। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ অবশ্যই একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

পরিশিষ্ট ২

নবান্ন : সঙ্ঘশক্তির স্বীকৃতি

'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী' লিখেছিলেন যে বিজন ভট্টাচার্য তাঁরই লেখা চার অংকে বিভক্ত পনেরোটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ কালজয়ী নাটক 'নবান্ন'। খুব উচ্চাভিলাষী রচনা না হলেও 'নবান্ন' একটা ক্রান্তিকালের নাটক। যখন— 'দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ/সংহত বাংলাদেশে/চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে'।

মূলত মধ্যবিত্তের দ্বারা রচিত, প্রযোজিত ও অভিনীত এই 'নবান্ন' নাটকটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সমাজের একটা পালাবদলের ইতিহাস। একেই বিজন ভট্টাচার্য বলেছেন—'এটা ব্যবস্থার ওলট পালটের ইতিহাস।' আসলে 'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন' (১৮৬০—১৯৪৪) অনেকটা দূরের পথ।

'নীলদর্পণে'র রূপকার গ্রাম-জীবনের পটভূমিকায় ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে শ্বেতসন্ত্রাসের কথা বলেছিলেন। একটির পর একটি চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে, মৃত্যু দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দীনবন্ধু দেখাতে চেয়েছিলেন—'বাপরে বাপ নীলকরদের কি অত্যাচার!' দীনবন্ধুর সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো সংশয় নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন—নীলদর্পণ বাংলার 'Uncle Tom's Cabin'. নীলদর্পণ সেদিনকার সামাজিক নাটক হলেও আজকের বিচারে ঐতিহাসিক নাটক।

নীলদর্পণের মত নবান্ন নাটকটিও ভারতবর্ষের এক বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক দলিলকে তার পক্ষপুটে আগলে রেখেছে। এই নাটকেও আছে পরাধীন ভারতের শোষণ বঞ্চনার করুণ ইতিহাস। এ-নাটক আকালের সন্ধানে বৃত। মৃত্যুর মিছিল আছে এ-নাটকে। প্রধানের দুই পুত্র মারা গেছে। বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছে পঞ্চাননী, অনাহারে মারা গিয়েছে মাখন, মারা গিয়েছে দয়ালের স্ত্রী। দৈহিক মৃত্যু না হলেও প্রধান সাময়িকভাবে মৃতপ্রায় হয়েছে। শহরে এসে কুঞ্জও মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করেছে। 'নীল দর্পণে'র নবীনমাধবের সংগে কুঞ্জের একটা সাধর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে। নিরঞ্জন যেন কতকটা রাইচরণ।

এই সাধর্ম সত্ত্বেও 'নবান্ন' একটা বিশাল ক্যানভাসের উপর স্থাপিত। 'নবান্নে'র রূপকার আমাদের বুঝিয়ে দেন প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন বা দয়াল এরা কেউই Individual নয়। আমিনপুরকে একটা বিশেষ অঞ্চল বলে ভাববার কোনো কারণ নেই। এ-নাটক বিপর্যয় ও প্রতিরোধের নাটক। এ-নাটক শুধু কৃষিপল্লীর সমস্যাদীর্ণ নাটক নয়—এই নাটকের সংগে যুক্ত হয়ে আছে ভারতবর্ষের রাজপথ-জনপথের সমস্যা। মানুষের বেঁচে থাকার নানা দাবী আছে এই নাটকে। এ-নাটক বন্ধন ও মুক্তির নাটক। তাই নবান্নে শুধুমাত্র শোষণ বঞ্চনার স্বরূপই উদ্ঘাটিত হয়নি—বিজন ভট্টাচার্য একটা আদর্শকে সামনে রেখে জন বা গণের সামনে guide line বা পথনির্দেশিকা নির্মাণ করেছেন। দীনবন্ধু অত্যাচারকে দেখেছিলেন, সমস্যার সাথে তার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। কিন্তু পথের শেষ কোথায় তা তিনি জানতেন না। তবু পথের প্রান্তবর্তী বিজন ভট্টাচার্য 'আগুনে'র মধ্য দিয়ে হেঁটে এসে যে 'জবানবন্দী'-র দায়াদ পেশ করেছেন তারই নাম 'নবান্ন'। সুতরাং সেদিনের বিচারে সামাজিক নাটক হলেও আজকের বিচারে নবান্ন হলো একটি কলঙ্ক ও মরাচাঁদের দলিল। যদি 'নবান্ন'কে ঐতিহাসিক নাটক বলতে আমাদের আপত্তি থাকে তবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে হয় এটি প্রথম বাংলা ভাষায় লিখিত Documentary Drama।

১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই বছরই ১ সেপ্টেম্বর হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়। পোল্যাণ্ডকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। ১৯৪১-এর ২২ জুন সোবিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থ যায় বদলে। ১৯৪১-এর ৮ সেপ্টেম্বর জাপ সেনা চুর্ণ করে দেয় মালয় উপদ্বীপের অনেকগুলি ব্রিটিশ ঘাঁটি। ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজশক্তি ভারতবাসীর সাহায্য চায়। ১৯৪২ এর ১৯-এ এপ্রিল বাপুজী 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন—

> "ইংরেজের উচিত এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া, কারণ ইংরেজ আছে বলেই জাপান ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করছে।"

পরাধীন ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন। সদাশয় ইংরেজ সরকার এ-সময় কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে। দূরদর্শী মহাত্মা সেদিন বলেছিলেন—'সারে হিন্দুস্থান মে জ্বালামুখী ফুটেগী।' গান্ধীজীর এই বক্তব্য দিকে দিকে নাদিত হলে দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ইংরেজ সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ১৯৪২-এর ১৭ ডিসেম্বর পাঁচ শতাধিক তাজা প্রাণের বিনিময়ে গড়ে

ওঠে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস দলের সাথে সেদিনের কমিউনিস্ট পার্টিও প্রচার চালায়।

১৯৪২ সালের ১ মে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে Denial policy। দশজনের বেশী যাত্রীবহনক্ষম নৌকাগুলিকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সরিয়ে দেওয়া হয়। 'পোড়ামাটি নীতি' তৈরী করে নষ্ট করে দেওয়া হয় গোলার ধান। ফলে অনিবার্যভাবে দুর্ভিক্ষ ও বেকারীর জন্ম হয়।

বিপর্যয়ের শেষ এখানেই নয়। ১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবর এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মেদিনীপুর আর ২৪ পরগণার চার হাজার বর্গমাইল অঞ্চলে দাপিয়ে পড়া ঘূর্ণি ঝড়ে মারা যায় ২৫ লক্ষ মানুষ। খাদ্যের অভাবেও মারা যায় বেশ কিছু মানুষ আর পশু। এই বিপর্যয়কে মূলধন করে, দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে আসে মুনাফা শিকারীর দল। এরা একে একে নেয় জমি, গবাদি পশু, থালা বাসন, পুত্র কন্যা—এমনকি এরা 'নারীকেও নিয়ে যায়।'

নবান্নের স্রষ্টা বিজন ভট্টাচার্য চারটি অংক জুড়ে পনেরোটি দৃশ্যের ব্যূহ রচনা করে আলোচ্য ইতিহাসের documentation ঘটিয়েছেন।—প্রথমে বলেছিলেন চড়াইয়ের কথা, পরে বললেন উৎরাইয়ের কথা। তাই 'নবান্ন' যেমন ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত নাটক, তেমনি এ হলো—চড়াই-উৎরাইয়ের নাটক। বিষম জ্বালায় মানুষ পুড়ে পুড়ে সোনা হয়। সোনার মানুষ নবান্ন উৎসব করে; শপথ নেয়—'জোর প্রতিরোধ এবার'। 'নবান্নের' স্রষ্টা বলেন, একা একা লড়াই করা যায় না। প্রয়োজন হয় সংঘশক্তির। সেকালে বলা হয়েছে 'নবান্ন' হলো প্রতিরোধের নাটক, জন বা গণনাট্য।

আসলে 'নবান্ন' তথাকথিত জনমনোরঞ্জক নাটক নয়। হাতিবাগানের প্রমোদশালাগুলিতে যে নাট্যচর্চা আজও অব্যাহত তার সঙ্গে নবান্নের কুটুম্বিতা নেই। এ-নাটক লেখা হয়েছিল রোমা রোঁলার 'people's theatre'-এর তত্ত্বকে মনে রেখে। Peoples Theatre আলোচনা প্রসঙ্গে রোমা রোঁলা বলেছিলেন—

- ☐ নাটক হবে সাধারণ দর্শকের জন্য।
- ☐ নাটককে হতে হবে সরল ও প্রত্যক্ষ।
- ☐ থিয়েটার হবে মেহনতী মানুষের থিয়েটার। সেখানে মানুষের জীবন-সমস্যা আলোচিত হবে।
- ☐ সাধারণ দর্শক যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।
- ☐ থিয়েটার হবে উদ্দেশ্যমূলক।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ মনে করতেন 'Peoples theatre stars people'। তারা মনে করতেন নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষের সংগ্রাম, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক স্থিতির কথা বলতে হবে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এ-কথা স্মরণে রেখেই রচনা করেছিলেন 'আগুন', 'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন'। 'দেবীগর্জন'-এও তিনি একই কথা বলেছিলেন। সুতরাং 'নবান্ন' 'নীলদর্পণে'র মত গ্রামজীবনের পটভূমিকায় রচিত একটি বিশেষ সমস্যার নাটক নয়। এ নাটক চাষাভূষার নাটকও নয়। এর আয়াম অনেক বড়। 'নবান্ন' বাংলাভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ গণনাট্য। এর পটভূমি আমিনপুর হলেও মনে রাখতে হবে নাট্যবিষয় আছড়ে পড়েছে কলকাতার কংক্রিটের বুকে। বিজন ভট্টাচার্য এই নাতিদীর্ঘ নাটকটির মধ্য দিয়ে জনগণের প্রকৃত অবস্থাটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং অনেকাংশেই কৃতকার্য হয়েছেন।

পরিশিষ্ট ৩

নাট্য সংলাপ ও নবান্ন

'নবান্ন' (১৯৪৪) বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক নয়—হিসেব মতো তৃতীয় নাটক। এর আগে তিনি লিখেছিলেন 'জবানবন্দী' ও 'আগুন'। জানা যায় দীর্ঘ ছয় মাস ধরে 'নবান্ন' নাটকের মহলা চলেছিল। ছাপা নাটকের সঙ্গে অভিনীত নাটকের কিছু অমিল লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি ছাপা নাটকের সিংহভাগই অভিনীত হয়েছিল। অভিনয় ব্যাপারটার সাথে বিজন ভট্টাচার্যের সম্যক পরিচয় হয়েছিল এ তথ্যও আমাদের জানা। তিনি যখন আনন্দবাজারের কর্মী—তখনও মনে মনে ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা। কাজেই আমাদের ধারণা অমূলক হবে না যে, সাংবাদিক হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন নাটক রচনাকালে তিনি তাকেই কাজে লাগিয়েছেন। আর এই জনাই 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ লাভ করেছে এক আশ্চর্য সজীবতা। উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ও নাটকীয়তার দিক থেকে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ যথাযথ হয়েছে সন্দেহ নেই। নাটকটি পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন—

ক. আঞ্চলিক সংলাপ

খ দীর্ঘ সংলাপের বদলে ছোট ছোট বাক্য, এমনকি অসমাপ্ত উক্তিকেও সংলাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. নাটকের ঘটনা যখন শহর কেন্দ্রিক হয়েছে, তখন বিজনবাবু তাঁর নাট্য সংলাপকে যথেষ্ট শহুরে করে তুলেছেন।

ঘ. চরিত্রগুলিকে পৃথক করার জন্য তিনি তাদের মুখের ভাষা বদলে দিয়েছেন।

ঙ. ভাষার আলো আঁধারিতে কখনো তৈরী হয়েছে 'Poetry of moments'।

চ মাঝে মাঝে কোনো কোনো সংলাপ জ্যা মুক্ত ধনুকের ছিলার মতো অবাধ্য হয়ে উঠেছে এবং গড়ে তুলেছে তাণ্ডব নৃত্য। যার রণন দর্শকের হৃদয় বিদীর্ণ করে।

আঞ্চলিক সংলাপ

নিরঞ্জন। তা ওগুলো নিয়ে আবার কোথায় চললে?

কুঞ্জ। দোকানে, আবার কোথায়? পেট তো ভরাতে হবে গুষ্টির।

প্রধান। ও মাখন, মাখন।

নিরঞ্জন। দূত্তুর কলা নিকুচি করেছে তোর সংসারের। শালা আজই আমি চলে যাব।

বিনোদিনী। কোথায় যাবে ?

নিরঞ্জন। এই এলেন আবার এক সঙ্। যত সব হয়েছে।

এই সংলাপ বঙ্গালী উপভাষার উপর দাঁড়িয়ে আছে। দীনবন্ধুও এই বঙ্গালী উপভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নাটকে। দীনবন্ধুর মাত্রাজ্ঞানের অভাব থাকায় তাঁর সাফল্য নিরংকুশ হয়নি। বিজনবাবু এক্ষেত্রে ভাগ্যবান ও কৃতকর্মা শিল্পী। আসলে তিনি সরাসরি মুখের ভাষাকে ব্যবহার করলেও নিয়ন্ত্রণটা রেখেছিলেন নিজের হাতে।

নাটকের সংলাপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Nicoll তাঁর 'The Theory of Drama'-র ৬৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বলেছিলেন—'ভাল সংলাপ মানে এই নয় যে সেটা কাব্যসংলাপ; যা চরিত্রের উপযোগী হবে এবং চরিত্রকে বোঝাতে সাহায্য করবে সেটাই হলো যথার্থ নাট্য সংলাপ।' ৮৪ সংখ্যক পৃষ্ঠায় Nicoll আবার বলেছেন—'কমিক তৈরী করতে গেলে উপভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত এবং নাটকের বিষয় যেখানে শোকার্ত সেখানে ব্যবহার করতে হবে Non-Standard Speech.' বিজন ভট্টাচার্য Nicoll-র গ্রন্থ পড়ে সংলাপ নির্মাণ করেননি একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে তাঁর সাফল্য অনিকেতও ছিল না। সংলাপ রচনায় যে জিনিসটা আমাদের খুবই আকর্ষণ করে তা হলো 'নবান্ন' নাটকের ছোট ছোট সংলাপ। যেমন—

দয়াল। কী বিষয় ?

প্রধান। আর কী বিষয়!

দয়াল। তবু শুনি।

কুঞ্জ। বিষয়টা হচ্ছে এই জমি জমা বিক্রি করা নিয়ে।

দয়াল। বেশ।

আমিনপুর ত্যাগ করে ২য় অংকে ঘটনা যখন চলে এল কলকাতার দিকে ঠিক তখনই নাট্যকার সুর বদলে দেন। যেমন—

১ম ফটোগ্রাফার। মুখার্জী।

২য় ফটোগ্রাফার। ইঁ্যা।

১ম ফটোগ্রাফার। একটুখানি হাসি ফোটাতে পারো, হাসি। জাস্ট এ বিট অব স্মাইল্। দ্যাখো না ভাই একটু চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। হাসি ?

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ ছবিখানার তাহলে নাম দিতে পারি 'বাংলার ম্যাডোনা'।

এই ২য় অংকেরই ৩য় দৃশ্যে আছে বড়কর্তার সংলাপ :

বড়কর্তা। আর বলো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তার ওপর আবার এই ওয়েদার। আমারই দুরদৃষ্ট আর কী! এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা—

লক্ষ্য করার বিষয়, খুব সচেতনভাবে বিজনবাবু চরিত্রের মুখে উপযুক্ত ভাষা বসিয়েছেন। মধ্যবিত্তের ভাষাকেও তিনি দু' ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—নির্মলবাবুর ভাষা আর তৃতীয় ভদ্রলোকের ভাষায় একটা দূরত্ব আছে। বরকত যে ভাষায় কথা বলে, দিগম্বর যে ভাষায় কথা বলে, নিরঞ্জন কিন্তু সে ভাষায় কথা বলে না। আবার কুঞ্জ যে ভাষায় কথা বলে রাধিকা সবসময় সেই ভাষায় কথা বলে না।

কুঞ্জ। কেন, কিসের জন্যে! গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে. —চেঁচাও, —অন্তত আর পাঁচ জন মানুষ জানুক।

[২য় অংক. ৫ম দৃশ্য]

রাধিকা। চল না, আমার কি অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব? সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত।

[৩য় অংক/১ম দৃশ্য]

'নবান্ন' নাটকে ডাক্তারের একটি সংলাপ যুগপৎ যেমন শিক্ষিত মানুষের ভাষা, তেমনি একটি অশান্ত সময়ের ভাষাও :

'দি ফিউচার ইজ্ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি, মার্ডার্ড বাই থিভস্ অ্যান্ড বাংলাস''।

এছাড়াও নাটকে কালীধনের কর্মচারী রাজীবের সংলাপ যথেষ্ট আকর্ষণীয়। রাজীব কালীধনের দুকাঠি উপরে—সংলাপই তার প্রমাণ।

রাজীব। আরে এগুলা কি পাগল নি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রেট এই বাবু টঁ্যাকে রাইখ্যা পারে তা নি জানো! আহাম্মক কোহান্কার, তুমি দ্যাখাও পুলিশের ভয়!

[২য় অংক / ১ম দৃশ্য]

পোয়েট্রি অব্ মোমেন্টস্

আমাদের দেখার জগৎটা, গদ্যের জগৎটা কখনও কখনও কবিতা হয়ে যায়। আমরা বুঝতেই পারি না কখন আসে সেই একান্ত মুহূর্তের ভাষা। কিন্তু অনুভব করে অভিভূত হই। বুঝতে না পারলেও সে ভাষা কাব্যের বর্ণময় পোষাক না পরেও ছুটে আসে গদ্যের রাজপথ ধরে। যেমন, নাটকের

শুরুতে আছে—'এগিয়ে যা এগিয়ে যা সব'। ১/৩-এ দয়াল বলেছে—'চারিদিকে সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই, শুধু জল…সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে।' ১৫-এর শেষ সংলাপটি হলো—'মাখন চলে গেলি।' ৪।৩ এর শেষ সংলাপে দয়াল যখন বলে—'এবারের আকাল আমাদের আর আত্মীয় পরিজনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না', কিংবা, 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার'—তখন আমরা বেশ বুঝতে পারি নাট্যকারের মনে poetry ছিল। বিজনবাবু গদ্যের মধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতার জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রয়াস শম্ভু মিত্রের নজর এড়ায় নি।

এতদ্ সত্ত্বেও নবান্নের সংলাপের বেশ কিছু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে ঃ

প্রথমত. নবান্নের স্রষ্টা বড় বেশী কথার কারবার করেছেন। লক্ষ্য করা যায়, প্রায় সকলেই বড় বেশি কথা বলেছে এবং সেখানে একটুও relief নেই।

দ্বিতীয়ত, কৃষকের মুখে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেক সময় কৃত্রিম বলে মনে হয়। বিশেষ করে প্রধানের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তৃতীয়ত, যে কোনো একজন ভাষাবিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়বেই যে, বিজনবাবু বিভিন্ন ডায়ালেক্ট (dialect) মিশিয়ে ফেলেছেন। 'একটা'কে 'এট্টা' বা 'এসেছে'কে 'এয়েছে' লিখলেই তা কৃষকের ভাষা হয় না।

চতুর্থত, 'নবান্নে'র সংলাপের মধ্যে আরও বেশী কাব্যগুণ ছিল আমাদের প্রত্যাশিত। নাট্যকার আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেন নি।

পঞ্চমত, হারু দত্ত বা কালীধনের সংলাপ প্রত্যাশার তুলনায় আকর্ষণীয় হয়নি।

ষষ্ঠত, ভদ্রলোকের সংলাপ ব্যবহার করতে গিয়ে নাট্যকার বড় বেশী ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর ফলে সংলাপ হয়েছে কৃত্রিম এবং তা গণনাট্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

তবে এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও নাট্যকারের ইতিবাচক প্রয়াস সম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় নেই। সামগ্রিক বিচারে এর গুণের দিকটা ত্রুটিকে ছাপিয়ে অনেক বড় মাত্রা পেয়ে গিয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪

'৫০ এর নাটক "ছেঁড়াতার"

"সময়টা ৫০ সালের গোড়ার দিক। আমরা ইতিপূর্বে তুলসীবাবুর 'পথিক' অভিনয় করেছি।.........এমনি সময় বহুরূপীর আসরে তুলসীবাবু একদিন একটা গল্প শোনালেন। আমরা সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। তাঁকে অনুরোধ করলাম গল্পটিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য। আমাদের সকলের উৎসাহে বিশেষ করে শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে তিনি একদিন নাটক লিখে নিয়ে এলেন –সেই নাটকই – 'ছেঁড়াতার'।"

[অমর গঙ্গোপাধ্যায়]

তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' [কার্তিক ১৩৫৯, ১৯৫২] শুধু একটি মঞ্চসফল নাটক নয়, অনেকাংশে এই নাটকের সঙ্গে 'নবান্নের' (১৯৪৪) মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মনোধর্মে 'ছেঁড়াতার' 'নবান্নের' নিকটাত্ম, গণ নাট্যেরও নিকটাত্ম। মনে রাখতে হবে, 'নবান্নের' মহলা চলাকালীন ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে তুলসী লাহিড়ী 'দুঃখীর ইমানের' পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন। গণনাট্য সংঘ এই নাটকের অভিনয় না করলেও 'দুঃখীর ইমান' শিশিরকুমারের অধ্যক্ষতায় শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয়েছিল (বর্তমান বিশ্বরূপায়)। শ্রীযুক্ত সুধী প্রধান আমাদের জানিয়েছেন, গণনাট্য সংঘের অষ্টম জাতীয় সম্মেলনে (১৯৫৭-৫৮) তুলসী লাহিড়ী 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পাঁচের দশকে গণনাট্য সংঘে তুলসী লাহিড়ীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এই তুলসী লাহিড়ী 'নাট্যকার' শীর্ষক একটি একাঙ্কে জনৈক দীনবন্ধুবাবুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"আপনাদের মত সুবিধাবাদী, আত্মসুখ-সর্বস্ব লোকেরা সমাজের শীর্ষস্থান নানা ছলে দখল করে মানুষের মন কলুষিত করছেন। তাদের মুখোশ খুলে দেওয়াও নাট্যকারের ধর্ম।"

'নাট্যকারের ধর্ম" সম্পর্কে একটা বিশেষ ধ্যান-ধারণা পোষণ করার জন্য তুলসী লাহিড়ী 'নবান্নের' পথকে আপনার পথ বলে বিবেচনা করেছেন। তাই 'নবান্নের' সঙ্গে 'ছেঁড়াতারের' একটা ভাবগত ও কাঠামোগত ঐক্য লক্ষ্য করি।

- নবান্নের মত এই নাটকেও কৃষি পল্লীর সমস্যাকে নাটকের কেন্দ্রে আনা হয়েছে ; নাটকের নায়ক রহিম লেখাপড়া শিখলেও কৃষিকর্মের সাথে যুক্ত।
- নবান্নের মত এই নাটকেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ব্যবহৃত।
- বিজন ভট্টাচার্যের মত তুলসী লাহিড়ীও বলতে চেয়েছেন, দুর্ভিক্ষের কালে সাধারণ মানুষের শত্রু হয়ে ওঠে কতিপয় মানুষ।
- তাই হারুদত্তের সঙ্গে হাকিমুন্দীর কোনো পার্থক্য থাকে না।
- 'নবান্নে' কুঞ্জ রাধিকাকে ভাগ করে দিয়েছিল অভাব ; 'ছেঁড়াতারে' রহিম ও ফুলজানের মাঝখানে প্রাচীর তুলে দিয়েছে সেই খাদ্যাভাব।
- 'নবান্ন' নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে হারু দত্তের সঙ্গে কালীধন ধাড়ার একটা ঐকসূত্র। নাট্যকার বলেন, ওরা chained। ছেঁড়াতারে'ও দেখানো হয়েছে হাকিমুন্দী আর প্রেসিডেন্ট-এর মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।
- 'না খেতে পাওয়ার অসুখ' উভয় নাটকে আছে।
- 'নবান্নের' মাখন আর 'ছেঁড়াতারের' বসিরের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে।
- এককথায় 'নবান্ন' ও 'ছেঁড়াতারের' মধ্যে আছে সমর সেন উচ্চারিত সেই ক্রান্তিলগ্নের বাণী—

> "বাজারে দারুণ ভিড় ; দুর্ভিক্ষের করাল ছাপ
> অনেকের মুখে।
> ভারতের হৃৎপিণ্ডে হানা দেয় বিদেশী বণিক
> পূর্ব সীমান্তে ক্রমশঃ জমে উঠে পীত সৈনিক ॥"

এইখানেই বলে রাখা প্রয়োজন, 'নবান্ন' যখন লেখা হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষ পরাধীন ; 'ছেঁড়াতার' স্বাধীন ভারতবর্ষের নাটক। স্বাধীন ভারতবর্ষে বসে লেখা হলেও 'ছেঁড়াতারের' মধ্যে দেখি নবান্নেরই রণন।

'ছেঁড়াতারে' 'নবান্নের' রণন থাকলেও একটা বিষয়ে সকলে ঐকমত্য যে, নবান্ন ও ছেঁড়াতারের মধ্যে একটা জল-অচল রেখাও কিন্তু আছে। একটা অদৃশ্য দেওয়াল দুই নাটককে পৃথক করে দিয়েছে। গঠনশৈলীর দিক থেকে নিখুঁত না হলেও 'নবান্ন' People-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। 'People's theatre stars the people'—এই সূত্রটি নবান্নের মধ্যে কাজ করেছে।

নবান্নের মধ্যে আছে people's struggle for freedom and economic justice. নবান্ন অনেক বেশি democratic culture-এর পরিচয়বাহী নাটক। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এ নাটক তরবারির মত ব্যবহৃত হয়েছিল। তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'ছেঁড়াতারে' 'নবান্নের' vastness-কে করায়ত্ত করতে পারেন নি। 'ছেঁড়াতার' 'জোর প্রতিরোধে'র নাটক নয়, এর মধ্যে আছে একটা critical realism.

সর্বমোট তিন অংক ও ন'টি দৃশ্যের এ নাটকে প্রথমে দেখানো হয়েছে, রহিম গ্রামসমাজের 'এলিট' হলেও সে খেটে খাওয়া মানুষ। তার মধ্যে একটা শিল্পী সত্তা আছে। সে গ্রাম সমাজে বাস করেও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আত্মস্থ করতে চায়। অন্যদিকে আছে হাকিমুন্দী যে যুদ্ধের চাঁদা তোলে, তার ধর্মই হল ফায়দা লোটা।

"হাকিমুদ্দির বুদ্ধি শুদ্ধি চুষি খাওয়ার কায়দাতে,
রোজা-নামাজ সবই আছে, মনটা খালি ফায়দাতে ॥"

দ্বিতীয় অংকে হাকিমুন্দীর নীচতা, খলতা, ছলনা ও ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। রহিমের বিপর্যয়ে হাকিমুন্দী বেশ খুশি। এদিকে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা গ্রাম-সমাজকে গ্রাস করেছে। হাকিমুন্দী সেই সুযোগে নতুন করে প্যাঁচ কষেছে। সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নেবে যে কোন পন্থায়। দুর্ভিক্ষ শেষ করে দিয়েছে রহিমের সংসারটিকে। মরিয়া হয়ে রহিম বিবিকে তালাক দেয়, তারপর বসিরকে নিয়ে চলে যায় শহরে।

তৃতীয় অংকে রহিম শহরে এসে চাকরী করে আর মায়ের জন্য অসুস্থ বসির কাঁদে। শহরে চলে এসে গোবিন্দ ভিখারী হয়েছে। সে গান গায়—'সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাল'। তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার আমাদের জানিয়ে দেন, আকালের দিনগুলি দূরীভূত হতে চলেছে। তৃতীয় দৃশ্যের সংবাদঃ ফুলজানকে তালাক দিয়ে রহিম মনে মনে অনুতপ্ত। কিন্তু মাঝখানে হদীজ একটা বড় প্রাচীর। প্রাচীরের এপারে থাকে ধর্ম, ওপারে থাকে প্রেম, কর্তব্য, সন্তান। অভাব, প্রেম, বাস্তবতা, ধর্ম, বেইমানী, শোষণ - বঞ্চনা রহিমকে বিপন্ন করে।

"আল্লা! মোর বস্তর বাজিল না। আল্লা!
তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল! আল্লা!"

—বস্তুত নাটক এইখানেই শেষ হয়েছে।

"জড়াইছে ? জড়াইছে ? আল্লা ! অ্যঁয়,
কি জড়াইছে ?"

—ফুলজানের এই উক্তিটিকে যথেষ্ট নাটকীয় বলে বিবেচনা করলেও আমরা মনে করি এটি একটি বাড়তি উদ্বর্তন মাত্র।

আলোচনাকে সংহত করার কালে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তুলসী লাহিড়ী একটি 'সৎ' নাট্য রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের পরাভবের তথা সমস্যার নানা প্রান্ত তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। 'দুঃখীর ইমানের' ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন—

"হৃদয় ধর্ম সব নিয়মের, সব আইনের, সব প্রথার উপরে—এ কথা বলার চেষ্টা করেছি।"

'ছেঁড়াতারে' এই 'হৃদয় ধর্ম'কেই বড় করে তোলবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার, এবং এর ফলে এই নাটকের রহিম individual হয়ে গেছে। এই নাটকে শ্রেণীসংগ্রাম প্রকট হয়ে ওঠেনি। Common people থেকে সরে এসেছে রহিম, সে গ্রাম-সমাজের 'এলিট'। নাট্যকার খুব সংগোপনে পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আকালের সন্ধানের গভীরচারী বীক্ষা এই নাটকে নেই। রহিম বা ফুলজানের পরাভব প্রদর্শিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্যের স্পিরিট প্রত্যক্ষতা, উদ্দেশ্যমূলকতা অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে। 'ছেঁড়াতার' যে প্রকৃত 'গণনাট্য' নয়, তার প্রমাণ হিসেবে আমরা শুধু এইটুকু নিবেদন করব যে, বহুরূপী কর্তৃক এ নাটক অভিনয়ের সময় প্রশ্ন উঠেছিল—রহিমের মৃত্যু দেখানো সঠিক কিনা। এই সংশয় থাকায় তুলসীবাবু শেষটা দু-রকম ভাবে লিখে দেন। কখনো দেখানো হয় রহিমের মৃত্যু, কখনো দেখানো হয় ফুলজানের মৃত্যু।—এ থেকে নাট্যকারের individual style প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা বলব—'ছেঁড়াতার' নব নাট্যের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছিল। এ নাটক আসলে একটা সময়ের দুঃখীর ইমান—ইতিহাস একথা অস্বীকার করবে না, করছে না।

নবনাট্য কেন ?

১. সংঘ শক্তিকে এখানে দেখানো হয়নি।
২. গোষ্ঠী মানুষের সমস্যাকে অপ্রধান করে ব্যক্তি মানুষের সমস্যাকে বড় করা হয়েছে।
৩. শ্রেণী সংগ্রামকে অপ্রকট করা হয়েছে।
৪ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা উৎপাদন করা হয়নি।

৫. রহিম common people নয়।

৬. নাট্যকার আকালের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু আকালের সন্ধানে তাঁর গভীরচারী বীক্ষা নেই।

৭. নাট্যকার 'ছেঁড়াতারের' প্রবক্তা কিন্তু 'তার' কিভাবে জোড়া লাগতে পারে, তার হদিশ দেননি।

৮. এ নাটকে খুব সংগোপনে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাভব দেখানো হয়েছে।

৯. রহিম বা ফুলজানের পরাভব প্রদর্শিত হওয়ায় গণনাট্যের স্পিরিট ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

১০. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটির সঙ্গে ছেঁড়াতারের আখ্যানটির সাধর্ম্য লক্ষ্য করেই বলা যায়, সমালোচ্য নাটক—নবনাট্য ॥

—০ঃ*ঃ০—

।। নির্দেশিকা ।।

অ

আ, ই

উ, এ

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ, ঝ, ট

ড

ত

দ

ধ

ন

প

ব

ভ

ম

র